বাংলার চিত্রকলা



বাংলার চিত্রকলা

অশোক ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ □ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিবিধবিদ্যাসংগ্রহ ১৩
বাংলার চিত্রকলা

প্রকাশ
২০ মে ১৯৯৪

প্রকাশক
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা ৭০০ ০২০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
চারু খান

মুদ্রক
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০১২

আমার শিক্ষাগুরু
সরসীকুমার সরস্বতী
স্মরণে

নিবেদন

সাধারণ পাঠকের জন্য সহজবোধ্যভাবে বিভিন্ন বিষয়ে জানার সুযোগ করে দেবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে বিবিধবিদ্যাসংগ্রহ নামে একটি প্রকল্পের প্রবর্তন করা হয়েছে। সেই গ্রন্থমালায় বাংলার চিত্রকলার উপর এই বইখানি সাম্প্রতিকতম সংযোজন।

এই গ্রন্থটিতে বাংলার চিত্রকলার একটি ধারাবাহিক বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। চিত্রকলার ইতিহাস ভালোভাবে অনুধাবন করার সুবিধার জন্য শতাধিক ছবিও দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে বত্রিশখানি রঙিন। বাংলা ভাষায় এ ধরনের বই এর আগে প্রকাশিত হয়নি। খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ ১২০০ থেকে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে বাংলার চিত্রচর্চার একটি রূপরেখা এই বইটিতে দেওয়া হয়েছে। আদিযুগ থেকে পালযুগ, সুলতানি আমল, চৈতন্য-আশ্রিত চিত্রকলার ক্রমবিকাশ, মুর্শিদাবাদ শৈলী, কোম্পানি শৈলী, ইউরোপীয় রীতির চিত্রকলার চর্চা, অবনীন্দ্রনাথের শিল্পান্দোলন, নব্যভারতীয় চিত্রকলা, আধুনিকতার প্রবর্তন ও বিকাশ এবং নব্যপন্থী আন্দোলন এ-সবেরই সম্যক পরিচয় গ্রন্থটিতে পাওয়া যাবে। এ-ছাড়া পাটাচিত্র, পটশৈলী, ছাপাই ছবি, ভিত্তিচিত্র এ-সবের কথাও বলা হয়েছে।

বিশিষ্ট চিত্র-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক অশোক ভট্টাচার্য আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই বইখানি লিখে দেওয়ার জন্য বাংলা আকাদেমির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বইখানির সুচারু সৌষ্ঠব রচনার কৃতিত্ব বিশিষ্ট শিল্পী শ্রী চারু খানের। তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই।

২০ মে, ১৯৯৪

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
সদস্য সচিব
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

ভূমিকা

বাঙালি মানসের ক্রমবিকাশে সাহিত্যের ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা তার বিস্তৃত ও প্রামাণিক ইতিহাস পাঠ করে যে কোনো উৎসাহী বাঙালি পাঠকই জেনে নিতে পারেন। কিন্তু চিত্রকলায় বাঙালি সৃজন-প্রতিভার স্ফুরণ কতদূর ঘটেছিল, কিংবা বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে ছবির স্থানই বা ঠিক কতটুকু, তা সহজে জানার কোনো সুযোগ শিক্ষিত বাঙালির ছিল না। কারণ বাংলার চিত্রকলার কোনো আনুপূর্বিক ইতিহাস এতদিন লেখা হয়নি। বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এই অপূর্ণতার দিকটি লক্ষ করেই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি 'বাংলার চিত্রকলা' শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন, এবং আমার সৌভাগ্য, সেই গ্রন্থ রচনার গুরু দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করেন। এই দায়িত্ব একজন শিল্প-ঐতিহাসিকের নিষ্ঠা ও সততা নিয়ে পালনে আমার যে চেষ্টা তারই ফলশ্রুতি 'বাংলার চিত্রকলা'।

বাংলার চিত্রকলার কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস না থাকায়, এই গ্রন্থ রচনার সময় আমার সামনে অনুসরণ করার মতো কোনো আদর্শ বা কাঠামো ছিল না। আবার বাংলার সমাজ-রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের ধারা এমনই বিশিষ্ট যে তার চিত্রকলার ইতিহাস রচনায় ইয়োরোপীয় কোনো জাতির শিল্প-ইতিহাসকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করাও সংগত হবে বলে আমার মনে হয়নি। এই কারণে 'বাংলার চিত্রকলা'র ঐতিহাসিক আলোচনার যে চরিত্র তা আমার নিজস্ব। এ ইতিহাস রচিত হয়েছে বাঙালির সাংস্কৃতিক বিকাশের—বিশেষ করে তার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার প্রশস্ত প্রেক্ষাপটে। যে কালে বা যে যুগপর্যায়ে নতুন কোনো আন্দোলন—তা ধর্মীয়ই হোক বা স্বাদেশিকই হোক—বাঙালির ভাবজগতে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে, তখনই তার সাহিত্য ও গানের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকলার স্ফুরণও বিশেষভাবে ঘটেছে। পাল রাজাদের আমলে যেমন তা ঘটেছে মহাযান-তন্ত্রযান বৌদ্ধ ধ্যান-ধারণার অনুপ্রেরণায়, তেমনই সুলতানি শাসনকালে চৈতন্যদেব-আশ্রিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের ভাবোন্মাদনায়। একইভাবে এই শতাব্দের সূচনায় স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দীপনায় সৃষ্টি হয়েছে প্রাচ্য-দেশীয় কলাশিল্পের আদর্শকে সামনে রেখে নতুন এক চিত্রশৈলী। ইতিহাসের উষাকাল থেকে শুরু করে সমকাল পর্যন্ত বাঙালির চিত্রকলা চর্চার প্রবহমান ধারার বিবরণ লেখাই ছিল আমার লক্ষ্য। কিন্তু যেহেতু ইতিহাস তার উপাদানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাই দু-হাজার বছরের চেয়েও পুরনো চিত্রকলার ইতিহাসে চিত্রনিদর্শন বা সে-সম্পর্কিত সাক্ষ্যের অভাব ঘটেছে বারবার। ফলে আনুপূর্বিক ধারাবিবরণের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য ছেদ। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে 'বাংলার চিত্রকলা'য় বাঙালির চিত্রকলাচর্চার এক নির্ভরযোগ্য ইতিহাস ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।

এই ইতিহাস আমি শেষ করেছি ষাটের দশকে—অর্থাৎ আমাদের এক প্রজন্মকাল আগের শিল্পীদের কাজের পর্যালোচনা দিয়ে। কেননা এ পর্যন্ত চিত্রকলার বিকাশধারাকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা সম্ভব হয়েছে। তার পরবর্তী যে সাম্প্রতিক চিত্রকলার আন্দোলন, তার প্রসঙ্গ আমি এই গ্রন্থে আলোচনা করিনি। তার কারণ দুটি ; প্রথমত, সমকালীন শিল্পীদের আলোচনা করতে হয় ঐতিহাসিক নয়, সমালোচকের অবস্থান থেকে। এবং তা করলে এই ইতিহাসের প্রথম অংশের সঙ্গে শেষ অংশের রচনারীতি ও পদ্ধতি অসংগতিপূর্ণ হয়ে উঠবে। দ্বিতীয়ত, এই শিল্পীদের আদর্শ, লক্ষ্য ও বিচরণক্ষেত্র আজ আর কোনো জাতীয় ইতিহাসে সীমাবদ্ধ থাকছে না, বরং হয়ে উঠছে আন্তর্জাতিক। তাই যে গ্রন্থের পরিধি হল 'বাংলার চিত্রকলা' তাতে তাঁদের শিল্পকর্মকে ভৌগোলিকভাবে শৃঙ্খলিত করা কতখানি সমীচীন হবে সে সম্পর্কে আমার সংশয় আছে।

'বাংলার চিত্রকলা' রচনায় আমি আমার পূর্ববর্তী বহু শিল্প-ঐতিহাসিক, চিত্র-সমালোচক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের লেখার সাহায্য নিয়েছি। যেসব গ্রন্থ ও নিবন্ধ থেকে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি, সেগুলির নাম লেখক সহ আমি গ্রন্থপঞ্জির অন্তর্ভুক্ত করেছি। তা ছাড়া প্রসঙ্গক্রমে যেগুলি ব্যবহার করেছি, সেগুলিও আমি সূত্রনির্দেশে উল্লেখ করেছি। জ্ঞাতসারে সকল পূর্বসূরির কাজের স্বীকৃতি আমি দিয়েছি ; কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কারও নামের উল্লেখ না থাকে তবে তার জন্যে আন্তরিক মার্জনা চেয়ে রাখছি।

'বাংলার চিত্রকলা' লেখার সময় বারবার আমার সেই সব শিক্ষকদেব কথা মনে পড়েছে, যাঁদের কাছে আমি আজ থেকে তিরিশ বছব আগে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্র হিসাবে শিল্প-ইতিহাসের পাঠ নিয়েছিলাম। প্রকৃতপক্ষে এঁদের গবেষণালব্ধ তথ্যই যে কেবল আমি এই গ্রন্থে ব্যবহাব করেছি তা নয়, এঁদের চিন্তাভাবনার অনেক কিছুই আমি একজন উত্তরসাধক হিসাবে জ্ঞানে-অজ্ঞানে নিজের করে নিয়েছি। পালযুগের চিত্রকলার আলোচনায় আমি যেমন নীহাররঞ্জন রায ও সরসীকুমার সরস্বতীর কাছে ঋণী, তেমনই মধ্যযুগীয় চিত্রকলার বিষযে দেবপ্রসাদ ঘোষ ও পটচিত্রের বিচারে কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়েব রচনা আমাকে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। নীহাররঞ্জন রায় চেয়েছিলেন আমি বাংলা ভাষায় যেন শিল্প-ইতিহাস চর্চা করি। এই সুযোগে আমি তাঁর পুণ্যস্মৃতির প্রতি প্রণাম জানাচ্ছি।

চিত্রকলার আলোচনা সহজ হয় ছবির উদাহরণে। তাই আলোচনার ধারা অনুযায়ী নানা যুগপর্বের ও শৈলীর অনেকগুলি রঙিন ও একবঙা ছবি দিয়ে বইটিকে পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে। এই ছবিগুলিই যে বাংলার চিত্রকলাব শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এমন দাবি সংগত হবে না , তবে অবশ্যই এগুলি নানা যুগেব প্রতিনিধিস্থানীয় উদাহবণ। ছবিগুলি সংগ্রহ কবা সহজ হযনি। কেননা কী সংগ্রহশালায কী ব্যক্তিগত সংগ্রহে কোথাও ছবির যথাযথ তালিকা পশ্চিমবঙ্গে এখনও দুর্লভ। বাংলার মহত্তম শিল্পীবও সব কাজেব হদিশ পাওযা আজও অসম্ভব প্রায। এই পবিস্থিতিতে অনেক ছবিই তুলে নেওযা হযেছে পত্র-পত্রিকা থেকে , এবং স্বভাবতই সেগুলির বর্তমান সংগ্রাহকদেব নির্দিষ্ট কবা যাযনি। তবে যে-সব ছবি বিভিন্ন সংগ্রহশালা ও শিল্পীব সংগ্রহ থেকে গৃহীত হযেছে সেগুলিব ক্ষেত্রে গ্রন্থেব চিত্রতালিকায স্বীকৃতি জানানো হয়েছে।এখানে সেই সব সংগ্রহশালাব আধিকাবিকদের কাছে ও যাঁদেব ছবি ছাপা হযেছে সেই মান্য শিল্পীদেব কাছে আমি সকৃতজ্ঞ সৌজন্য স্বীকাব কবছি।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি-র উদ্যোগে এই বই রচিত ও প্রকাশিত হল, তাই আকাদেমিকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আকাদেমির সচিব সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায এই বইয়ের প্রতি যে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন তা তাঁর কর্তব্যের অতিরিক্ত সাংস্কৃতিক সচেতনতাব পবিচয দেয়। আকাদেমির ভারপ্রাপ্ত আধিকাবিক অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের যত্নে ও তৎপরতায বইটি এমন সুমুদ্রিত হয়েছে। এঁদের দু-জনকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

'বাংলাব চিত্রকলা' পড়ে যদি বাঙালি পাঠক চিত্রকলা বিষযে উৎসাহী হন, তা হলেই আমি আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে কবব।

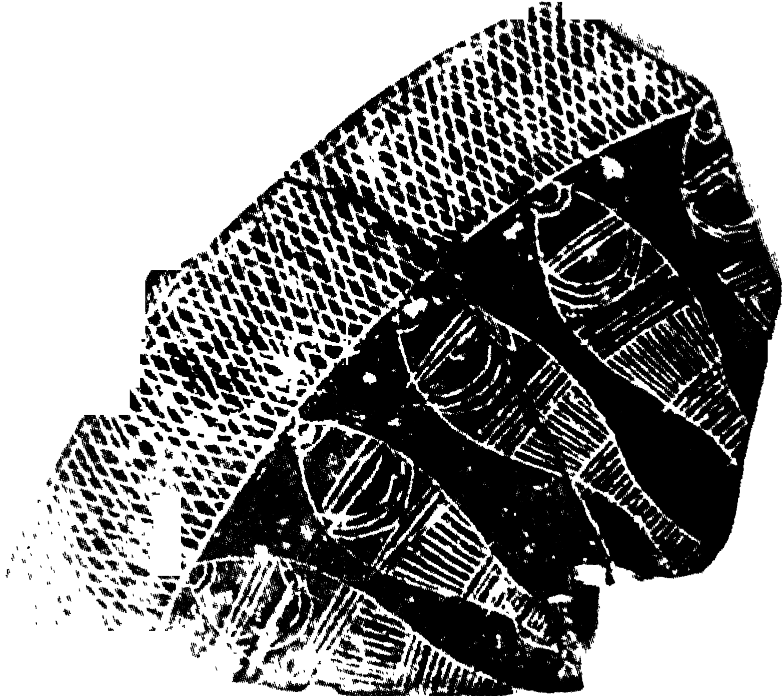
প্রাচীন ভাবতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অশোক ভট্টাচার্য

সূচি

১ প্রাককথন

বাংলার চিত্রকলার সূত্রপাত কবে? এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া সহজ নয়। কিন্তু যদি একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করা যায়—বাংলার প্রাচীনতম ছবিব নিদর্শন কী, তাব উত্তর বিনা দ্বিধাতেই দেওয়া সম্ভব। তা হল পাল রাজা প্রথম মহীপালদেবের শাসনকালের ষষ্ঠ বছরে নালন্দা মহাবিহারে লেখা 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা' পুথিব বারোখানা রঙিন ছবি। পুথিটি তালপাতার এবং ছবিগুলি তার ওপরই আঁকা। সময় আনুমানিক ৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ। এই দুর্লভ পুথিটি রয়েছে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহে। প্রথম মহীপালের সময়ে আঁকা আরও দুটি পুথি পাওয়া গেছে। তা ছাড়া পরবর্তী দু'শ বছরে আঁকা বহু পুথিচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সাধারণভাবে এগুলি পালযুগের পুথিচিত্র নামে পরিচিত। রচনানৈপুণ্যে ছবিগুলি এমনই উন্নত যে এগুলিকে বাঙালি শিল্পীর প্রাথমিক চিত্রকর্ম বলে ভাবা যায় না। ছবিগুলি দেখে এবং মনে হয় এর পেছনে অনেক দিনের অভিজ্ঞতা কাজ কবেছে। কিন্তু আমাদেব দুর্ভাগ্য, পাল আমলের আগেকার কোনো ছবি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। বাংলার আর্দ্র আবহাওয়ায় প্রাচীনতর পুথির বিনষ্টির সম্ভাবনাই বেশি।



১ কৃষ্ণবর্ণ মৃৎপাত্রে শ্বেতবর্ণে আঁকা মাছ ও জাল, আঃ ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ 'দিব্যাবদান'-এর একটি কাহিনী হল, 'বীতাশোকাবদান'। এই কাহিনীটি থেকে জানা যায় পুণ্ড্রবর্ধননগরের নির্গ্রন্থী-উপাসকেরা 'বুদ্ধদেব নির্গ্রন্থীর পদতলে পড়ে আছেন' এমন দৃশ্য চিত্রার্পিত করেছিল[১]। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে মহারাজ অশোক পুণ্ড্রবর্ধননগরের নির্গ্রন্থী আজীবকদের সমূলে বিনাশ করেছিলেন। কাহিনীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব যাই হোক না কেন, এর থেকে অনুমান করা চলে যে খ্রিস্টপূর্বকালে উত্তরবঙ্গের সমৃদ্ধ নগরী পুণ্ড্রবর্ধনে চিত্রকর্মের প্রচলন ছিল। সাহিত্যসূত্রের আর একটি সাক্ষ্য পাওয়া যায় চতুর্থ শতকের শেষে এবং পঞ্চম শতকের সূচনায় ভারতভ্রমণকারী চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু ফা-হিয়েনের 'ভ্রমণবৃত্তান্ত'তে। ফা-হিয়েন ভারতে আসেন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচার-আচরণ বিষয়ক গ্রন্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। এদেশে ভ্রমণকালে তাঁর অনুসন্ধিৎসা ছিল প্রধানত বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কেই। ভ্রমণশেষে, সমুদ্রপথে দেশে ফেরার আগে, তিনি দক্ষিণ বাংলার তাম্রলিপ্তি বন্দরনগরে দু-বছর বাস করেছিলেন। এখানে তিনি বাইশটি বৌদ্ধবিহার দেখেছিলেন আর সূত্রগ্রন্থ অনুলিখনের সঙ্গে সঙ্গে মূর্তির রেখাচিত্রও এঁকে নিয়েছিলেন[২]। মূর্তিশিল্পের অবস্থিতি অবশ্যই চিত্রশিল্পের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার আরও চমকপ্রদ। অজয় নদ আর কুনুর নদীর অববাহিকায়, বর্ধমান জেলার ভেদিয়া স্টেশন থেকে মাত্র ছ-মাইল দূরে অবস্থিত পাণ্ডুরাজার ঢিবি খুঁড়ে পাওয়া গেছে বাংলার প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন। এখানে হরপ্পা সভ্যতার সমগোত্রীয় তাম্রপ্রস্তর পর্যায়ের পুরাবস্তুগুলির মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে নানা রকমের নকশা-আঁকা মৃৎপাত্র[৩]। এই নকশাগুলি মৃৎশিল্পীদের চিত্রবিদ্যার পরিচয় দেয়। কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, এখানে খুঁড়ে পাওয়া দুটি কৃষ্ণবর্ণ মৃৎপাত্রখণ্ড, যার ওপর ধূসর সাদা বর্ণে শিল্পী চমৎকার রেখাচিত্র এঁকেছেন। এর একটিতে দেখা যায় মাছধবাব জালের সংলগ্ন একসাব মাছ , অপবটিতে একটি ময়ূরী একটা সাপ ধরে আছে ঠোঁট দিয়ে । ছবিদুটিব বেখাকর্মেব সাবলীল দৃঢ়তা লক্ষণীয়। এ দুটি ছবি নিঃসন্দেহে আজ থেকে তিন হাজাব বছব আগেকাব বাঙালি শিল্পীব প্রশংসনীয় দক্ষতাব পবিচয় দিচ্ছে। বিষয়ের বিচাবেও প্রথম ছবিটি তাৎপর্যপূর্ণ। এটি প্রমাণ করে বাংলাব সেই আদি জনগোষ্ঠীব অন্যতম উপজীবিকা ছিল মাছধরা আব আজকেব মতো সেদিনও মাছ ছিল বাঙালিব প্রিয় খাদ্য।



২ কৃষ্ণবর্ণ মৃৎপাত্রে শ্বেতবর্ণে আঁকা সর্পাহারী ময়ূব, আঃ ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

২ পালযুগের পটভূমি

পাল রাজাদের আমলেই বাঙালি জাতিসত্তার প্রথম বিকাশ ঘটেছিল বলে মনে করা হয়। পাল রাজবংশের জন্মভূমি ছিল বরেন্দ্র, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ। কিন্তু তাঁদের রাজ্য গড়ে উঠেছিল বাংলা ও বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে—কখনও তা উত্তরপ্রদেশেও সম্প্রসারিত হয়েছিল। তাঁদের রাজত্বকালের শুরু অষ্টম শতকের মাঝামাঝি আর শেষ দ্বাদশ শতকের অন্তে। কোনো রাজবংশের সৌভাগ্যই সব সময় সমান থাকে না। পালদের দীর্ঘ সাড়ে চার শ বছরের শাসনকালেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তা হল, তাঁদের কয়েক শতাব্দব্যাপী রাজত্বকালে পূর্বভারতের এক সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তখনকার স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা সেই উন্নতির সাক্ষ্য হয়ে আজও দেশ ও বিদেশে ছড়িয়ে রয়েছে।

পাল রাজত্বকাল আরও একটা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনর্জাগরণের ফলে সারা ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম যে সময় অপসৃত হচ্ছিল, সেই সময় পূর্বভারতে এই রাজারাই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী থেকে তথাগতের ভক্তদের পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। পাল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ধর্মপাল (আঃ ৭৭৫-৮১০ খ্রি) স্বয়ং ছিলেন দক্ষিণ বিহারের ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা আর উত্তরবঙ্গের সোমপুর বিহারের সংস্থাপক। দেবপাল (আঃ ৮১০-৮৪৭ খ্রি), প্রথম মহীপাল (আঃ ৯৭৭-১০২৭ খ্রি) প্রমুখ পালনৃপতিরা নালন্দা মহাবিহারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নালন্দায় আবিষ্কৃত অসংখ্য প্রস্তর ও ধাতুমূর্তি দেবপালের সমকালীন বলে চিহ্নিত হয়েছে। পালরাজারা শাসক হিসাবে সকলেই ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণু—এমন-কি তাঁদের কয়েকজন সরাসরি শিব ও বিষ্ণুর মন্দির প্রতিষ্ঠায় ছিলেন সহায়ক। ফলে কেবল বৌদ্ধভাস্কর্য নয়, তাঁদের আমলের বহু বিষ্ণু, সূর্য, দেবী, শিব প্রমুখ পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে।

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসেও পালরাজত্বকাল বিশেষ এক কারণে গুরুত্বলাভ করেছে। পাল রাজারা ছিলেন মহাযানপন্থী বৌদ্ধ। তাঁদের সময়েই পূর্বভারতে মহাযান ধর্ম ক্রমে ক্রমে তন্ত্রযান আশ্রয় করে এবং বজ্রযান, কালচক্রযান প্রমুখ তন্ত্রাচারী বৌদ্ধ উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পালরাজারাও ছিলেন মহাযান অনুগামী তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পরিপোষক। এই তান্ত্রিক সাধনার প্রয়োজনেই দিনে দিনে বৌদ্ধ দেবদেবীর ধ্যান ও প্রতিমার সংখ্যা বেড়ে উঠল। তাদের মধ্যে আবার আধিক্য ঘটল নানা বর্ণ ও বর্ণনার তারা ও অন্যান্য দেবীমূর্তির। পালদের শাসনকালে, বিশেষ করে নবম থেকে দ্বাদশ শতকে, কী মূর্তিতে কী চিত্রে এইসব তন্ত্রযানী, বজ্রযানী ও কালচক্রযানী দেবদেবীর প্রতিমাই প্রধানত রূপলাভ করেছে।



৩ বুদ্ধের জন্ম, 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা' পুথি, নালন্দা, আঃ ৯৮৫ খ্রি

৩ পালযুগের কলাশিল্প ও তারনাথের সাক্ষ্য

ধর্মপাল ও দেবপালের আমলে বাংলার শিল্পকলা যে বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিল তা জানা যায় তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারনাথের সাক্ষ্য থেকে। তিনি ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' নামে একটি গ্রন্থ লেখেন। এই গ্রন্থেই প্রসঙ্গক্রমে তারনাথ মূর্তিকলা সম্পর্কিত একটি অধ্যায়ে ধর্মপাল ও দেবপালদেবের সমযকার ধীমান ও তাঁর পুত্র বিটপাল নামে দুই বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গ নিবাসী শিল্পীর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এঁরা দুজনেই ভাস্কর্যে, ধাতুমূর্তি গড়নে ও চিত্রকর্মে ছিলেন নিপুণ ও পারদর্শী। এঁদের দুজনের ধাতুমূর্তির রীতি পূর্বদেশীয় নামে খ্যাত হয়। কিন্তু চিত্রকলার ক্ষেত্রে পিতা ও পুত্রের রীতি ভিন্ন হয়ে পড়ে। চিত্রকলায় পিতার রীতি হয় পূর্বদেশীয় আর পুত্রের রীতি মধ্যদেশীয়। বৌদ্ধ পরম্পরায় এই মধ্যদেশ হল মগধ বা দক্ষিণ বিহার, যেখানে পুত্রের চিত্ররীতি ব্যাপ্তিলাভ করেছিল বলে তারনাথ উল্লেখ করেছেন। তারনাথ এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে মধ্যযুগের নেপালি ভাস্কর্য ও চিত্রকলা গড়ে উঠেছিল পূর্বদেশীয় রীতিরই অনুসরণে[৪]।

পালযুগের যে বিপুল সংখ্যক প্রস্তর ও ধাতুমূর্তি দক্ষিণ বিহার ও বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পের ইতিহাসে সেগুলি পূর্বদেশীয় রীতির অভিব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পালযুগ ও তার পরবর্তীকালের নেপালের ভাস্কর্য ও চিত্রকলা যে পূর্বদেশীয় রীতির আদর্শেই সমৃদ্ধ, এ কথা আধুনিক শিল্প-ঐতিহাসিকরাও মনে করেন । এই দুই ক্ষেত্রে তারনাথের মত সংশ্লিষ্ট শিল্পনিদর্শনের দ্বারা সাধারণভাবে সমর্থিত হয়েছে। কিন্তু চিত্রকলার ক্ষেত্রে তাঁর যে মন্তব্য—পিতা ধীমান ছিলেন পূর্বদেশীয় রীতির এবং পুত্র বিটপাল মধ্যদেশীয় বা মাগধী রীতির প্রবর্তক-তার সত্যতা এখনও পর্যন্ত বিচার করে দেখা হয়নি। এই বিচারের কাজটিও এ ক্ষেত্রে সহজ নয়। কারণ, যদিও পালযুগের বহুসংখ্যক চিত্রিত পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে মাত্র চারটির রচনাস্থান তাদের পুষ্পিকায় উল্লিখিত আছে। ফলে, অধিকাংশেব রচনাস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে অঞ্চলভিত্তিক চিত্ররীতি বিচার দুরূহ হয়ে পড়েছে। চিত্রগুলির রচনাবীতি ও শৈলীর অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের সাহায্যে হয়ত কোনো এক দিন এই দুই ভিন্ন রীতিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো শিল্প-ঐতিহাসিক এই শ্রম ও সময়সাধ্য কাজে ব্রতী হননি।



৪ প্রজ্ঞাপারমিতা, 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপাবমিতা' পুথি, নেপাল, ১০৭১ খ্রি।

৪ পাল আমলের পুথিচিত্র : পরিমাণ ও প্রকরণ

পালদের আমলে চিত্রকলার অনুশীলন যে কত তন্নিষ্ঠ ও ব্যাপক ছিল তা অনুমান করা যায় এক হাজার বছর পরেও যে বিপুল সংখ্যক পুথিচিত্র কালের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে তাদেব সাক্ষ্যে। অবশ্য ধর্মপাল ও দেবপালের সময়েব—অর্থাৎ অষ্টম ও নবম শতকের কোনো চিত্র আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু দশম শতকের শেষ পাদ থেকে শুরু কবে ত্রয়োদশ শতক তো বটেই এমন-কি তার পরেও এই পুথিচিত্রের ধারা অব্যাহত ছিল। অর্থাৎ, পাল ও সেন রাজত্বকালের সঙ্গে সঙ্গেই এই শিল্পপরম্পরা অবলুপ্ত হয়ে যায়নি , বরং তা আবও দু'শ বছব তাব অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল।

পালচিত্রকলা সম্পর্কে সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় সবসীকুমার সরস্বতী রচিত 'পালযুগের চিত্রকলা'[৬] গ্রন্থে। সরসীকুমার আলোচনার সুবিধার জন্য এই চিত্রকলার সকল আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলিকে তিন ভাগে বিন্যস্ত করেছেন। যথা— ক. তারিখ সহ চিত্র-সংযুক্ত পূর্বভারতীয় পুথি ; খ. তাবিখবিহীন চিত্র-সংযুক্ত পূর্বভারতীয় পুথি ও গ.তারিখ সহ চিত্র-সংযুক্ত নেপালি পুথি। এ ছাড়া তিনি তাবিখবিহীন অথচ চিত্র-সংযুক্ত কিছু নেপালি পুথির কথাও আলোচনা করেছেন। পালযুগের চিত্রকলার বিচারে নেপালি চিত্রকলা অন্তর্ভুক্ত কবাব কাবণ নেপালি চিত্রে সে সময় পালযুগের পূর্বভারতীয় রীতিবই সম্প্রসারিত রূপ দেখতে পাওযা যায়।

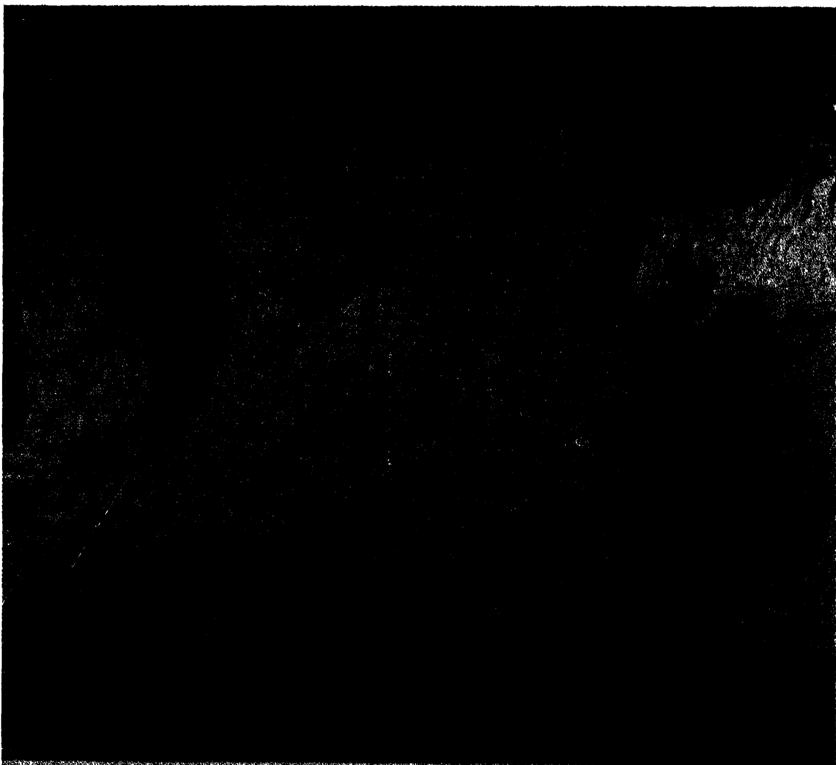
পাল-সেন যুগেব কী বিপুল সংখ্যক পুথিচিত্র রক্ষা পেয়েছে তা অনুমান করা যাবে একটিমাত্র তথ্য থেকেই। তা হল কেবলমাত্র তাবিখ সহ পূর্বভারতীয় পুথিগুলিতেই পাওযা গেছে তিন শ'র বেশি ছবি। এব সঙ্গে তাবিখবিহীন পুথিগুলিব ছবি যোগ কবলে সংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি পাবে। তা ছাড়া তুলনামূলক বিচারের প্রয়োজনে নেপালি চিত্রগুলিকেও ধবা যেতে পারে। সব মিলিয়ে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে একটি চিত্ররীতির বিচাব ও বিশ্লেষণের উপযোগী পরিমাণের ছবি আমরা পাল-সেন আমলের নিদর্শনগুলিতে পেযেছি। সেই কারণেই প্রকৃত অর্থে বাংলার চিত্রকলাব আলোচনা শুরু করা যায় এই পালযুগের চিত্রকলা থেকেই।



৫ মহাশ্রী তারা, 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা' পুথি, নেপাল, খ্রি ১০৭১

আলোচ্য পুথিগুলি লেখা ও আঁকা হয়েছে তালপাতায় (কেবলমাত্র আশুতোষ সংগ্রহশালার ১১০৫ খ্রিস্টাব্দে নেপালে প্রস্তুত 'পঞ্চরক্ষা' পুথিটি লেখা ও আঁকা কাগজে)। তালপাতা সাধারণত ভঙ্গুর। তাই পরবর্তীকালের বহু তালপাতার পুথিই জলবায়ুর প্রকোপে জীর্ণ হয়ে যেতে দেখা গেছে। তাই মনে হয় সে আমলে তালপাতাকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘস্থায়ী করার ব্যবস্থা নেওয়া হত। পূর্বভারতে দুই শ্রেণীর তালপাতা পাওয়া যায়—'খড়তাড়' ও 'শ্রীতাড়'। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে 'শ্রীতাড়'ই পুথির পক্ষে উপযুক্ত। এই পাতা দৈর্ঘ্যে ৯০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়; প্রস্থে প্রায় সব সময়েই ৭১/২ সেন্টিমিটার। পাতলা ও নমনীয় হওয়ায় কম ভঙ্গুর এই পাতা প্রথমে সংগ্রহ করে গোছা বেঁধে জলে মাসখানেক ডুবিয়ে রাখা হত। তারপর জল ঝরিয়ে শুকনো করে প্রতিটি পাতা শাঁখ দিয়ে ঘষে মসৃণ করে নেওয়া হত। এরপর পাতাগুলি সাজিয়ে সমান করে কেটে, পুথি বাঁধার ছিদ্র করে নিয়ে, করা হত পুথি রচনার উপযোগী। লিপিকর পুথি লিখত দৈর্ঘ্যের সমান্তরালে। প্রতিপাতায় পাঁচ থেকে সাত পঙ্‌ক্তি। যে-সব পুথি চিত্রিত হত সেগুলিতে লিপিকর শূন্যস্থান ছেড়ে যেত। চিত্রকর পুথিলেখার পর সেই শূন্যস্থান চিত্র দিয়ে পূর্ণ করত। এক একটি পাতায় সাধারণত তিনটি চিত্রিত ফলক দেখা যায়—একটি মাঝখানে এবং দুটি দু-পাশে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য পাতার দু-পাশে দুটি চিত্রফলক এবং পরবর্তীকালে পুথির দুটি ছিদ্রস্থানেও চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

চিত্ররচনার প্রক্রিয়া সাধারণত জটিল। তবে ভিত্তিচিত্রের তুলনায় পুথিচিত্রের করণকৌশল অনেক সরল। চিত্ররচনার ক্ষেত্রটিকে কখনও একটি রং দিয়ে ভরাট করে কখনও বা সরাসরি কোরাপাতার ওপরেই তুলির আঁচড়ে প্রাথমিক রেখাকর্ম করে নেওয়া হত। এরপর বিষয় অনুযায়ী নানা বর্ণে চিত্রফলকটি রঞ্জিত হত। রূপের গড়নের প্রয়োজনে রঙের গাঢ়তার তারতম্যে আর উজ্জ্বল বর্ণের ছোঁয়ায় সম্পূর্ণ করা হত রঙের কাজ। তারপর ভারতীয় চিত্ররচনার সাধারণ নিয়মে প্রথমে ভেতরকার রঙে মাঝারি তুলিতে, এবং শেষে কালো বা লালে সরু তুলিতে গড়নের বহিঃরেখা টানা হত। ছবিতে ব্যবহৃত রঙের মধ্যে দেখা যায় হরিতালের হলুদ, খড়িমাটির সাদা, উদ্ভিদজাত গাঢ় নীল, প্রদীপের শিষের কালি, সিঁদুর লাল, আর নীল ও হলুদের মিশ্রণে তৈরি সবুজ। সব রংগুলিকেই সাদা মিশিয়ে ইচ্ছামতো হালকা করে নিতেও দেখা যায়। তবে সাধনসূত্রের ধ্যান অনুসারে দেবদেবীর বর্ণ নির্দিষ্ট হওয়ায় শিল্পীর নিজস্ব রুচির স্থান অন্তত বর্ণপ্রয়োগের ক্ষেত্রে ছিল সামান্যই। দেবদেবীর ধ্যান অনুসরণে ছবিতে প্রাধান্য পেয়েছে গৌর বা হলুদ রং, নীল ও সবুজ বর্ণ। এমন-কি দেবদেবীর পশ্চাদ্‌পটেও ঘটেছে লাল ও হলুদের বিশেষ ব্যবহার।



১ পাল-পুথিচিত্র, বোধিসত্ত্ব-অবলোকিতেশ্বর, ১০৮৭ খ্রি



২ আলেকজাণ্ডার কর্তৃক দারাকন্যা রোশানককে গ্রহণ; নিজামী রচিত 'ইস্কান্দারনামা'র পাণ্ডুলিপি-চিত্র; ১৫৩১-৩২ খ্রি



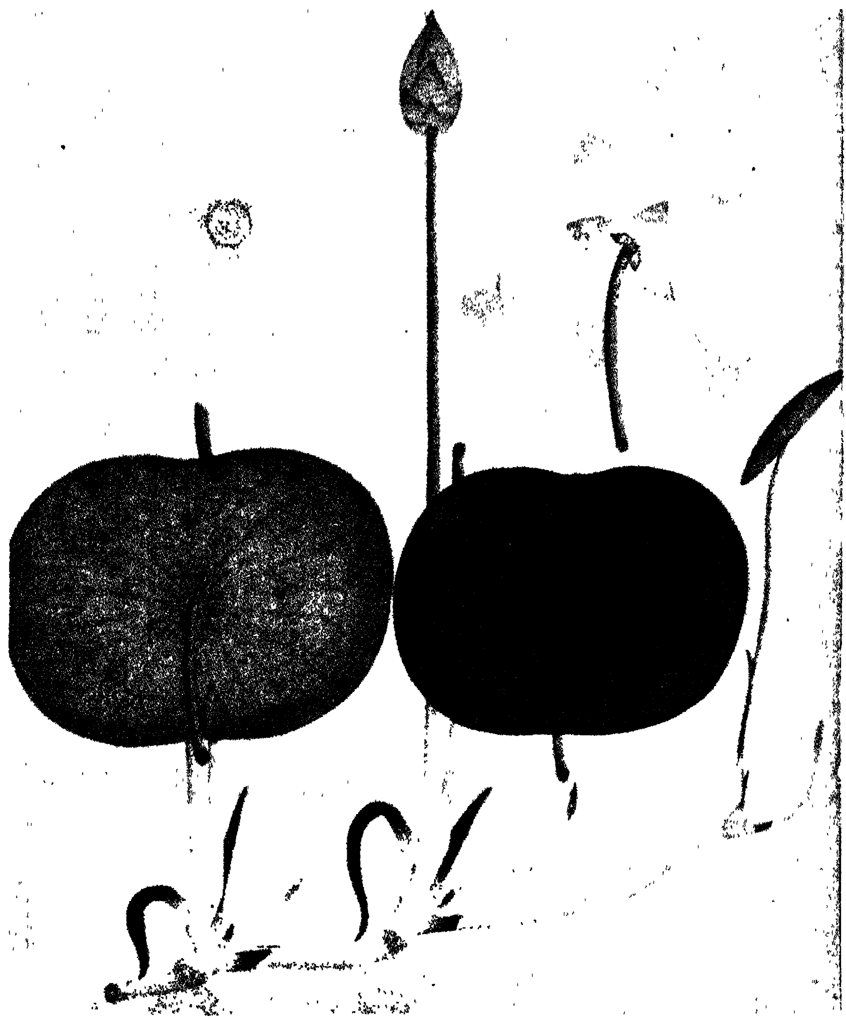
৩ পাটাচিত্র, চৈতন্যদেব ও রাজা রুদ্রপ্রতাপ, সপ্তদশ শতাব্দ, বীরভূম



৪ অজ্ঞাতনামা শিল্পী (মুর্শিদাবাদ শৈলী), হরিণ শিকাররত নবাব আলীবর্দি খাঁ, আঃ ১৭৫০–৫৫ খ্রি



৫ যোয়ান জোফানি, ওয়ারেন হেস্টিংস ও তাঁর পত্নী, আঃ ১৭৮৪ খ্রি



৬ অজ্ঞাতনামা শিল্পী (কোম্পানি শৈলী), শ্বেতপদ্ম (শিবপুর), আঃ ১৮০০ খ্রি



৭ জেমস্ বেইলি ফ্রেজার, চিৎপুরের বাজার, ১৮১৯ খ্রি



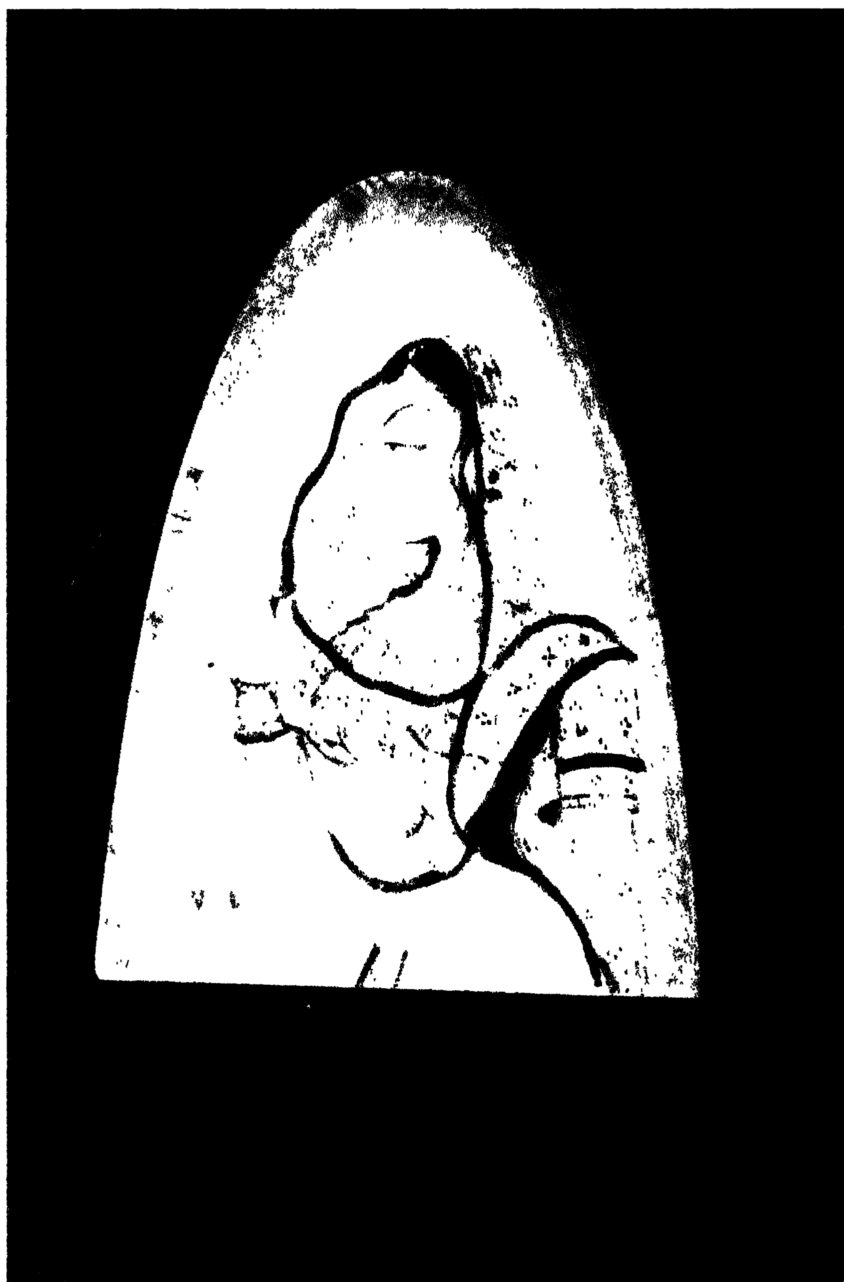
৮ শেখ মুহম্মদ আমির (কোম্পানি শৈলী), ময়দানে কুকুর, আঃ ১৮৪৫ খ্রি



৯ অজ্ঞাতনামা শিল্পী 'নবদ্বীপে সপার্ষদ চৈতন্যদেবের নগর-সংকীর্তন, আঃ অষ্টাদশ শতকের শেষপাদ



১০ অজ্ঞাতনামা শিল্পী (মুর্শিদাবাদ শৈলী?), সপার্ষদ্ চৈতন্যদেব, আঃ ১৭৬০ খ্রি



১১ অজ্ঞাতনামা শিল্পী (নসীপুর, মুর্শিদাবাদ), রাধা (হাতির দাঁতের ওপর অঙ্কিত), উনিশ শতকের শেষভাগ



১২ অজ্ঞাতনামা শিল্পী (নসীপুর, মুর্শিদাবাদ), ষড়ভুজ-শ্রীচৈতন্য, বাসুদেব সার্বভৌম ও রাজা প্রতাপরুদ্র, আঠারো শতকের শেষপাদ



১৩ পটচিত্র, রাজা সালিবাহন (কমলেকামিনী পটের অংশ), বিশ শতকের সূচনাকাল



১৪ চৌকস পট, ভাইফোঁটা, বীরভূম, বিশ শতকের প্রথমপাদ



১৫ জাদুপট বা চক্ষুদান পট, মেদিনীপুর, উনিশ শতকের মধ্যভাগ



১৬ অজ্ঞাতনামা শিল্পী (কালীঘাট পটশৈলী), যশোদা ও কৃষ্ণ, আঃ ১৮৯০ খ্রি

৫ পাল-পুথিচিত্রের বৌদ্ধ প্রেরণা

পালযুগের চিত্রিত পুথিগুলির অধিকাংশই হল প্রামাণ্য মহাযানগ্রন্থ 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র অনুলিপি। এ ছাড়া আছে পরবর্তীকালের বজ্রযান মতের 'পঞ্চরক্ষা', 'কারণ্ডব্যূহ', 'কালচক্রযান' প্রমুখ গ্রন্থের অনুলিপি। কিন্তু যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য তা হল পুথির গ্রন্থ ও চিত্রের মধ্যে কোনো সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ চিত্রগুলি গ্রন্থের চিত্র-রূপায়ণ নয়; বরং স্বমহিমায় স্বতন্ত্রসত্তায় বিরাজমান। পুথি নির্বিশেষে চিত্রের বিষয় হল গৌতম বুদ্ধের জীবনের প্রধান আটটি ঘটনা (১ লুম্বিনী বনে জন্ম, ২ বুদ্ধগয়ায় বোধিলাভ; ৩ সারনাথে ধর্মচক্র প্রবর্তন, ৪ কুশীনগরে মহাপরিনির্বাণ, ৫ শ্রাবস্তী নগরে অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন, ৬ সঙ্কাশ্যে স্বর্গাবতরণ; ৭ রাজগৃহে নালগিরি বশীকরণ এবং ৮ বৈশালীর আম্রবনে বানরের মধুদান গ্রহণ), আর মহাযান-বজ্রযানসম্মত দেবদেবীর প্রতিকৃতি। দেবদেবীর মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছেন প্রজ্ঞাপারমিতা, তারা, লোকনাথ, মৈত্রেয়, মহাকাল, বজ্রপাণি, বসুধারা, কুরুকুল্লা, চুন্দা, বজ্রসত্ত্ব, মঞ্জুঘোষ প্রমুখ।

এখন প্রশ্ন হল, এই পুথিগুলি কোন উদ্দেশ্যে এবং কারা প্রস্তুত করিয়েছিলেন? এই প্রশ্নের প্রাথমিক উত্তর খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। পুথিগুলির কোনো কোনোটির দান-পুষ্পিকা থেকেই জানা যায় যে পুথিগুলির নির্বাহক ছিলেন মহাযানপন্থী বৌদ্ধ স্থবির-উপাসক-ভিক্ষুরা। এমন-কি মহাযানাশ্রয়ী সামন্তনৃপতি ও রাজকর্মচারীরও নাম পাওয়া যায় পুথির সংঘটক হিসাবে। আর এই পুথিগুলি তাঁরা করিয়েছিলেন পুণ্য কামনায়—কেবল নিজের নয়, আপন গুরু-উপাধ্যায়, মাতা-পিতা এমন-কি সকল প্রাণীসত্তার পুণ্যের জন্যে।

এই সাধারণ উদ্দেশ্যের চেয়ে কিছু গভীরতর প্রেরণার উৎস অবশ্যই দেখতে পাওয়া যায় 'প্রজ্ঞাপারমিতা' গ্রন্থের ভিতরেই। সরসীকুমার লিখছেন "এই গ্রন্থে যে তত্ত্বাদর্শ প্রচারিত হয়েছিল তা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে চিত্র-রচনার প্রেরণা। সম্যক বা অনুত্তর জ্ঞানের স্বরূপ আর মানবকল্যাণে তার যথাযথ প্রয়োগ কীর্তিত হয়েছে এই গ্রন্থে। সে কারণে তাত্ত্বিক মূল্যেরও উপরে স্বীকৃতি পেয়েছে গ্রন্থের ধর্মীয় গুরুত্ব। যে কোন ধর্মানুষ্ঠানে এই গ্রন্থের পাঠ ও আবৃত্তি পুণ্যার্জনের অপরিহার্য অঙ্গরূপে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের অনেক পুথিতেই এই ধরনের পাঠ ও আবৃত্তির সাক্ষ্য বর্তমান। গ্রন্থের অনেক স্থানে এই গ্রন্থের অনুলিপি-প্রস্তুতি একটি বিশেষ পুণ্যকর্ম বলে স্বীকৃতি পেয়েছে, আর ধূপ, দীপ, পুষ্প, মাল্য প্রভৃতি সহকারে এই গ্রন্থের অনুলিপির অর্চনার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বারবার। এই প্রকার পূজার্চনার সাক্ষ্যও আমাদের অনেক পুথিতেই বিদ্যমান। বহুল প্রচারিত এই মত ও আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে কালক্রমে গ্রন্থের ধর্মীয় গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল বিশেষভাবে। আর এই বিশ্বাস স্বতঃই বদ্ধমূল হয়েছিল যে গ্রন্থের অনুলিপি প্রস্তুতি ও দান আর গ্রন্থের পাঠ, আবৃত্তি, পূজার্চনা ইত্যাদি অনুত্তর জ্ঞানলাভের সহায়ক ও সমার্থক।"

এই মতাদর্শের সঙ্গে যখন কালক্রমে যুক্ত হল তান্ত্রিক ধর্মবিশ্বাস তখন এই 'প্রজ্ঞাপারমিতা' গ্রন্থেই প্রয়োজন হল নানান তান্ত্রিক দেবদেবীর প্রতিকৃতির সংযুক্তিকরণ। 'প্রজ্ঞাপারমিতা'র প্রতিপাদ্য হল শূন্যতা-বোধ এবং সেই বোধে পৌঁছবার উপায়। তন্ত্রমতে, এই শূন্যতাবোধ লাভ

করলে বীজমন্ত্রের মধ্যে অসংখ্য দেবদেবীর রূপদর্শন সম্ভব। সাধকের ধ্যানে এইসব দেবদেবী আপন আপন গুণ নিয়ে আবির্ভূত হন। সাধক দেবদেবীর দৃশ্যমান রূপ ধ্যান করে আপন সাধনপথে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই সাধকের ধ্যানের দেবদেবী ক্রমে তন্ত্রযান-বজ্রযান-কালচক্রযানীদের যত্নে আসন পেল সেইসব পুথির পাতায় যেগুলির পাঠ, আবৃত্তি ও পূজার্চনা মহাযান পরম্পরায় ছিল সিদ্ধির উপায়। এইসব বহুপূজিত মহাযান পুথিগুলির অঙ্গীভূত হয়ে তান্ত্রিক দেবদেবীর বিচিত্র প্রতিমাগুলিও একই সঙ্গে পূজিত হতে থাকলেন তান্ত্রিক সাধনার সহায়ক হিসাবে।

৬ বুদ্ধ-পূজারিণী, বুদ্ধগযাব মহাবোধি মন্দিব চত্ববে অবস্থিত প্রস্তবখণ্ডে উৎকীর্ণ চিত্র, আঃ চতুর্দশ শতাব্দ



৬ পাল চিত্রশৈলী : মার্গরীতির অনুবর্তন

পালযুগের চিত্রকলার রীতি ও শৈলীর ঠিকমতো বিচার পাল-পূর্ব ভারতের শিল্পকলার পটভূমিকাতেই করা সমীচীন। ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে গুপ্তসম্রাটদের শাসনকালে (খ্রি ৩২০-৫৭৬) ও তার নিকটবর্তী সময়ে।এই কালটি ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে মার্গ বা ক্লাসিকাল যুগ বলে চিহ্নিত হয়েছে। এই সময় ভারতীয় চিত্রকলা যে কতখানি উৎকর্ষ লাভ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাঘ, অজন্তা ও বাদামীর গুহাচিত্রে। এই গুহাচিত্রগুলিকে শিল্প-ঐতিহাসিকরা মার্গরীতির চিত্রকলা বলে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ভারতীয় মার্গ বা ক্লাসিকাল রীতির চিত্রকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার প্রবহমান নিরবচ্ছিন্ন ছন্দোময় রেখা ও বর্তনাগুণযুক্ত বর্ণের ব্যবহারে পরিপূর্ণ ডৌলসমৃদ্ধ রূপসৃষ্টি। এই চিত্রকলা ছিল সমকালীন ভাস্কর্যের সহযোগী। তাই পূর্ণায়ত ভাস্কর্যের মণ্ডনগুণকেই যেন সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে চেয়েছেন তখনকার চিত্রকর। অথবা, বলা যেতে পারে, একই শিল্পী ভাস্কর্য ও চিত্রকর্মে ব্রতী হয়ে একই রূপাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মার্গরীতি হিসাবে। গুপ্তযুগের এই রূপাদর্শ পরবর্তীকালের ভারতীয় কলাশিল্পের বিকাশে এক চিরায়ত আদর্শ হিসাবে অনুসৃত হয়েছে।

পাল আমলের সূচনায় শিল্পী ধীমান ও বিটপাল ভারতীয় মার্গরীতিকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত



৭ ললিতাসন বিষ্ণু ও ভক্ত-উপাসক, ডোম্মনপালদেবের তাম্রশাসন ফলকের বিপরীত দিকে উৎকীর্ণ চিত্র, বাক্ষসখালি (২৪ পরগনা দক্ষিণ), খ্রি ১১৯৬

করেছিলেন বলে মনে করার কাবণ আছে। কেননা তারনাথ[৯] উল্লেখ করেছেন যে ধীমান তাঁর শিল্পরীতিতে ছিলেন 'নাগ' শিল্পের অনুগামী। আর 'নাগ' পদবিধারী রাজাদের দ্বারা শাসিত মথুরা ছিল এই মাগরীতির এক আদি কেন্দ্র। এই অনুমান সত্য হোক বা না হোক নবম শতাব্দী থেকে যে-সব প্রস্তর ও ধাতুমূর্তি পাল শাসিত পূর্বভারতে আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলি যে গুপ্তকালীন আদর্শেই রূপায়িত সে বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। চিত্রকলার ক্ষেত্রেও পুথির পাতাব ক্ষুদ্র পবিসরে যে চিত্রাদর্শ অনুসৃত হয়েছে, তাতেও অজন্তা ও বাঘের প্রভাব সুস্পষ্ট। নীহাররঞ্জন রায় অজন্তার প্রাচীর-চিত্রেব সঙ্গে পাল-পুথিচিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ করে বলেছেন[১০], "স্বল্পায়তন পাণ্ডুলিপি-চিত্রের যাহা বিশেষ বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ সূক্ষ্মরেখাব ধীর অথচ তীক্ষ্ণগতি, সূক্ষ্ম ও ঘন কারুকার্য, বিন্যাসের ঘনত্ব ও গভীর ভাবনা-কল্পনার অনুপস্থিতি প্রভৃতি এই পাণ্ডুলিপি -চিত্রগুলিতে নাই। সেই জন্যই ইংরাজিতে miniature বলিতে যাহা আমরা বুঝি, এই পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলি সেই বস্তু নয়। আয়তন ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও এই পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলিব ভাবনা-কল্পনার আকাশ বিস্তৃত ও গভীর, পবিকল্পনা বৃহৎ, রেখার ডৌল ও বিস্তার দীর্ঘায়িত, বঙের বিন্যাস ও মণ্ডন প্রশস্তায়িত। এই দীর্ঘ, প্রশস্ত ও বৃহৎ বিস্তার একান্তই বৃহদায়তন প্রাচীর-চিত্রের। বস্তুত, প্রাচীর-চিত্রের লক্ষণই এই পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলিরও লক্ষণ, প্রাচীর-চিত্রই যেন পাণ্ডুলিপি-পত্রের সংকীর্ণ সীমাব মধ্যে স্বল্পায়তনে অঙ্কিত। সমসাময়িক বাংলাব এক কথায় পূর্ব ভারতীয় পাণ্ডুলিপি-চিত্রের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন। ইহারা আকারে ক্ষুদ্র, চরিত্রে বৃহদায়তন; ক্ষুদ্রচিত্রের বৈশিষ্ট্য ইহাদের মধ্যে অনুপস্থিত"। বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলি অবলম্বনে আঁকা পালপুথিচিত্রগুলিতে অজন্তার প্রাচীর-চিত্রের অনুরূপ রূপ ও বর্ণবিন্যাস নীহাররঞ্জনের বক্তব্যকেই যেন সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এই প্রসঙ্গে পাল-পুথিচিত্রের এক আদি নিদর্শন প্রথম মহীপালের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে (আ. ৯৮৫ খ্রি) অঙ্কিত 'ভগবান বুদ্ধের জন্ম'-এর দৃশ্যটি ও ১০৭১ খ্রিস্টাব্দে নেপালে অঙ্কিত 'বুদ্ধের ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে ধর্মদেশনা'র দৃশ্যটি লক্ষণীয়।

অন্যদিকে পাল-পুথিগুলির বৌদ্ধ দেবদেবীব প্রতিকৃতিতে দেখা যায় পাল-সেন আমলের মূর্তিশিল্পের সুস্পষ্ট প্রতিফলন। "প্রস্তর ও ব্রোঞ্জ প্রতিমায় যেমন, এই যুগের আলোচ্য চিত্রগুলিতেও তেমনই নির্দিষ্ট বঙ্কিমরেখার নিয়ন্ত্রণে মূর্তি মণ্ডনায়িত; রেখার প্রবহমান তরঙ্গ দেহ-কাঠামো, নাভিবৃত্ত এবং করাঙ্গুলিতে সুস্পষ্ট। পাথরে ও ধাতুতে যে তরঙ্গ সৃষ্টি কবা হইয়াছে সুদৃঢ় বস্তু-পদার্থের নমনীয় রূপান্তরের সাহায্যে, চিত্রে তাহাই সম্ভব হইয়াছে রঙের মণ্ডনের সাহায্যে। চিত্রের প্রতিমাগুলির মুখাবয়ব ও ভঙ্গি, দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংস্থান ও ভঙ্গি প্রভৃতি একটু যত্নের সঙ্গে বিশ্লেষণ করিলে সহজেই সমসাময়িক প্রস্তর-প্রতিমাশিল্পের সহিত এই চিত্রশিল্পের পারিবারিক সাদৃশ্য ধরা পড়িয়া যায়।"[১১]

পাল-পুথিচিত্র রীতি ও শৈলীর বিচারে উল্লিখিত দুটি সুনির্দিষ্ট শিল্পরীতির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে হয়। চিত্র-ঐতিহ্যের দিক থেকে এই পুথিচিত্রগুলি বাঘ-অজন্তা-বাদামীর ভিত্তি বা প্রাচীর-চিত্রের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত, এবং রূপাদর্শের দিক থেকেও তারা ওই প্রাচীর-চিত্রেরই অনুবর্তক। কিন্তু দেবদেবীর ধ্যান রূপায়ণে পাল চিত্রকরেরা ছিলেন সমকালীন প্রস্তর ও ধাতু নির্মিত প্রতিমাশিল্পের ওপর নির্ভরশীল। রীতির বিচারে পালচিত্রকলার এই হল সাধারণ চরিত্রলক্ষণ। প্রথম মহীপালের আমল থেকে রামপালের (আ. ১০৭২-১১২৬ খ্রি) কাল পর্যন্ত পালচিত্রকলায় এই দুই ধারার প্রভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে স্বল্পসংখ্যক ছবিতে হলেও স্বতন্ত্র এক চিত্ররীতির সাক্ষাৎ পাল-চিত্রকলায় পাওয়া যায়। এই রীতি সুস্পষ্টভাবেই অজন্তা-বাঘ-বাদামীর ক্লাসিক বা মার্গরীতি থেকে ভিন্ন চরিত্রের।

৭ 'মধ্যযুগীয়' চিত্ররীতি : পালশৈলীর অবক্ষয়

ক্লাসিক আদর্শের রূপকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল রং ও রেখাব পবিপূর্ণ মণ্ডনায়িত ডৌলে আকৃতি বচনা। প্রাক্ মধ্যযুগের ভারতে প্রধানত এই আদর্শেরই অনুবর্তন দেখা যায় তাব ভাস্কর্যশিল্পে। কিন্তু চিত্রকলায় এ সময় অপর এক রীতির বিকাশ ঘটে, যে রীতিকে শিল্প-ঐতিহাসিকেবা 'মধ্যযুগীয় চিত্ররীতি' বলে চিহ্নিত করেছেন। এই 'মধ্যযুগীয়' চিত্ররীতির চবিত্র লক্ষণ হল ডৌলবিহীন তীক্ষ্ণ রেখা এবং মণ্ডনগুণহীন সমতল রঙের প্রলেপ। এই 'মধ্যযুগীয়' রীতিব উদ্ভব ইলোরার ভিত্তিচিত্রে এবং তার ব্যাপক বিস্তৃতি পালচিত্রকলারই সমসাময়িক পশ্চিম ভারতেব জৈন পাণ্ডুলিপি বা পুথিচিত্রে। এক সময এই 'মধ্যযুগীয়' চিত্ররীতিকে জৈনধর্মাবলম্বীদের নিজস্ব অবদান বলে মনে করা হত। কিন্তু পরবর্তী গবেষণায় এই রীতিব সর্বভাবতীয় চবিত্র ও বিস্তৃতি স্বীকৃত হয়েছে।

পাল-পুথিচিত্রে এই 'মধ্যযুগীয়' রীতিব প্রথম সাক্ষাৎ মেলে মহীপালদেবের পঞ্চম বাজ্যাঙ্কে অঙ্কিত 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালযে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির পনেরোটি চিত্রে। রীতির বিচারে সরসীকুমার[১২] এই মহীপালদেবকে দ্বিতীয় মহীপালদেব বলে মনে করেছেন। দ্বিতীয় মহীপালের সংক্ষিপ্ত রাজত্বকাল ছিল একাদশ শতকেব সত্তরের দশকে। (এখানে উল্লেখ্য যে পশ্চিমভারতের জৈন পুথিচিত্রের আদি নিদর্শনও একাদশ শতকেব শেষ পাদের।) এই পনেরোটি চিত্রে 'মধ্যযুগীয়' রীতির পূর্ণ প্রকাশ না ঘটলেও, বর্ণের সমতলতা, রেখার তীক্ষ্ণতা আর দেহরূপেব বঙ্কিম ভঙ্গিমা সেই রীতিরই প্রাথমিক পরিচয় বহন করে। দ্বাদশ শতকের কোনো কোনো পালপুথিতে এই 'মধ্যযুগীয়' চিত্ররীতির সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু মনে হয় পূর্বভারতে 'মধ্যযুগীয়' রীতির প্রাচীনতর উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় ১০১৫ খ্রিস্টাব্দে আঁকা এবং বর্তমানে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রাখা 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা' পুথির চিত্রগুলিতে। এই ছবিগুলির অন্যতম 'ভৃকুটিতারা'র ছবিটি পরীক্ষা করলে এ কথা সহজেই প্রতীয়মান হবে যে এটি পশ্চিম ভারতের জৈন পুথিচিত্রে পরিণতি প্রাপ্ত 'মধ্যযুগীয়' রীতির বিশেষ চরিত্রলক্ষণগুলি—যেমন দ্বিমাত্রিক রূপসংস্থান, তরল পীতবর্ণের প্রলেপন, এবং তীক্ষ্ণরেখাব মণ্ডনগুণহীন প্রযোগ বহন করছে। তাই এই পুথিচিত্রগুলিকে 'মধ্যযুগীয়' রীতির প্রাথমিক অভিব্যক্তি মনে করা অযৌক্তিক হবে না।

পূর্বভারতে 'মধ্যযুগীয়' চিত্ররীতির পূর্ণ বিকাশ ও বিস্তার ঘটে ওঠেনি। তাই দেখা যায় একাদশ শতকের শেষ পাদ থেকে দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত সময়ে বামপালদেবেব রাজত্বকালে অন্যূন যে সাতখানি পুথিতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ দেবদেবীর চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল, তার সবকটিই মার্গরীতি অনুযায়ী মণ্ডনগুণযুক্ত রং ও রেখায় রূপায়িত। সমকালীন বর্মণ নৃপতি হরিবর্মদেবের (আঃ ১০৭৩-১১২৭ খ্রি) রাজত্বকালের অপর দুখানি পুথির চিত্রেও একই মার্গ-রীতি অনুসৃত হয়েছে।

কিন্তু পালশাসনের অবসানে দ্বাদশ শতকের অন্তিমকাল থেকে 'মধ্যযুগীয়' রীতি যে পূর্বভারতে বেশ কিছুটা ছাপ ফেলতে পেরেছিল, তার প্রমাণ মেলে তিনটি স্বতন্ত্র সূত্র থেকে। এই প্রমাণগুলি হল: ১ বাংলায় আবিষ্কৃত তিনটি তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ রেখাচিত্র; ২ বুদ্ধগয়ার

মহাবোধি মন্দিরের মেঝের প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ কয়েকটি রেখাচিত্র, ৩ পাল-পরবর্তীকালের তিনটি পুথির চিত্র।

তাম্রপট্ট তিনটির একটি মুদ্রিত হয়েছে আনন্দ কুমারস্বামীর 'পোর্টফোলিও অব ইন্ডিয়ান আর্ট' গ্রন্থে[১১]। অপর দুটি রয়েছে কলকাতার আশুতোষ সংগ্রহশালায়। শেষোক্ত দুটি তাম্রপট্টই দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের—একটি সুন্দরবনের বাক্ষসখালিতে প্রাপ্ত রাজা ডোম্মনপালের (খ্রি ১১৯৬), অন্যটি চট্টগ্রাম জেলার মেহারগ্রামে প্রাপ্ত জনৈক দেববংশীয় নৃপতির। গুণগত বিচারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ডোম্মনপালের তাম্রপট্টের পিছনে উৎকীর্ণ রেখাচিত্রটি। চিত্রটি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, রথে ললিতাসন ভঙ্গিতে উপবিষ্ট বিষ্ণুর। তাঁর দক্ষিণে গরুড়ধ্বজ, বামে ভূমিতে নতজানু অঞ্জলিপুট এক ভক্ত। এই উৎকীর্ণ চিত্রের বৈশিষ্ট্য হল রেখার দ্রুত ও চঞ্চল গতিশীলতা। স্পষ্টতই এই রেখা নাগরীতির মণ্ডনগুণযুক্ত রেখা থেকে ভিন্ন চরিত্রের। এই রেখা তীক্ষ্ণ এবং কিছুটা স্খলিত, যেন স্নায়বিক চাপের অভিব্যক্তি। ভগবান ও ভক্তের মুখমণ্ডলও মূর্তিশিল্প অনুযায়ী পালচিত্রকলার দেবদেবীর মুখমণ্ডল থেকে স্বতন্ত্র এক আদর্শে রূপায়িত। নাক, চোখ, চিবুক এমন-কি গদা-পদ্ম-শঙ্খ ও কিরীটের অগ্রভাগ সুতীক্ষ্ণ কৌণিকতা চিহ্নিত। এ সবই পূর্ণবিকশিত 'মধ্যযুগীয়' চিত্ররীতির চরিত্রলক্ষণ। পশ্চিমভারতে জৈন পুথিপত্রে এই লক্ষণগুলি পরিণতি লাভ করে দ্বাদশ শতক থেকেই।



৮ জাতক-দৃশ্য 'কালচক্রতন্ত্র', পুথির অবরক পাটার ওপরে অঙ্কিত চিত্র, আরা (বিহার), খ্রি ১৪৪৬

দ্বিতীয় সূত্রের সাক্ষ্য বুদ্ধগয়ার মন্দিরের মেঝের প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ রেখাচিত্রগুলিব কাল চতুর্দশ শতকের প্রথম পাদ—খ্রিস্টীয় ১৩০২ থেকে ১৩৩১ অব্দ[১৪]। এই রেখাচিত্রগুলি হল দূর দূর দেশ থেকে সমাগত মন্দিরের ভক্ত পূজারিদের। এই ছবিগুলির মধ্যে সব থেকে প্রতিনিধিস্থানীয় হল এক দম্পতির চিত্র। 'মধ্যযুগীয়' চিত্ররীতির দ্বিমাত্রিক আদর্শে বুদ্ধ-উপাসক দম্পতি রূপায়িত হয়েছেন—স্বামীর পিছনে স্ত্রী বোধিদ্রুমের পাতা করপুটে নিয়ে নতজানু হয়ে বসে আছেন। ভক্তের এই ঘনিষ্ঠ চিত্রায়ণেও দেখা যায় সেই মণ্ডনগুণহীন তীক্ষ্ণ বেখার ব্যবহার। অতিরিক্ত আর যা দেখা যায় তা হল মধ্যযুগীয় রীতির আর এক বিশিষ্ট লক্ষণ—দ্বিতীয় চক্ষুটি মুখমণ্ডল থেকে বিচ্ছুরিত।

তৃতীয় প্রমাণ মেলে তিনটি তারিখযুক্ত চিত্রিত পুথি থেকে[১৫]। এই তিনটি পুথি হল ক. ১২৮৯ খ্রিস্টাব্দে লিখিত ও বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত 'পঞ্চরক্ষা' পুথি, খ. ১৪৪৬ খ্রিস্টাব্দে লিখিত ও বর্তমানে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগাবে রক্ষিত দুই চিত্রিত পাটাসহ 'কালচক্রতন্ত্র'-এর পুথি; এবং গ. ১৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে লিখিত ও বর্তমানে বোম্বাইয়ের জনৈক সংগ্রাহক কর্তৃক রক্ষিত একটি সচিত্রপাটাসহ চিত্রিত পুথি। কী কালের বিচারে কী রীতির বিচারে এই পুথি ও পাটার ছবিগুলি পালচিত্রকলার ধারার শেষ নিদর্শন। স্বভাবতই এই পুথিচিত্রগুলিতে পালচিত্ররীতির অবক্ষয় সুস্পষ্ট। এগুলির বিষয়বস্তু প্রধানত তান্ত্রিক দেবদেবী এবং গুরুত্বও মূলত মূর্তিতাত্ত্বিক। নচেৎ রেখার শ্লথতা এবং বর্ণের আতিশয্য ছবিগুলিকে নান্দনিক গুণহীন করে তুলেছে। কিন্তু যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তা হল এই ছবিগুলিব বেশ কয়েকটিতেই 'মধ্যযুগীয়' চিত্ররীতির চরিত্রলক্ষণ দেখতে পাওযা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত যে পালচিত্রকলার অস্তিত্ব এখন আর কেবলমাত্র পুথিচিত্রনির্ভব নয়। কয়েক বছর আগে নালন্দার সরাই ঢিবি খনন করে যে বৌদ্ধ মন্দিরটির নিম্নভাগ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার অভ্যন্তরে পালযুগে আঁকা ভিত্তিচিত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে। কালের বিপর্যয়ে এই চিত্রের যে সামান্য অংশটুকু টিকে আছে তা হল মন্দিরের গর্ভগৃহের বাইরের দেযালে অঙ্কিত লতাপুষ্প, চলমান হস্তী ও বৌদ্ধ দেবতা কুবের। ছবিগুলি ছিল বহুবর্ণের, কিন্তু এখন তার প্রায় কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। ফলে এই ছবিগুলির শৈলীবিচারও পুরোপুরি করা এখন আর সম্ভব নয়। তবু ছবির যতটুকু আদল দেখতে পাওয়া যায়, তা থেকে এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে এই ভিত্তিচিত্র ও পাল-আমলের পুথিচিত্র একই শৈলীর অভিব্যক্তি[১৬]।

৮ সুলতানি শাসনকাল ও চিত্রকলা

একাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলই বৌদ্ধ পালরাজাদের হাত থেকে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুগামী সেন ও বর্মণ রাজাদের অধিকারে চলে যায়। পাল রাজারা ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণু। তাই তাঁদের শাসনকালে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য থাকলেও হিন্দু পৌরাণিক দেবদেবীর মন্দিরস্থাপন ও মূর্তিনির্মাণে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। বরং নয়পাল (আ. ১০২৭-৪৩ খ্রি) ও তৃতীয় বিগ্রহপালকে (আ. ১০৪৩-৭০ খ্রি) দেখা যায় হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করছেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্য থেকে আগত সেন ও বর্মণ রাজারা ছিলেন বেদ-ব্রাহ্মণ তথা বর্ণাশ্রম-আশ্রয়ী হিন্দুধর্মের উদ্যমী পরিপোষক। তাঁদের আমলে বাংলার বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের যে নিগৃহীত হতে হয়েছিল, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রতিকূল পরিবেশে স্বাভাবিকভাবেই পাল-পুথিচিত্রের প্রবাহিত ধারাটি ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়ে। তবে সেই ধারা যে সহসাই রুদ্ধ হয়ে যায়নি তার সাক্ষ্য মেলে লক্ষ্মণসেন (আ. ১১৭৯-১২০৬ খ্রি) ও হরিবর্মদেবের রাজ্যাঙ্কে লিখিত ও চিত্রিত বৌদ্ধপুথিগুলিতে।

তুলনায় অনেক বড় বিপর্যয় দেখা দিল ত্রয়োদশ শতকের সূচনায়—যখন ইসলামধর্মী তুর্কি-অধিনায়ক বখতিয়ার উদ্দীন খলজি সহসা নবদ্বীপ অধিকার করে পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের শাসক হন। কী ধর্মবিশ্বাসে, কী সংস্কৃতিতে তুর্কিরা ছিলেন স্বতন্ত্র ধারার মানুষ। তাঁদের আক্রমণ থেকে বৌদ্ধ বা হিন্দু কেউই নিস্তার পেলেন না। তাঁদের হাতে মঠ ও মন্দির একইভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। সেই মঠ ও মন্দিরের ইট-পাথর দিয়ে তৈরি হল ইসলামের উপাসনাগৃহ। এই তুর্কি আক্রমণে দক্ষিণ বিহার ও বাংলার বৌদ্ধ বিহারগুলি ধ্বংস হওয়ার ফলেই নিরাশ্রয় হয়ে পূর্বভারতের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আশ্রয় নিলেন নেপালে ও তিব্বতে। তাঁদের সঙ্গে পূর্বভারতীয় শিল্পরীতিও আশ্রয় পেল ওই দুই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দেশে। এইভাবেই বাংলার রূপকলার ভিত্তিতে গড়ে উঠল নেপাল ও তিব্বতের ভাস্কর্য ও চিত্রকলা। তিব্বত ইতিপূর্বেই অতীশ দীপঙ্কর প্রমুখ বৌদ্ধ ধর্মগুরুর শিক্ষায় মহাযান-বজ্রযান ধর্মমত গ্রহণ করেছিল।

প্রারম্ভিক সংঘাত ও বিরোধের পর চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই বাংলার সুলতানি শাসনে এক নবযুগের সূচনা ঘটল। ইলিয়াস শাহের (১৩৪২-৫৭ খ্রি) আমল থেকে বাংলার স্বাধীন সুলতানরা দেশশাসনের ব্যাপারে হিন্দু জমিদার ও প্রশাসকদের সঙ্গে এক বোঝাপড়ার মাধ্যমে দেশে সুশাসন প্রবর্তনে সক্ষম হন। কী রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে, কী এক বিশেষ আঞ্চলিক সংস্কৃতির বাহক হিসাবে বাংলার বৈশিষ্ট্য সর্বভারতীয় স্বীকৃতি অর্জন করে। বাংলার সুলতানেরা ইসলামে পূর্ণবিশ্বাসী থেকেও বাংলার দেশজ-সংস্কৃতির প্রতি যে বিশেষ যত্নবান ছিলেন তা জানা যায় রামায়ণ মহাভারত প্রমুখ মহান সংস্কৃত গ্রন্থগুলির বাংলা অনুবাদে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে। এই পৃষ্ঠপোষকতা ইলিয়াস শাহি শাসনকালে শুরু হয়ে হুসেন শাহি (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রি) শাসনকালে আরও ব্যাপ্তি লাভ করে। স্বয়ং হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি) ছিলেন চৈতন্যদেবের গুণগ্রাহী, অন্যদিকে চৈতন্যদেব তাঁকে সুশাসক হিসাবে সম্মান প্রদর্শনে ছিলেন অকুণ্ঠ। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলে, দেশের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধির ফলে, সাংস্কৃতিক বিকাশ এমন এক স্তরে পৌঁছেছিল যার তুলনা চলে কেবলমাত্র পালশাসনকালের

সঙ্গেই। সুলতানি আমলে বাংলার স্থাপত্যকর্মগুলি একদিকে যেমন সমকালীন উত্তরভারতীয় সুলতানি স্থাপত্যের প্রভাব প্রদর্শন করে, অন্যদিকে সেগুলি বিশেষভাবে বাঙালির সৃজনশীলতার সাক্ষ্যও বহন করে। দেশজ সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী হলেও সুলতানদের অনেকেই ছিলেন মুসলিম দুনিয়ার সংস্কৃতির প্রতি সমপ্রাণ। তাই দেখা যায় ইলিয়াস শাহি সুলতান ঘিয়াসুদ্দিন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রি) পারস্যের কবি হাফিজের সঙ্গে পত্রবিনিময় করে অনুরোধ জানাচ্ছেন তাঁর অসম্পূর্ণ গজল সম্পূর্ণ করে দিতে। চীনা বাণিজ্য-প্রতিনিধি মাহুয়ানের বর্ণনা থেকেও জানা যায় পঞ্চদশ শতকে বাংলাদেশে ব্যবহৃত ভাষা ছিল বাংলা ও ফারসি। এই একই ধারায় হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহকে (১৫১৯-১৫৩২ খ্রি) দেখা গেল বাংলার দরবারে আনুকূল্য করছেন সুদূর পারস্যের বিশিষ্ট চিত্ররীতির।

অন্যদিকে, ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে, মুসলমান শাসনের প্রারম্ভিককালে, উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বাংলার মূর্তি ও চিত্রকলার অনুশীলন বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে সম্ভবত মূর্তি শিল্পের না হোক, চিত্রশিল্পের কিছু অবশেষ গ্রামীণ লোকচিত্রের স্তরে গ্রামের সাধারণ মানুষের পোষকতায় রক্ষিত হয়েছিল। কেননা পরবর্তীকালের গ্রামবাংলার পটচিত্রে প্রাচীন ও আদি-মধ্যযুগের চিত্রকলার বেশ সহজেই চোখে পড়ে। এ সময় বাংলার শিল্পীরা যে সকলেই কর্মহীন হয়ে পড়েছিলেন, তা হয় তো নয়। কেননা নতুন শাসকবর্গ তাঁদের নিজস্ব উদ্যমে এই সময় থেকেই নতুন এক রীতির স্থাপত্যকর্মের সূত্রপাত করেন, গৌড়ের মসজিদ ও সমাধিসৌধগুলিতে আজও যার পরিচয় পাওয়া যায়। মূলত পোড়ামাটির ইট ও টালিতে তৈরি এই স্থাপত্যকর্মগুলি নির্মিত হয়েছিল এ দেশেরই কারিগরদের দ্বারা। টালি ও ইটের নকশায় যে জ্যামিতিক ও লতাপুষ্পের অলংকরণ দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি পশ্চিম এশিয়ার আরবীয় ও ভারতীয় নকশার সমন্বয়েই পরিকল্পিত। রক্ষণশীল ইসলামি মতবাদ অনুসারে মানুষ ও পশুপাখির রূপায়ণ হল নিষিদ্ধকর্ম। তাই এই কালের চিত্রশিল্পীর রূপভাবনার যেটুকু পরিচয় তা পাওয়া যায় গৌড়-পাণ্ডুয়ার সুলতানি স্থাপত্যকর্মের অলংকরণস্বরূপ নানান নকশায়।

৯ গৌড়ের দরবারে পারসিক শৈলীর চিত্রকর

চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশেষত, শেষ ক্ষমতাশালী তুঘলক সম্রাট ফিরোজ শাহের মৃত্যু (১৩৮৮ খ্রি) এবং তৈমুরের উত্তরভারত আক্রমণ ও দিল্লি লুণ্ঠনে (১৩৯৮ খ্রি) এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যার সুযোগে দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের মতোই উত্তরভারতের গুজরাট, মালব, জৌনপুর ও বাংলার সুলতানরাও স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। ভারতের চিত্রকলার ইতিহাসে এইসব প্রাদেশিক সুলতানদের বিশেষ অবদান স্বীকৃত হয়েছে। পূর্বভারতের বৌদ্ধ ও পশ্চিমভারতের জৈন পুথিচিত্রের পরম্পরার পর এই সুলতানদের দরবারেই নতুন এক ধারার অণুচিত্র বা মিনিয়েচারের অনুশীলন শুরু হয়। নতুন এই চিত্ররীতির উৎস হল পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় অনুসৃত সুসমৃদ্ধ পারসিক বা ইরানীয় পাণ্ডুলিপি-চিত্রকলা। নসরৎ শাহের দরবারে এই সমৃদ্ধ পারসিক চিত্রশিল্পের ধারা এসে পৌঁছেছিল। তাঁর আগে বা পরে আর কোনো সুলতান বাংলার দরবারে পারসিক চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন কি না তা সঠিকভাবে জানা যায় না। কিন্তু চীনা পরিব্রাজক মাহুয়ান-[৭] লিখে গেছেন যে তিনি বাংলার নানা শহরে পেশাদারি শিল্পীদের দেখেছেন। এইসব শিল্পীদের মধ্যে অবশ্যই পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার শিল্পীদের উপস্থিতি থেকে থাকতে পারে।

আলোচ্য চিত্রকৃত পাণ্ডুলিপিটি হল নিজামি রচিত 'ইস্কান্দারনামা' বা 'আলেকজাণ্ডারের কাহিনী' ভুক্ত 'শরফনামা'। এটি গৌড়ের সুলতান নসরৎ শাহের জন্য ১৫৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দে জনৈক হামিদ খান কপি করেছিলেন। বর্তমানে এই দুর্লভ পাণ্ডুলিপিটি রক্ষিত আছে লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে। যদি সমকালীন মালবে অঙ্কিত 'নিমৎনামা'র ছবিগুলির সঙ্গে তুলনা করা হয় তবে 'ইস্কান্দারনামা'র ছবি যে উৎকৃষ্টতর সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। কী রূপবিন্যাসে, কী মানুষের অবয়ব রচনায় 'ইস্কান্দারনামা'র ছবিকে পারসিক চিত্রকলার এক সুপরিণত ঐতিহ্যেরই অনুগামী বলে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। তবে পারসিক চিত্রকলার কোন্ পর্যায়ের ধারা এই সুদূর বাংলায় এসে পৌঁছেছিল তা অনুধাবন করতে হলে কিছু ঐতিহাসিক আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

খ্রিস্টান বা ইহুদিদের তুলনায় বইয়ের প্রতি অনেক বেশি আগ্রহ মুসলিম দুনিয়ায় দশম শতক থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। বইয়ের প্রতি এই আগ্রহের ফলে খ্যাতিমান লিপিকার বা ক্যালিগ্রাফারকে কোরানের একটি পাতা লেখার জন্য বিপুল পরিমাণ দক্ষিণা দেওয়ার রেওয়াজ তখন থেকেই। কালক্রমে আরবি হরফের নানান রূপান্তর ঘটতে থাকে এবং সেই হরফ আলংকারিক চরিত্র অর্জন করে। প্রথম প্রথম ক্যালিগ্রাফির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই আরবীয় লতাপুষ্পের নকশা দিয়ে সজ্জিত করা হত পাণ্ডুলিপির পাতাগুলি। তারপর মুসলিম জগতের ইতিহাসের কাহিনী বর্ণিত গ্রন্থে দেখা দিল চিত্ররূপায়ণ। তবে যেহেতু ইসলামীয় বিশ্বাসে প্রকৃতির অনুকৃতি ছিল অসিদ্ধ, সেইহেতু চিত্ররূপায়ণে দেখা গেল বাস্তবানুগত্য অপেক্ষা আদর্শায়িত কল্পনাজাত এক রূপজগৎ। সে জগতের মানুষ, পশু-পাখি, গাছ-পালা সবই যেন ভিন্ন কোনো এক রূপলোকের বাসিন্দা। উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত ছবিগুলি পাণ্ডুলিপির গৌরব ও মূল্য বহুগুণে বাড়িয়ে দিল। দক্ষ লিপিকর ও নিপুণ শিল্পীর দ্বারা লিখিত ও সজ্জিত এইসব মূল্যবান গ্রন্থের

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ধনী ও রুচিসম্মত অভিজাত মুসলমানেরা। পারস্য প্রাচীনকাল থেকেই শিল্পকলায় ছিল সমুন্নত। অন্যদিকে সদ্যোত্থিত আরবীয় ইসলামশক্তি বাইজেন্টাইন অধিকার করে নিলে সেখানকার রূপকলার বর্ণাঢ্য বৈভবও আকৃষ্ট করল মুসলিম চিত্রকরদের। মধ্য এশিয়ার তুর্কমানরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তাদের মাধ্যমে চীনা চিত্ররীতির পরম্পরার সংস্পর্শেও এলেন এইসব চিত্রকরেরা। এইভাবে অন্তত‌পক্ষে তিনটি শিল্পধারার পরম্পরার সংযোগের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠল মুসলিম পাণ্ডুলিপি-চিত্রের ঐতিহ্য।

পঞ্চদশ শতকে তৈমুরের বংশধরদের আনুকূল্যে তৈমুরীয় শৈলীর ক্ষুদ্রায়তন পাণ্ডুলিপি-চিত্র বিকাশ লাভ করে। সে চিত্রকলা আরও পরিণত ও পরিশীলিত হয় ষোড়শ শতকে—পারস্যের বিখ্যাত সাফাবিবংশের শাসনকালে। সাফাবি সুলতান শাহ ইসমাইল (১৫০১-১৫২৪ খ্রি) পশ্চিম পারস্যের তাব্রিজ শহরে রাজত্ব শুরু করে নানাদিকে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি তৈমুরবংশীয় সুলতানদের এককালীন রাজধানী পূর্বপারস্যের হিরাট শহরটিও অধিকার করে নেন। হিরাট ছিল পরিশীলিত সংস্কৃতির এক শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র, যেখানে তিমুরাইডদের পৃষ্ঠপোষকতায় পাশাপাশি বসবাস করতেন কবি, শিল্পী ও দার্শনিকেরা। শাহ ইসমাইল এই হিরাটেই তাঁর পুত্র তাহমাস্পকে পাঠিয়েছিলেন শিক্ষালাভের জন্য। হিরাটে তাহমাস্প পালিত হন শিল্পরসিক অমাত্য কাদি-ই-জাহানের কাছে। বাল্যের এই সাহচর্যই তাহমাস্পকে পরে পারস্যের চিত্রকলার এক শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক করে তোলে। তরুণ রাজকুমার তাহমাস্পকে খুশি করার জন্যেই যেন সুলতান শাহ ইসমাইল তৈমুরীয় দরবারের মহান শিল্পী বিহ্‌জাদকে রাজকীয় গ্রন্থশালার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। তাহমাস্প সিংহাসনে আরোহণ করলে (১৫২৪ খ্রি) বিহ্‌জাদ তাঁর দরবার অলংকৃত করলেন। বিহ্‌জাদ তাঁর তৈমুরীয় শৈলীর অভিজ্ঞতায় সাফাবি চিত্রশৈলীকে পরিশীলিত করতে সহায়ক হন—তিনি ছিলেন যেন তৈমুরীয় ও সাফাবি চিত্রশৈলীর মধ্যবর্তী সেতু। সাফাবি শৈলীর এই প্রথম দিককার ধারাই এসে পৌঁছেছিল বাংলায় নসরৎ শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় গৌড়ে অঙ্কিত 'ইস্কান্দারনামা'র পাণ্ডুলিপি চিত্র যার সাক্ষ্য। বাহাত্তর পাতার এই পাণ্ডুলিপিতে ছবি অঙ্কিত আছে নটি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনো ছবিতেই শিল্পীর নামসই নেই। ফলে ছবিগুলি কার আঁকা তা জানা যায় না। এই ছবিগুলি মূলত পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধের পারসিক চিত্রধারায় অঙ্কিত হলেও বিহ্‌জাদের নিজস্ব শৈলীর কিছু ছাপ বহন করছে বলে মনে হয়—যেমন রূপবিন্যাসের শৃঙ্খলায় ও মনুষ্য অবয়বের ভঙ্গিমায়। আলোকবিচ্ছুরিত আকাশের সঞ্চরমাণ মেঘের রূপায়ণেও বিহ্‌জাদের প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তা হল এই ছবিগুলিতে বাংলার স্থানীয় প্রভাবও একই সঙ্গে লক্ষ করা যায়। রূপনির্মিতির সাবল্যে, বিশেষত পাতাকাটা খিলান, ছত্রি ও নানাবর্ণের টালির অলংকরণ সমন্বিত স্থাপত্যের সুমিত ব্যবহারে, এবং বৃক্ষের রীতিসিদ্ধ রূপায়ণে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের গৌড়ের পরিবেশ শিল্পীর রূপভাবনায় কাজ করেছিল বলে মনে হয়। ছবিগুলিতে এই ভারতীয় প্রভাবের কথা এন্ড্রু টোপ্‌সফিল্ড ও জেরোমিয়া লোস্টি দু'জনেই স্বীকার করেছেন[১৮]। লোস্টি অবশ্য মনে করেন যে এই ছবিগুলির রূপকাঠামো পঞ্চদশ শতকের সিরাজের চিত্রকলার অনুগামী। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে এইসব মিনিয়েচারের রং সিরাজের ছবির রঙের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল ও উষ্ণ।

পারস্যের শিল্পীরা যে সে সময় একমাত্র সাফাবি সুলতান শাহ তাহমাস্পের ও তাঁর অমাত্যদের পৃষ্ঠপোষকতার ওপরই নির্ভরশীল ছিলেন, তা নয়। কৃতী শিল্পীরা অটোমান,উজবেগ, এমন-কি ভারতের প্রাদেশিক সুলতানদের দরবারেও সাদরে গৃহীত হতেন। নসরৎ শাহের

আমলে গৌড়ের সুলতানি দরবারে এইভাবেই আহূত হয়েছিলেন সুদূর পারস্যের শিল্পী। এরও কিছুকাল পরে, ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে, তাহমাস্প চিত্রকলার প্রতি তাঁর বিশেষ আতিশয্যকে ইন্দ্রিয় পরায়ণতাজাত মানসিক দুর্বলতার লক্ষণ মনে করে সম্পূর্ণভাবে চিত্রকলার পোষকতা ত্যাগ করলে সাফাবি দরবারের অনেক শিল্পীকেই বাধ্য হয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে হয়। তারই ফলে সাফাবি শৈলীর অন্ততপক্ষে চারজন যশস্বী শিল্পী মির মুসব্বির, মির সৈয়দ আলি, দোস্ত মহম্মদ ও আব্দুল সামাদ ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে হুমায়ুনের দরবারে চলে আসেন। আকবরেব আগ্রহে ও আনুকূল্যে তাঁদেব হাতেই সূচিত হয় দরবারি মুঘলচিত্রকলা। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য হল প্রাদেশিক সুলতানদের দরবারে তাব আগেই পারসিক শিল্পীদের পোষকতা মিলেছিল। আব সেই সুলতানদেব অন্যতম ছিলেন বাংলার নসরৎ শাহ।

৯ চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-এব নৃত্য, পাটচিত্র, বাঁকুড়া, আঃ সপ্তদশ শতক



১০ চৈতন্যদেব-আশ্রিত বৈষ্ণব চিত্রকলার উন্মেষ ও বিষ্ণুপুর

হুসেন শাহি বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়। স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার দরবারে পারসিক ও আরবিক সংস্কৃতির প্রভাব ছিল প্রবল। তখন ফারসি ভাষাই তো ছিল সরকারি ভাষা, আর সেই অনুষঙ্গেই পারসিক চিত্রকলা পোষিত হয়েছিল নসরৎ শাহের সভায়। কিন্তু সে সময় ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে যে নগরটি প্রাণবন্ত ছিল তা হল নবদ্বীপ। হুসেন শাহের আমলে চৈতন্যের আবির্ভাব ওই নবদ্বীপ শহরেই। নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি আর স্মার্ত রঘুনন্দনের নবদ্বীপে কলাশিল্পের চর্চা কতদূর ছিল তা পরিষ্কারভাবে জানা যায় না। তবে গৃহস্থের জীবনে পূজাব্রততে আলপনা রচনা আর বিবাহে পিড়ি অঙ্কনের যে প্রচলন ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া নৃত্য-গীত অভিনয়কলায় চৈতন্যদেবের পারদর্শিতা থেকে মনে হয় ওই সব শিল্পের অনুশীলনও নবদ্বীপে ছিল। তুলনায় বরং চিত্রকলা সম্পর্কে তথ্য প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না চৈতন্যজীবনী-কাব্যগুলি থেকে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে নবদ্বীপে চিত্রকলার চর্চা ছিল না। অধুনা আবিষ্কৃত বংশীবদনের লেখা 'শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত' গ্রন্থে[১১] নবদ্বীপের চিত্রকলার স্পষ্ট

১০ কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা, পাটচিত্র. বাঁকুড়া, সপ্তদশ শতক



বিবরণ পাওয়া গেছে। বংশীবদন ছিলেন চৈতন্যের অন্তর্ধানের পর শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণকারী। তিনি লিখছেন: শ্রীবাসমন্দিরে জনৈক ভাস্কর শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণের 'গোদোহনলীলা' চিত্রপটে প্রদর্শন করলে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ ভাবাবেশে 'গোপলীলানুকরণ' করে নৃত্য করেছেন। এই গ্রন্থে অন্যত্র বলা হয়েছে যে ভাগবতগণের সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণের পর শ্রীগৌবাঙ্গ 'চিত্রগৃহে' বিশ্রাম নিলেন।

এ হেন চৈতন্যদেবেব ধর্মকে আশ্রয় করে নৃত্য-গীত-অভিনয়ের সঙ্গে চিত্রকলার বিকাশ ছিল স্বাভাবিক। বিশেষত, তিনি তাঁর 'প্রেমভক্তি'র ধর্মকে ভাবোন্মাদনার মধ্য দিয়েই—ধর্মীয় অনুভূতিব সঙ্গে শিল্পানুভূতিকে সম্মিলিত করেই—সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর নিজেব মধ্যেই ছিল এই দুই—ধর্মীয় ও কাব্যিক—অনুভূতির সহাবস্থান; তিনি খ্যাত হন 'সংকীর্তন বস-নৃত্যবিহাবী' নামে। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার সংস্কৃতি স্ফূর্ত হয়ে উঠেছিল তাঁবই অনুপ্রাণিত 'প্রেমভক্তি'নির্ভর বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের ভিত্তিতে। সেই ধর্মান্দোলন এক নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিযে বাংলার চিত্রকলাকেও বিশেষভাবে সঞ্জীবিত কবে তুলেছিল।

ঘটনাটি ঘটে ষোড়শ শতকেব শেষদিকে। বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীব কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন ও গোপাল ভট্টেব কাছে দীক্ষা গ্রহণেব পর বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচিত একগাড়ি শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে বাংলায ফিবছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। তাঁর সঙ্গী ছিলেন নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ। দুর্গম জঙ্গলপথ পেবিয়ে গাড়ি বন-বিষ্ণুপুব পৌঁছলে গোপালপুব গ্রামে একদল দস্যু ধনদৌলত মনে করে বৈষ্ণবগ্রন্থাদি লুঠ কবে নেয়। লুণ্ঠিত গ্রন্থেব উদ্ধাবের আশায় শ্রীনিবাস হাজির হন বন-বিষ্ণুপুরেব মল্লবাজা বীব হাম্বীরেব রাজসভায়। হাম্বীব তাঁর সাত্ত্বিক রূপদর্শনে ভাবান্তরিত হয়ে সপবিবাবে তাঁব কাছে দীক্ষা নেন। এই ঘটনায কেবল মল্লভূমির নয়, সাবা বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে রূপান্তব দেখা দেয। হাম্বীর এবং তাঁব পুত্র ও পৌত্র রঘুনাথ সিংহ ও বীব সিংহেব পৃষ্ঠপোষকতায সাবা সপ্তদশ শতক জুড়ে বিষ্ণুপুবে বৈষ্ণবধর্মাশ্রিত সাহিত্য ও সংগীত, মন্দিব-স্থাপত্য ও চিত্রকলা এক অভূতপূর্ব সৃজনশীলতায় বিকাশলাভ কবে। এই সাংস্কৃতিক বিকাশ অষ্টাদশ শতকেব মধ্যভাগ, অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের সূচনাকালে বিষ্ণুপুব রাজাদের বিপর্যয ঘটাব পূর্ব পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থেকে বাংলাব পবম্পরাগত কলাশিল্পকে আধুনিক কালেব দোবগোড়ায পৌঁছে দিযেছিল।

১১ পাটাচিত্র উৎকর্ষ ও অপকর্ষ

বিষ্ণুপুরের মন্দিব-স্থাপত্য ও পোড়ামাটির ভাস্কর্যে যেমন, চিত্রকলাতেও তেমনই বাঙালির নিজস্ব রূপবোধের পরিচয় সুস্পষ্ট। এই রূপকলাব শ্রেষ্ঠ যে নিদর্শন প্রকৃতি ও মানুষের বিধ্বংসী হাত থেকে কোনোক্রমে বক্ষা পেয়েছে তা হল কয়েকটি পাটাচিত্র। চিত্রিত পাটা বা কাঠের ফলকগুলি ব্যবহৃত হত পুথির ওপরে ও নিচে—সংরক্ষক হিসাবে। পাল আমলের মতোই এ পাটাগুলিও চিত্রিত হয়েছে সমকালীন ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিষয় অবলম্বনে। বিষ্ণুপুর তথা বাঁকুড়ার বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্ট চিত্রিত পাটা সংগৃহীত আছে কলকাতাব আশুতোষ সংগ্রহশালায়, তবে পুথিগুলি থেকে পাটাগুলি আলাদা কবে সংরক্ষণেব ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাদের স্থানকাল সম্পর্কে সঠিক ধাবণা কবা দুরূহ হয়ে পড়েছে। প্রয়োজনে রচনাশৈলীব তুলনামূলক বিচারের সাহায্যেই যতদূর সম্ভব এখন এই পাটাগুলির কালক্রম নির্ধারণ কবতে হবে। কেবল বিষ্ণুপুরের নয়, রাঢ়-বাংলার অপর কয়েকটি জেলাব চিত্রিত পাটাও আশুতোষ সংগ্রহশালায সংগৃহীত আছে। এই সব পাটাগুলি পবীক্ষা করলে সহজেই বোঝা যায যে বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়াশৈলীই নিকটবর্তী জেলাগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র রাঢ়-বাংলার চিত্রশৈলীতে পরিণত হয়েছিল। তবে সেইসঙ্গে এও দেখা যায যে পাটাগুলির বিষয প্রধানত বৈষ্ণবধর্মাশ্রয়ী হলেও অন্য ধর্মসম্প্রদায়েব রূপভাবনাও তাতে প্রতিফলিত হয়েছে।

বিষ্ণুপুবে অঙ্কিত পাটাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম যেটি তার তারিখ ১৪২১ শকাব্দ বা ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দ। এই পাটাটি একটি 'বিষ্ণুপুবাণ' পাণ্ডুলিপির। এব ভিতরেব দিকে বামন থেকে কল্কি পর্যন্ত বিষ্ণুর ছয় অবতারকে চিত্রিত করা হয়েছে পরপর সারিবদ্ধভাবে। দ্বিমাত্রিক রীতিতে তির্যক বেখায আঁকা বামন ও তিন রামের ত্রিভঙ্গ রূপ, তাঁদের পোশাক, রেখার কৌণিকতা ও চিবুকের জোড় থেকে দেবপ্রসাদ ঘোষ স্পষ্টতই 'মধ্যযুগীয়' চিত্ররীতির চরিত্রলক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন[৩০]। তিনি এই চিত্রেব সঙ্গে বিহারের আবায় লিখিত ১৪৪৬ খ্রিস্টাব্দের 'কালচক্রতন্ত্র' এবং ১৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে লিখিত 'কারণ্ডব্যূহ' নামক পুথিদুটির ছবির সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন। সর্বদিক থেকে না হোক, বেখা ও বর্ণেব মণ্ডনগুণহীনতাব বিচারে পঞ্চদশ শতকের পুথিচিত্রের এই তিনটি স্বতন্ত্র উদাহরণ অবশ্যই পালযুগের চিত্রকলার অবক্ষযিত রূপের বিক্ষিপ্ত পবিচয় বহন করে।

বিষ্ণুপুরের রাজপরিবার নব বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেওযার পরই তার চিত্রকলার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। এই সময়ের চিত্রিত পাটাগুলি মূলত দু-রকমের। এক ধরনের পাটা সরলরেখা ও নকশার পাড়ের ভিতর নানান অলংকরণে চিত্রিত। এগুলিতে মানুষ বা পশুপাখির অবয়ব নেই। দ্বিতীয় ধবনের পাটাগুলিতে অঙ্কিত হয়েছে বৈষ্ণবধর্মাশ্রিত নানান বিষয়—জয়দেব বর্ণিত বিষ্ণুর দশাবতার, কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যজীবন। বিষয়ের গুরুত্বে আর বর্ণনার মাহাত্ম্যে দ্বিতীয় ভাগের ছবিগুলিই বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। গুণগত বিচারে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় আশুতোষ সংগ্রহশালায রক্ষিত ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে আঁকা 'শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রা'র দৃশ্যটি। বৃন্দাবন ছেড়ে কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা রোধে গোপিনীদের রথের সামনে শুয়ে পড়ে বাধাদানের প্রয়াসে, কৃষ্ণের বড়াইবুড়িকে প্রবোধদানের চেষ্টায় আর আকস্মিক অবরোধের দরুন রথের সারথি ও



১১ শিব-পার্বতী, পাটাচিত্র, মেদিনীপুর, অষ্টাদশ শতক

অশ্বের উল্লম্ফনে এমন এক নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছে যার তুলনা ক্ষুদ্রায়তনের পাণ্ডুলিপি-চিত্রে দুর্লভ। ভাবক্রিয়ার রূপায়ণে শিল্পী যে কেবল চরিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন তা নয়, সেই সঙ্গে চিত্রপটের রূপবিন্যাসকেও করেছেন সুসংহত। দ্বিমাত্রিক ছবি হয়েও রূপসংস্থাপন ও বর্ণপ্রয়োগের গুণে ত্রিমাত্রিকতার উপলব্ধি ঘটায় এই পাটাচিত্রটি। গাঢ় লালরঙেব পটভূমিতে ভিন্ন ভিন্ন রঙের মনুষ্যরূপে এবং একই সবুজের নানা বর্ণক্রমে চিত্রপটে দেখা দিয়েছে বিস্তৃতি ও গভীবতা। ছবিটিতে একদিকে যেমন রয়েছে ভিত্তিচিত্রের উপযোগী ভাবগত প্রসার, অন্যদিকে তেমনই অণুচিত্রের সূক্ষ্মকর্ম। গোপিনীদেব পরিধেয়ের বিচিত্র নকশা, রথের কারুকার্য আর নানা বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন পত্ররূপে এই সূক্ষ্মকর্মের পরিচয় মেলে। আশুতোষ সংগ্রহশালারই অপব একটি চিত্র—'শ্রীকৃষ্ণের মথুরা অবস্থান'-এও বিষয় উপস্থাপনে একই নাটকীয়তা এবং রূপসজ্জায় একই অনুপুঙ্খের প্রতি মনোনিবেশ লক্ষ করা যায়। বর্ণবিন্যাস ও মনুষ্যবৃক্ষাদি রূপায়ণের সাদৃশ্যে মনে হয় দুটি চিত্রই একই শিল্পীর রচনা।

বিষ্ণুপুবেব পাটাচিত্রের শৈলীব প্রসার দেখা যায় বীরভূমে সপ্তদশ শতকে অঙ্কিত একটি পাটায়। এই ছবিটিতে চৈতন্যসকাশে ওড়িশ্যার রাজা রুদ্রপ্রতাপেব প্রথম অভ্যাগমের ঘটনাটি ৩
বর্ণিত হয়েছে। আনুভূমিক রূপবিন্যাসের সারল্যে, ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের বিশিষ্ট রূপদানে এবং রেখা ও অলংকরণের সূক্ষ্ম সমাহারে এই ফলকটি নিঃসন্দেহেই পূর্বভারতীয় পুথিচিত্র পরম্পরার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। রুদ্রপ্রতাপকে আসতে দেখে চৈতন্যের মূর্ছিত হয়ে পড়ার অভিনয় এবং রুদ্রপ্রতাপ কর্তৃক তাঁর পদসেবার নাটকীয় মুহূর্তটিকে শিল্পী রূপ দিয়েছেন ধ্রুপদী সংযমে। দৃশ্যে উপস্থিত প্রতিটি চরিত্র আপন আপন রূপে ও সজ্জায় প্রামাণিক হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে গাছের পাতা আর নানা ধরনের অঙ্গবস্ত্রের নকশায় রয়েছে অণুচিত্রের অভিনিবেশ। একই প্রামাণিকতায় চিত্রিত হয়েছে বিষ্ণুপুরে অষ্টাদশ শতকে আঁকা অপর একটি পাটা—বিষয় হল মল্লরাজ বীর হাম্বীর সমীপে শ্রীনিবাস আচার্য। ঝাঁকড়া চুল রোষদীপ্ত চক্ষু উপবিষ্ট হাম্বীর, সামনে জোড়হস্ত বিনম্র শ্রীনিবাস আর তাঁর পিছনে প্রধানমহিষী ও অন্যান্য রানী—সকলেই যেন নিজ নিজ চরিত্রে ভাস্বর। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে বলিষ্ঠরেখার ছন্দোবদ্ধ প্রয়োগে ও নানাবর্ণের বিচক্ষণ বিন্যাসে।

আশুতোষ সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত অষ্টাদশ শতকের রাসলীলা চিত্রে অন্যরসের অবতারণা ঘটেছে। গোপিনীদের সঙ্গে নানা-কৃষ্ণের নৃত্য ছন্দোময় হয়ে উঠেছে রূপ ও বর্ণের ভারসাম্যে, রেখা ও বর্ণের দোলায়িত মূর্ছনায়। চৈতন্যদেবের নৃত্যরত যে চিত্রটি এই সংগ্রহশালায় রয়েছে সেটিও একই দ্যোতনায় প্রাণবন্ত। তবে রেখাকর্মের সূক্ষ্ম অথচ সাবলীল প্রয়োগ আর রূপনির্মিতির অপরূপ সারল্যে শ্রেষ্ঠতর মনে হয় আনুমানিক ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে আঁকা ব্রিটিশ ৯
মিউজিয়মে রক্ষিত চৈতন্যদেব ও তাঁর পারিষদদের নৃত্যগীতের দৃশ্যটি। বৈষ্ণবধর্মান্দোলনের অনুপ্রেরণায় পদাবলী কীর্তনে যে রসমাধুর্য সৃষ্টি হয়ে শ্রবণ-ইন্দ্রিয়কে মোহিত করে, এই ছবিটিতে সেই রসমাধুর্যই নয়ন-ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্তি দেয়।

আশুতোষ সংগ্রহশালার অন্য দুটি পাটা তাদের বিষয় ও রচনার বৈশিষ্ট্যের দরুন বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুটির একটিতে চিত্রিত হয়েছেন বহুভুজা, নানা অস্ত্রধারিণী, রক্তচক্ষু, লোলজিহ্বা, ভীষণদর্শনা কালী—তিনি এক প্রোজ্জ্বলন্ত প্রান্তরে শায়িত শিবের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে। তাঁকে অনুসরণ করছে প্রেতিনীর দল, তাঁর চলার পথ আকীর্ণ করে আছে শব আর শব। দেবীর এই করাল রূপ অবশ্যই শাক্ত তান্ত্রিকের ধ্যানসৃষ্ট এবং এক ভিন্ন রসের পরিচায়ক। পাটাটির কাল আনুমানিক ষোড়শ-সপ্তদশ শতক ; রচনাস্থান মুর্শিদাবাদ। অন্যদিকে মেদিনীপুর জেলার অষ্টাদশ শতকের একটি পাটায় দেখা যায় ডমরু বাজাতে বাজাতে, শিঙা ফুঁকতে ফুঁকতে শিব তাঁর বাহন

নন্দীর পিঠে চড়ে ঘরে ফিরছেন। সঙ্গে ত্রিশূলধারী চেলা ভৃঙ্গি চলেছেন হেঁটে—আর চিত্রপটের ১১
অপর প্রান্তে দেখা যাচ্ছে অনাড়ম্বর এক মণ্ডপে তাঁর পথ-চেয়ে শিশু গণেশকে কোলে নিয়ে বসে রয়েছেন পার্বতী। বর্ণনার সারল্যে আর কাহিনীর সর্বজনীনতায় এই পাটাচিত্রটি স্পষ্টতই বাংলার লৌকিক মানসিকতার পরিচয় বহন করছে। চিত্র-রচনার শৈলীতেও চোখে পড়ে পটচিত্রের আদল।

আশুতোষ সংগ্রহশালা ছাড়াও বেশ কয়েকটি সংগ্রহে ছড়িয়ে আছে আরও অনেক পাটাচিত্র। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল বিষ্ণুপুরের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবন, ঢাকা মিউজিয়ম ও বিশ্বভারতীর কলাভবন। এ ছাড়া দু-একটি চিত্রিত পাটা আছে গুরুসদয় সংগ্রহশালায়। ঢাকা মিউজিয়মের সংগ্রহে যে পাটাগুলি আছে সেগুলিকে চিত্রের বিষয় অনুযায়ী চারভাগে ভাগ করা যায়. মহাভারত, রামায়ণ, কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলা। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে পাটাচিত্রে মহাভারত-চিত্রণ অন্য কোথাও বিশেষ চোখে পড়ে না। বিষ্ণুপুরের যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবনের তেত্রিশটি পাটার অধিকাংশই কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলা বিষয়ক এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসে বিষ্ণুপুরের ভূমিকা বিচার করলে তা সংগত বলেই বিবেচিত হবে। অন্য দু-একটিতে রয়েছে রামরাজা ও দশাবতারের চিত্র। কলাভবনের তুলনামূলকভাবে স্বল্প সংখ্যক পাটাগুলির মধ্যে বিশিষ্ট হল দু-পাশে দুই চামর ব্যজনরতা নারীর মাঝখানে সজীব ও স্বচ্ছন্দ রেখাবন্ধনে আঁকা উপবিষ্ট গণেশের চিত্রটি। ভারতের বাইরেও, বিশেষ করে ইংল্যান্ডের কয়েকটি সংগ্রহশালায় বাংলার পাটাচিত্রের কিছু নিদর্শন রয়েছে। এই সব ছড়ানো পাটাগুলিকে তুলনামূলকভাবে বিচার করলে পাটাচিত্রের শৈলীগত বিবর্তন চিহ্নিত করা সম্ভবপর হবে। এখন প্রাথমিক পরীক্ষায় এটুকু বলা অসংগত হবে না যে বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া তথা রাঢ়-বাংলার পাটাচিত্রের উৎকর্ষ ঘটেছিল সপ্তদশ শতকে এবং পরবর্তী শতকেই লক্ষণীয়ভাবে তা হীনমান হয়ে পড়ে। দুর্বলতা দেখা দিল দুই দিক থেকে। একদিকে প্রথাসিদ্ধভাবে অঙ্কিত হতে থাকে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও চৈতন্যজীবনের আলেখ্য, অন্যদিকে শৈলীর লঘুতার ফলে কোনো কোনো চিত্রে প্রকট হয়ে ওঠে পটচিত্ররীতির সরল মোটাদাগের কাজ। তবু চৈতন্য ও তাঁর পারিষদদের সমবেত নৃত্যগীত ও শ্রীকৃষ্ণের রাস ও অন্যান্য লীলার দৃশ্যে এক ছন্দোময় রূপবন্ধের পরিচয় পাওয়া যায় শেষপর্যন্ত।

পাটাচিত্রের ধারা পুথির প্রচলন লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিকভাবে রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তারপরও বিষ্ণুপুরের শিল্পীরা তাঁদের চিত্রকর্মকে বহুলাংশে রক্ষা করে যেতে সক্ষম হয়েছেন 'দশাবতার তাস' এঁকে। বৃত্তাকার দশাবতার তাসের খেলা বহুকাল থেকে ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে চলে আসছিল। কয়েক দশক আগেও এই খেলা বাংলার বিষ্ণুপুর, ওড়িশ্যার পুরী, শোনপুর ও গঞ্জাম এবং অন্ধ্রের কয়েকটি স্থানে চালু ছিল। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' থেকে জানা যায় আকবর এই খেলার প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

চিত্রকর্ম হিসাবে বিষ্ণুপুরের তাস দুটি বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত। এক হল তার বর্ণাঢ্যতা, অন্যটি তার রেখাকর্মের দ্রুত সঞ্চালনজাত বলিষ্ঠ প্রবহমানতা। তাসগুলির একদিকে আঁকা হত বিষ্ণু কিংবা তাঁর কোনো অবতার বা অবতারের বাহনের ছবি, অন্য পিঠটি রঞ্জিত হত হিঙ্গুলের রক্তবর্ণে। এই তাসের জমি তৈরি করা হত নিমবিচির আঠা দিয়ে তিনফেত্তা কাপড় জুড়ে শুকিয়ে, সেগুলি গোলগোল করে কেটে নিয়ে। তার ওপর খড়িমাটির আস্তর দিয়ে তৈরি হত ছবি আঁকার ভূমি। গঁদের আঠা মিশিয়ে তৈরি হত খড়িমাটির সাদা, কজ্জলের কালো, হরিতালের হলুদ, নীলের নীল আর হিঙ্গুলের লাল—এই পাঁচটি বর্ণ। প্রাথমিক রেখাঙ্কনের পর এই সব রঙে প্রয়োজনমতো জমি ভরাট করে শেষে সূক্ষ্ম রেখায় ছবির কাজ শেষ হত। তারপর তাসের



১২ বীর হাম্বির সমীপে শ্রীনিবাস আচার্য ও রানী সুদক্ষিণা, বাঁকুড়া, অষ্টাদশ শতক

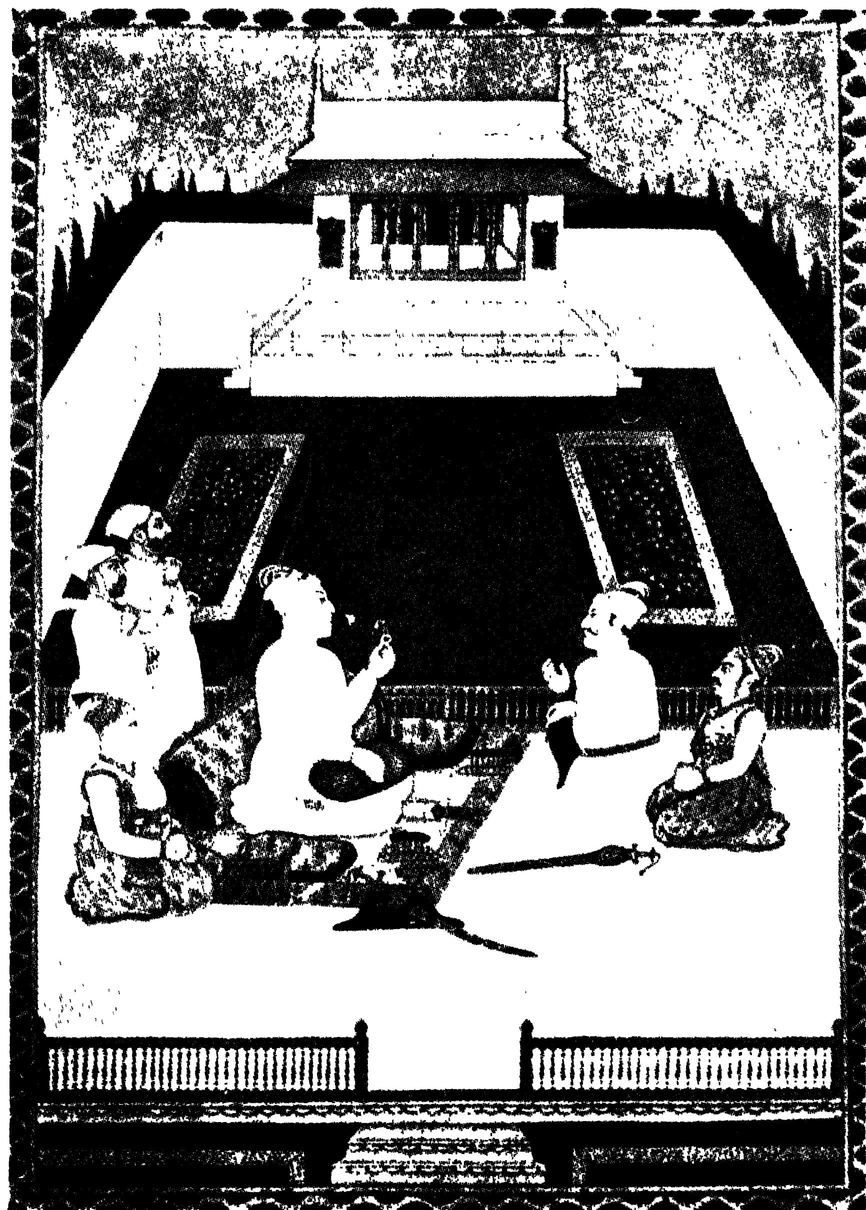
দু-পিঠেই গালার বার্নিশ লাগিয়ে ছবিগুলিকে স্থায়িত্ব দেওয়া হত। বিষ্ণুপুরে এই দশাবতার তাস আঁকা এখনও ক্ষীণ ধারায় বহমান রয়েছে। কিন্তু পাটাচিত্রের উন্নতমানের ছবি আঁকার শিল্পী সেখানে আজ আর নেই।

বিষ্ণুপুর তথা রাঢ়-বাংলার পাটাশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি বাংলার চিত্রকলার নিজস্ব অবদান। কী রূপভাবনায়, কী বিষয় নির্বাচনে, কী রসসৃষ্টিতে বাঙালির মানসিকতা এই ছবিগুলিতে সুস্পষ্ট—যেমন সুস্পষ্ট বৈষ্ণব পদাবলী ও কীর্তনগানে। তবু স্বাভাবিক নিয়মেই কোনো কোনো শিল্প-ঐতিহাসিক এই পাটাচিত্রে নিকটবর্তী ওড়িশ্যার, বিশেষ করে জগন্নাথধাম পুরীর চিত্রশৈলীর সম্ভাব্য প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিকভাবেও সেই সুলতানি আমলে দক্ষিণী-রাঢ় বা দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল নানা সময়েই ছিল ওড়িশ্যারাজের অধীনে। তা ছাড়া উত্তরভারতের জগন্নাথধাম দর্শনেচ্ছু তীর্থযাত্রীরা যাত্রাপথে বিষ্ণুপুরে বিশ্রাম নিয়ে যেতেন। এঁদের যাতায়াতের কারণেও পুরীর সঙ্গে বিষ্ণুপুরের সাংস্কৃতিক যোগ ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু যদি পুরীর পাটার সঙ্গে বিষ্ণুপুরের সপ্তদশ শতকের সূক্ষ্ম কারুকার্যময় পাটাগুলি তুলনা করা যায় তা হলে দুই শৈলীর ভিন্নতা সহজেই চোখে পডবে। পুরীর চিত্রে লোকায়ত চিত্ররীতির চরিত্রলক্ষণ প্রায় সর্বত্রই সুস্পষ্ট। কিন্তু বিষ্ণুপুরের প্রাচীনতর ছবিগুলি সে তুলনায় অনেক বেশি পরিশীলিত ও নাটকীয় ভাবক্রিয়া সমৃদ্ধ। অলংকরণের যে সূক্ষ্মকর্ম এই পাটাগুলিতে চোখে পড়ে তা বরং রাজস্থানি চিত্রের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই পর্যায়ে, বাংলায় মুঘল শাসনের প্রবর্তনের ফলে, মুঘল ও রাজপুত রাজপুরুষ, বণিক ও কর্মচারীর সংখ্যা এ অঞ্চলে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমন-কি রাজপুত রাজমিস্ত্রিদেব গৃহনির্মাণের কাজে ব্যবহারের প্রচলনও তখন থেকেই বলে মনে করার সংগত কারণ আছে। অধুনা আশুতোষ সংগ্রহশালারই একটি চিত্রে চিত্রকর তাঁর পরিচয় দিয়েছেন যে তাঁর "সাং—জয়পুরে, আর হাল সাং—বালুচর, জেলা মুর্শিদাবাদ"। এ থেকেও বাংলায় রাজস্থানি চিত্রকরের অবস্থিতি প্রমাণিত হয়। ফলে অন্তত পোশাক-আসাকের সজ্জায় রাজপুত প্রভাব বিষ্ণুপুরের পাটাচিত্রে পড়ার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। অন্যদিকে, অষ্টাদশ শতকের রাঢ়-বাংলার পাটাচিত্রে কেবল ওড়িশ্যা নয়, উত্তরভারতের সমকালীন লৌকিক চিত্রধারার প্রভাবও বেশ স্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে। তবে সকল ক্ষেত্রেই বাঙালি শিল্পী তাঁর নিজস্ব মাত্রাজ্ঞান রক্ষা করে ছবি এঁকে যেতে সক্ষম হয়েছেন—এমন প্রমাণই অষ্টাদশ শতকের পাটাচিত্রগুলি থেকে পাওয়া যায়।

১২ মুর্শিদাবাদ শৈলী

ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসের অনেকখানি জুড়ে আছে মুঘলচিত্রকলা। আকবরের প্রযত্নে যার বিকাশ, জাহাঙ্গীরের প্রশ্রয়ে যাব চরম উন্নতি. শাহ্‌জাহানেব অন্যমনস্কতায় যার অবনতি আর ঔরঙ্গজেবের বীতস্পৃহায় যার বিপর্যয়, সেই মুঘলচিত্রকলা পৃথিবীর মিনিয়েচার চিত্রের এক পরম সম্পদ। বাদশাহি বদান্যতা আর হিন্দু-পারসিক শিল্পীদের মিলিত উদ্যমে এই চিত্রকলা তার ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ে, বাস্তবানুগ জীবনচিত্রণে আর বর্ণাঢ্য অলংকবণে এমন এক উন্নতমানের রুচিশীল রূপজগৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল, যাব তুলনা সত্যিই বিরল। শতাধিক বছর ধবে মুঘল দরবারের আনুকূল্য লাভের পর ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে, তাঁর রক্ষণশীল মনোভাব আর মিতব্যয়িতার কাবণে, মুঘল শিল্পীদেব কারখানার ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়। তার ফলে, এতদিনের সুনিশ্চিত পৃষ্ঠপোষকতা হাবিয়ে, অসহায় মুঘল চিত্রকবেবা নতুন প্রতিপালকের আশায় ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। তাঁদেব কেউ গেলেন উত্তরে পাহাড়ি রাজ্যগুলির দিকে, কেউ মুঘল সংস্কৃতিব ধারক অযোধ্যার নবাবশাহির রাজধানী লখনউতে, কেউ বাংলার নবাবশাহির বাজধানী মুর্শিদাবাদে। আর যাঁবা দিল্লিতে থেকে গেলেন তাঁবা সস্তা দবে নিম্নমানের ছবি বেচে হয়ে পড়লেন বাজারশিল্পী।

বাংলার নবাব তখন মুর্শিদকুলী খান (১৭০০-১৭২৭ খ্রি)। তিনিও ছিলেন ঔবঙ্গজেবেব মতোই অনাড়ম্বর জীবনচর্যায় অভ্যস্ত গোঁড়া সুন্নি মুসলমান। তাঁর কাছে শিল্পীর বিশেষ কদর ছিল না। তবু তাঁব আমলেই ধর্মীয় কাবণে কিছু দাক্ষিণ্যলাভ করলেন দিল্লি থেকে সমাগত শিল্পীরা। অন্য সময় মিতব্যয়ী হলেও মুহরম আব খাজা খিজির উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবে বহু অর্থ ব্যয় করতেন মুর্শিদকুলী। সে সময় তিনি ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই আপ্যায়িত করতেন ভোজে—সারা মুর্শিদাবাদ শহর এমন-কি ভাগীবথীব পশ্চিম পাব পর্যন্ত সেই উৎসবেব দিনগুলিতে ঝলমল করত আলোকসজ্জায়। আর এই আলোকসজ্জার প্রয়োজনেই, অভ্রফলকের লণ্ঠন চিত্রণের কাজে, নিযুক্ত হলেন দিল্লির শিল্পীরা। এইসব লণ্ঠন চিত্রিত হত কোরানের উদ্ধৃতি, মসজিদ, লতাবৃক্ষ ও অন্যান্য নকশার অলংকবণ দিয়ে। আযোজন এত বিপুল ছিল যে নগরসজ্জা ইত্যাদি কাজে প্রায় এক লক্ষ মানুষকে লাগানো হত। মুঘলশৈলীর মুর্শিদাবাদে আঁকা একটি ছবিতে এই উৎসবের দৃশ্যটি ধরে বাখা আছে। মুর্শিদকুলী বসে আছেন মুর্শিদাবাদে তাঁর দরবাবে আর তাঁর পশ্চাদপটে বহমান ভাগীবথীতে নৌকোর সার ঝলমল করছে আলোকসজ্জায়। নদীর ওপারে, মহীনগর থেকে লালবাগের দীর্ঘ তিন মাইল পথও অভ্রের লণ্ঠনে সাজানো হত এই সময়। তাও তাই অঙ্কিত হয়েছে এই ছবিটিতে। এই ছবিটির কাল ১৭২০ খ্রিস্টাব্দ বলে অনুমান করেছেন রবার্ট স্কেলটন[১১]। তা যদি হয় তবে এটি অবশ্যই মুঘলশৈলীর পরম্পরায় উদ্ভূত মুর্শিদাবাদ কলমের এক আদি নিদর্শন। কেননা প্রকৃত অর্থে মুর্শিদাবাদ কলমের বিকাশ ঘটে মুর্শিদকুলী খাঁর শাসনকালের পব। সম্ভবত বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত তাঁর পুত্র সুজা-উদ্দিন শিল্পীদের কিছু পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকবেন। কিন্তু সুজা-উদ্দিন বা তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁব আমলের কোনো মুর্শিদাবাদ শৈলীর ছবি আজও পাওয়া যায়নি। আলিবর্দি খাঁ ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে মসনদে আসীন হওযাব পরই মুর্শিদাবাদ কলমের প্রকৃত বিকাশ ঘটেছিল।



১৩ সপার্ষদ নবাব আলীবর্দি খাঁ, মুর্শিদাবাদ আঃ ১৭৫০-৫৫ খ্রি

আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে তাঁর শাসনকালের শেষ সাত বছর—১৭৫০ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ হল এই কলমের শ্রেষ্ঠ সময়। কেননা মসনদে বসার পর থেকে দশ বছর আলিবর্দিকে যুঝতে হয়েছিল মারাঠা বর্গিদের সঙ্গে, অহরহ যুদ্ধ করে নিজের ক্ষমতা সুসংহত করতে হয়েছিল বাংলা, বিহার ও ওড়িশ্যায়।

পরিণত বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করে যোদ্ধা, সুশাসক ও চরিত্রবান মানুষ হিসাবে এক অবক্ষয়ের যুগে তিনি বাংলার ইতিহাসে গভীর ছাপ রেখে গেছেন। নাচ-গানে তাঁর আগ্রহ ছিল না, কোনো হারেমও পোষণ করতেন না তিনি। তাঁর প্রিয় ছিল বিদূষকের হাস্যপরিহাস। কিন্তু মনে হয় চিত্রকলার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। কেননা শিল্পীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার সাক্ষ্য রয়েছে তাঁর আমলে আঁকা ছবিগুলিতে। এই ছবিগুলিতে আলিবর্দির চরিত্র যে কতখানি বিশ্বাসযোগ্যভাবে চিত্রিত হয়েছে তা বোঝা যায় তাঁর সম্পর্কে সমসাময়িক ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের উক্তি স্মরণ করলে। আলিবর্দির ব্যক্তিত্ব ও শৌর্যের পরিচয় বহনকারী মুর্শিদাবাদ কলমের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে এদের মধ্য থেকে দুটি ছবি বিশেষভাবে আলোচিত হতে পারে।

আনুমানিক ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আঁকা একটি ছবিতে আলিবর্দিকে দেখানো হয়েছে ঘোড়ায় চড়ে নদীর খাড়িতে প্রাণভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া একটা কৃষ্ণসার হরিণ শিকারে তৎপর অবস্থায়। ৪
উত্তুঙ্গ বালিয়াড়ি আর প্রশস্ত নদী দেখে স্থানটিকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। বিশেষত গোলাম হোসেন যখন স্পষ্টতই লিখেছেন যে নবাবের অভ্যাস ছিল প্রতি বছর শীতকালে রাজমহল পাহাড়ে শিকার করার। সপ্তিপর নবাবের বলিষ্ঠ দেহ, রুচিসম্মত পোশাক, তাঁর ঘোড়ার তেজোদৃপ্ত ভঙ্গি সব কিছুই যেন শৌর্য আর সামর্থ্যের পরিচায়ক। নিসর্গে বিধৃত দবাস্ত বিস্তৃত নদী, ধূসর উত্তুঙ্গ বেলাভূমি আর বিশাল বৃক্ষের রূপায়ণেও একই গাম্ভীর্য সূচিত হয়েছে।

অপর ছবিটিতে আলিবর্দির সুনিয়ন্ত্রিত প্রাত্যহিক জীবনের অবসরকাল চিত্রিত হয়েছে এক ১১
রাজকীয় পরিবেশে। সূর্যোদয়ের দু ঘণ্টা আগে উঠে প্রাতঃকৃত্য ও প্রার্থনা সেরে কফি পান করে দরবারে বসতেন নবাব। এই দরবার চলত দু-ঘণ্টা, তারপর তিনি বিশ্রাম নিতেন। সে সময় তাঁকে সঙ্গ দিতেন তাঁর প্রিয় স্বজন ও বন্ধুদের কয়েকজন। গোলাম হোসেনের এই বিবরণই যেন রূপলাভ করেছে এই ছবিটিতে। খোলা প্রাচীরবেষ্টিত ছাদে নবাব বসে আছেন জাজিমের ওপর, পিছনে দুই পরিচারক চামর ব্যজন করছে। তাঁর পাশে বসে রয়েছেন ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজিস মুহম্মদ খান, ওরফে শাহমৎ জঙ্গ, আর সামনে মুখোমুখিভাবে অপর ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ আহমদ খান, ওরফে সৌলৎ জঙ্গ ও দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা। বর্তমানে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মে রক্ষিত এই ছবিটির পিছনে লিখিত লিপি থেকে এই সব পরিচয় পাওয়া গেছে। জ্যামিতিক শৃঙ্খলার ভিত্তিতে রচিত এই ছবিটি নবাবের জীবনধারা ও সমুন্নত রুচির পরিচয় দেয়। দূরের আকাশের গাঢ় নীল, ছাদের একাংশের গাঢ় খয়েরি ও অপরাংশের সাদা রঙের বিস্তৃতি, সামনের চত্বরের নিচু পাঁচিল ও দূরের চৌহদ্দির স্তম্ভ ও কার্নিসের গাঢ় লাল, আর রাজকীয় পোশাক-আসাক ও জাজিমের সুসংযত নকশা আলিবর্দির আমলের মুর্শিদাবাদ শৈলীর সুসংযত বলিষ্ঠ চরিত্রটিকে সবিশেষ ফুটিয়ে তুলেছে।

আলিবর্দির আমলের এই চিত্রাদর্শই মুর্শিদাবাদ কলমের একমাত্র অভিব্যক্তি ছিল না। তাঁর জীবৎকালের শেষদিক থেকেই দৌহিত্র সিরাজ দরবারে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ছিলেন দাদুর প্রশ্রয়ে লালিত বিলাসী যুবক। তাঁর রুচিও ছিল তাঁর মেজাজ অনুযায়ী কমনীয় ও লাস্যপ্রিয়। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রভাবে শিল্পীরা দরবারি পরিবেশের বাইরে থেকেও ছবির বিষয় নির্বাচন করতে শুরু করলেন। আলিবর্দি নাচ-গান পছন্দ করতেন না, এক পত্নীক পুরুষ হিসাবে নারীর প্রতি তাঁর আচরণ ছিল সংযত। আর তাঁর যেন বিপরীত মেরুতেই বিচরণ



১৪ মধুমাধবী রাগিণী, মুর্শিদাবাদ, আঃ ১৭৬০

করতেন সিরাজ। এতে মুর্শিদাবাদের মসনদের ভাগ্যে যে বিপর্যয়ই শেষপর্যন্ত ঘটুক না কেন, তার শৈলীতে দেখা দিল বৈচিত্র্য ও সজীবতা। শিল্পীরা নতুন স্বাচ্ছন্দ্যে নব নব রূপবিন্যাসে আঁকলেন রাগমালা সিরিজের ছবি। এইসব ছবির কোনো কোনোটিতে নায়কের চরিত্রে অঙ্কিত হলেন স্বয়ং সিরাজ—যাঁর রূপের প্রশংসা তাঁর নিন্দুক ঐতিহাসিকরাও না করে পারেননি। রূপবিন্যাসে যেমন দেখা দিল নতুন উদ্ভাবনা, রূপনির্মিতিতেও ফুটে উঠল মুর্শিদাবাদ শৈলীর নিজস্বতা। জ্যামিতিক বিন্যাসকে নানাভাবে ভেঙেচুরে, এমন-কি বর্জন করেও, শিল্পীরা চিত্রপটে আনলেন স্বতঃস্ফূর্ততা। রাগমালা ছবির পশ্চাদপটের আকাশ রাগ ও রাগিণী অনুসারে কখনও ১৪ গুরুভার মেঘে ভরে উঠল, কখনও মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বিচ্ছুরিত হল সূর্যকিরণ, আবার কখনও সকাল ও সন্ধ্যার উষ্ণ-শীতল আলোয় হয়ে উঠল উদ্ভাসিত। হিন্দোল রাগে নায়ক-নায়িকাকে দোলনায় দোল দিচ্ছেন সহচরীরা। ককুভ রাগিণীতে নির্জন প্রান্তরে জ্যোৎস্নালোকিত রজনীতে একা দু-হাতে দুই মালা, দু-পাশে দুই ময়ূর-ময়ূরী নিয়ে, নায়কের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন নায়িকা। কেদারা রাগিণীতে এক নদীতীরের জলটুঙির খোলা ছাদে, তারকাখচিত আকাশের নিচে তানপুরা বাজিয়ে গান ধরেছেন নায়িকা—হাতে ফুল ধরে শুনছেন নায়ক। বিলাবল রাগিণীতে সামনে আরশি রেখে জেনানামহলের খোলা ছাদে পরিচারিকার দ্বারা প্রসাধিত হচ্ছেন নায়িকা। এ ধরনের ছবি কেবল সিরাজের প্রভাবেই নয়, তাঁর শাসনকাল ও জীবনাবসানের পরও আঁকা হয়েছে মুর্শিদাবাদে।

তবে আরও তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় সেই সব ছবি যাতে গ্রামবাংলার জীবনধারা চিত্রিত হয়েছে। এমন একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে উষাকালে এক গ্রাম-বালিকা একাকী গাছতলার এক শিবলিঙ্গে পূজা দিতে এসেছে। ছবিটিতে ঘনপাতায় আবৃত বৃত্তাকার গাছ আর দিগন্তের অর্ধবৃত্তাকার তরুশ্রেণী মুর্শিদাবাদ শৈলীর বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছে। কিন্তু বালিকার সুপুষ্ট মুখমণ্ডল, বিশেষ করে তার নিটোল চোখ, আর সেই সঙ্গে পরিধেয় বস্ত্র ও ওড়না, স্পষ্টতই রাজস্থান চিত্রকলার জয়পুর শৈলীর কথা মনে করিয়ে দেয়। মুঘল শাসনসূত্রে জয়পুরের সঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক সংযোগ তো একটা ইতিহাসস্বীকৃত ঘটনা। নবাব আমলে সে সংযোগ যে আরও বিস্তৃত হয়েছিল তা অনুমান করা যায় মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী নশীপুর থেকে পাওয়া কয়েকটি ছবির সাক্ষ্যে। এই ছবিগুলি স্পষ্টতই রাজস্থানের কিষেণগড় কলমের ছাপ বহন করছে। হাতির দাঁতের ক্ষুদ্র ফলকে আঁকা শ্রীরাধিকার ছবিটি তো কিষেণগড়ের বিখ্যাত শিল্পী নিহালচাঁদের আঁকা বহুপরিচিত ১১ রাধিকারই অনুকৃতিস্বরূপ।

সিরাজের পর মিরজাফর নবাব হলেও মুর্শিদাবাদ শৈলী অব্যাহত থাকে। কেবল নবাব বা তাঁর পরিবারের নয়, হিন্দু অমাত্য ও জমিদার, এমন-কি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের আনুকূল্যও লাভ করলেন শিল্পীরা। এ সময় আঁকা নবাব মিরজাফরের কয়েকটি ছবি পাওয়া গেছে। তার একটি রয়েছে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মে। এই ছবিটিতে নবাব এবং তাঁর পুত্র মিরনকে এক দিগন্ত-প্রসারিত অসম প্রান্তরে অশ্বারূঢ় হয়ে সৈন্যপরিদর্শনরত দেখানো হয়েছে। কিন্তু ছবিটির শিল্পী হিসাবে যাঁর সীলমোহর রয়েছে তিনি হলেন লখনউ-এর খ্যাতিমান শিল্পী পুরাননাথ, ওরফে হুনহার। ছবিটি রচিত হয়েছে ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে। এই সময় থেকে লখনউ কলমের কোনো কোনো শিল্পী যে বাংলায় এসে ছবি এঁকেছিলেন, তার সাক্ষ্য অন্যান্য কয়েকটি ছবিতেও পাওয়া যায়। অপর একটি চিত্রে ভাগীরথীর তীরে একাকী দাঁড়িয়ে রয়েছেন মিরজাফর তাঁর বলিষ্ঠ দেহ রাজকীয় পোশাকে আবৃত করে, কোষে নিয়ে তরবারি, সামনে ভূমি, মাঝে বহমান ভাগীরথী, পরপারে দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর ও প্রসারিত সুনীল আকাশ—সব মিলিয়ে এমন এক গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ যা সহজেই আলিবর্দির

সময় আঁকা ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। আনুমানিক ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে আঁকা, এখন ভিক্টোরিয় অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মে সংরক্ষিত, এই ছবিটির নিসর্গ রচনায় পরিপ্রেক্ষিতের জ্ঞান স্পষ্ট।

হিন্দু অমাত্য ও জমিদারদের জন্য মুর্শিদাবাদ শৈলীর শিল্পীরা বেশ কিছু ছবি করেছেন হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে। ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মের একটি ছবিতে কদমতলায় রাধিকার মাথা থেকে কলস নামিয়ে নিচ্ছেন কৃষ্ণ। এই ছবিটিতে অবশ্যই লোকশিল্পের ছাপ স্পষ্ট। অপর একটি ছবিতে শিব আর পার্বতীকে একটি মন্দিরের সামনে উপবিষ্ট দেখানো হয়েছে। সহজ ও সরল রূপসংস্থাপনে রচিত এই ছবিটিতে রাজস্থানি চিত্রকলার স্পর্শ পাওয়া যায়।

মিরকাসিম নবাব হলে তিনিও চিত্রকলার প্রতি দাক্ষিণ্য দেখাতে কার্পণ্য করেননি। ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মে বর্তমানে রক্ষিত উইলিয়াম ফুলহার্টনের সংগ্রহের ছবিগুলি থেকে মিরকাসিমের শাসনকালের (১৭৬০-৬৩ খ্রি) মুর্শিদাবাদ শৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। সংগ্রহের একটি ছবিতে গঙ্গাতীরে প্রাসাদচত্বরে চাঁদোয়ার নিচে এক হিন্দু অমাত্যের সঙ্গে বাক্যালাপরত মিরকাসিমকে দেখানো হয়েছে। তাঁর হাতে গড়গড়ার নল ধরা থাকলেও ছবিটি আলিবর্দির আমলের দরবারি গাম্ভীর্যেই রচিত। প্রায় একই রূপবিন্যাসে রচিত হয়েছে একজন অমাত্যের ছবিও—যাঁকে মিরকাসিমের সেনাপতি আর্মেনীয় গুরগন খাঁ বলে শনাক্ত করেছেন কেউ কেউ। ছবিটির শিল্পী হলেন দীপচাঁদ, যাঁর আরও কয়েকটি মিনিয়েচার পাওয়া গেছে ফুল-হার্টনের সংগ্রহে। ছবিটিতে নবাবি আদবে গুরগন একটি জাজিমের ওপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে গড়গড়ায় তামাক সেবন করছেন—আর তাঁর সামনে পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেবকরা। ফুলহার্টন এ দেশের জীবনধারা গ্রহণ করে এ দেশের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতেন বলে এটি তাঁরই ছবি বলেও আবার অনেকে মনে করেন।

মিরকাসিমের আমলে মুর্শিদাবাদ শৈলীর ক্ষেত্রে দুটি বড় ঘটনা ঘটে। প্রথমটি হল সেই সময় লখনউ শিল্পীরা মুর্শিদাবাদে এসে কাজ করার ফলে সাময়িকভাবে মুর্শিদাবাদ শৈলীর ওপর লখনউ শৈলীর প্রভাব পড়ে। ভাবাবেগের আতিশয্য আর সূর্যাস্তকালের আকাশের রক্তিম ছটা—লখনউ-এর নবাবি শাসনের প্রতীক হিসাবেই যেন সেই শৈলীতে প্রাধান্য পেয়েছে। আর এ সময় তারই ছাপ পড়েছে মুর্শিদাবাদ শৈলীতে। দ্বিতীয়ত, এই সময়েই মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা সূক্ষ্ম তুলির হাল্কা খয়েরি বা ছাই রঙের ফুটকি দিয়ে মুখের আদল নিটোল করে তুলতে শুরু করেন। অন্যথায় মুর্শিদাবাদ শৈলীর শিল্পীরা মুঘল পদ্ধতিতে ঘন জলরঙে (gouache) ছবি এঁকে গেছেন।

মিরকাসিম ইংরেজদের হাতে পরাজিত হলে ইংরেজরা তাদের ক্রীড়নক মিরজাফরকে আবার মুর্শিদাবাদের মসনদে বসাল। তখন থেকে নবাবি মসনদের প্রকৃত মর্যাদা কিছু আর রইল না। আর তখন থেকেই শুরু হল মুর্শিদাবাদ কলমের দ্রুত অবনতি। এই সময় সৃজনশীলতা হারিয়ে শিল্পীরা এঁকে চললেন নবাব-বাদশাহদের আলেখ্য চিত্র। কারণ, সাধারণের মধ্যে নবাব-বাদশাহদের এই সব আলেখ্যের একটা বাজার ছিল। এরপর এগারোশ ছিয়াত্তরের (১৭৬৯ খ্রি) মন্বন্তরের ধাক্কায় সেই অবক্ষয়িত ধারাটিও প্রায় লুপ্ত হয়ে গেল। দুর্ভিক্ষের প্রকোপে শিল্পীদের অনেকেই প্রাণ হারালেন অনাহারে, অনেকে হলেন দেশান্তরী। এঁদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত যাঁরা ইংরেজদের আশ্রয়ে জীবনরক্ষায় সক্ষম হলেন, তাঁদের হাতেই মূলত মুঘল ও পাশ্চাত্য চিত্ররীতির মিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছিল নতুন এক শৈলী—যার নাম দেওয়া হয়েছে 'কোম্পানি স্কুল'।



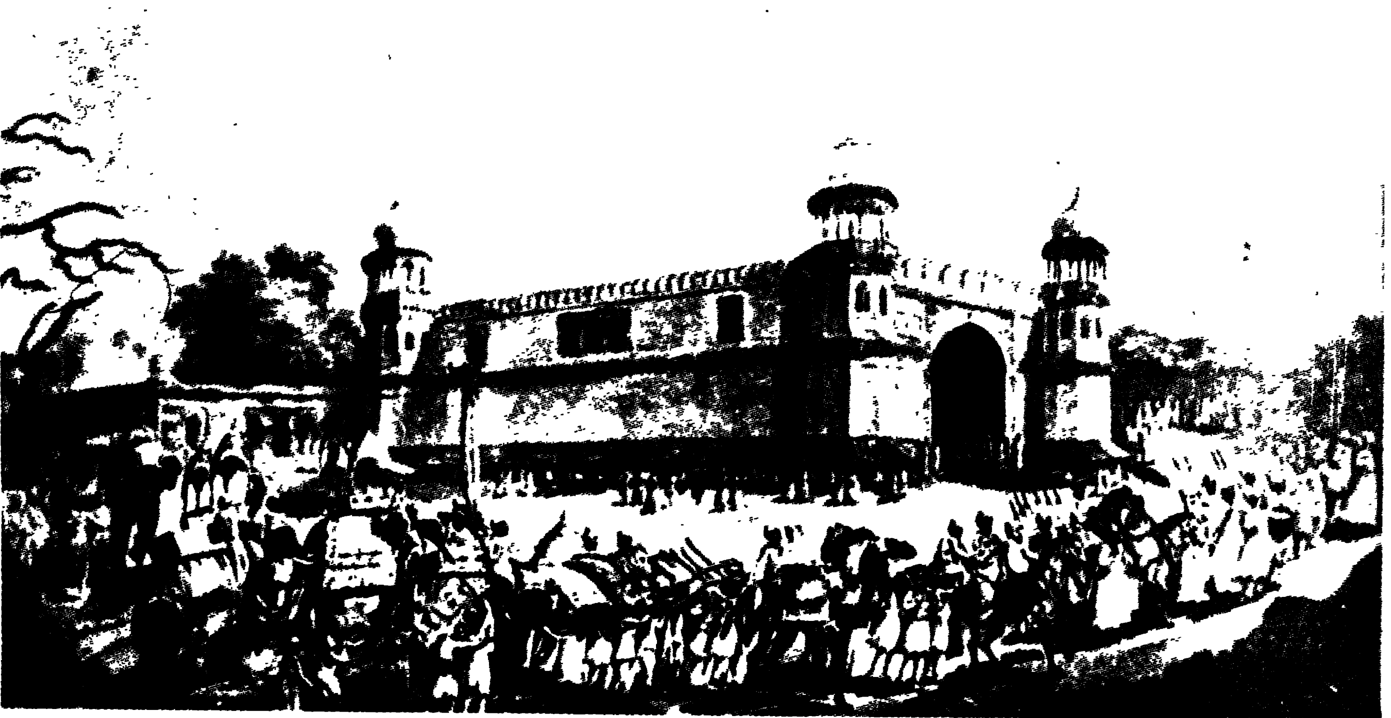
শিব পার্বতী, মুর্শিদাবাদ, আঃ ১৭৬৫ খ্রি

১৩ কোম্পানি শৈলী : মুর্শিদাবাদ পর্ব

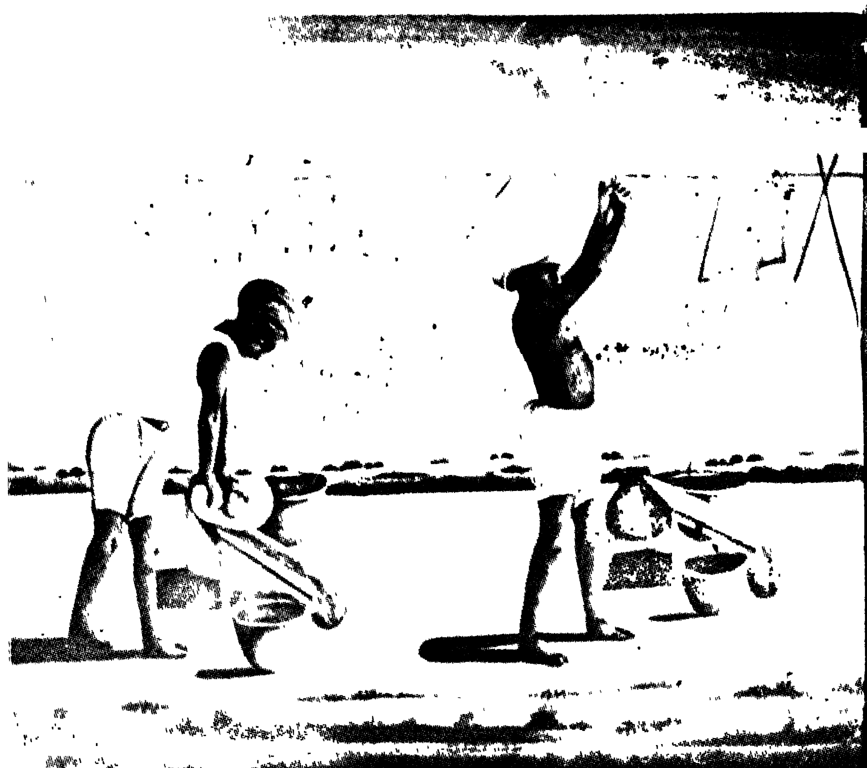
বাংলার জমিতে কোম্পানি শৈলীর ছবি প্রথম দেখা দিয়েছিল মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদ থেকে পাঁচ মাইল দূরে কাশিমবাজারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যকুঠি ছিল অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই। কিন্তু ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইংরেজরা কেবল বণিক রইল না, তারা নবাবের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে মুর্শিদাবাদে পুরোদস্তুর রাজনৈতিক অধিকার কায়েম করল—১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে রাজধানীর ছ-মাইল দক্ষিণে তৈরি হল ব্রিটিশ আর্মি ব্যারাক। ১৭৭৫ সালে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হলে মুর্শিদাবাদে বহু ইংরেজের সমাগম হল। নবাবের ক্ষমতা খর্ব হওয়ায় তাঁর সভাসদ ও অমাত্যদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থাও বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা নতুন পৃষ্ঠপোষকতার আশায় ইংরেজদের দ্বারস্থ হলেন। অনাস্বাদিত শক্তি ও সমৃদ্ধির গর্বে গর্বিত ইংরেজরা তাঁদের হতাশ না করে বরং ইচ্ছেমতো ছবি আঁকার কাজে নিযুক্ত করল।

ইংরেজদের জন্য প্রথম দিকে যে সব ছবি মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা এঁকেছিলেন সেগুলি আঁকা হয়েছিল তাঁদের নিজস্ব, অর্থাৎ মুঘল পরম্পরার শৈলীতেই। এই সব মিনিয়েচার ছবিতে বিষয় হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছে মুঘল বাদশা, বাংলা আর অযোধ্যার নবাব, আর অন্যান্য অভিজাত শাসকদের প্রতিকৃতি। এই সময়কার ছবির একটি সংগ্রহ ইংরেজ শল্যচিকিৎসক উইলিয়াম ফুলহার্টনের আদ্যাক্ষর (W.F.1764) চিহ্নিত হয়ে ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। ফুলহার্টন চিকিৎসক হিসাবে নবাব মিরকাসিম, ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন প্রমুখ বহু অভিজাত ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি এমন-কি সাধারণ দেশী মানুষের জীবনধারাতেও অভ্যস্ত হয়েছিলেন। তাঁর সংগ্রহের ছবিগুলি আনুমানিক ১৭৪৪ থেকে ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অঙ্কিত হয়েছিল এবং এগুলি ছিল মুর্শিদাবাদ শৈলীরই উদাহরণ। কিন্তু কোনো কোনো মুর্শিদাবাদের শিল্পী যে পাশ্চাত্য চিত্ররীতির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আঁকা একটি 'চন্দ্রালোকিত নিসর্গ' চিত্রে[২২]। এই ছবিটিতে পরিপ্রেক্ষিতের স্পষ্ট জ্ঞান এবং আলো-ছায়ার মাধ্যমে রূপনির্মিতির পূর্ণপরিচয় মেলে।

ইংরেজশাসিত ভারতীয় ভূখণ্ডগুলির মধ্যে কোম্পানি শৈলীর চিত্রকলা—অর্থাৎ দেশজ ও ইয়োরোপীয় শৈলীর মিশ্রণজাত চিত্রকলা—প্রথম অঙ্কিত হয়েছিল দক্ষিণের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে, আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে তানজোর-এ। কিছুকালের মধ্যে এই শ্রেণীর ছবি দেখা দিল পূর্বভারতে—অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মুর্শিদাবাদে। ক্রমে ক্রমে কলকাতায়, পাটনায়, এমন-কি কটক, ছাপড়া আর আরাতেও। তারপর বারাণসী ও লখনউতে, এবং উনিশ শতকের গোড়া থেকে দিল্লি ও আগ্রাতেও। কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও সর্বত্রই কোম্পানি স্কুলের শিল্পীরা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের জন্য এঁকেছেন এদেশের মানুষের পোশাক-আসাক, হাট-বাজার, বিভিন্ন কারুকর্মের নিদর্শন, নানান যানবাহন, বড় বড় উৎসব আর হিন্দুমন্দির ও দেবদেবীর ছবি। এসব ছবির গুরুত্ব অবশ্যই সমকালীন ভারতীয় জীবনধারার নির্ভরযোগ্য দলিল হিসাবে। নচেৎ শিল্পকর্ম হিসাবে এসব ছবিতে নান্দনিক গুণের পরিচয় নেই বললেই চলে। মুর্শিদাবাদের শিল্পীদের কাজেও একইভাবে দেখা যায় মিস্ত্রি, মুচি, রাঁধুনি,



১৬ শোভাযাত্রা,মুর্শিদাবাদ, আঃ ১৮০০ খ্রি।



ধোবী, মুর্শিদাবাদ, আঃ ১৭৮৫ ৯০ খ্রি।

হুঁকা-বরদার, নাপিত, দর্জি, ভিস্তি, লাক্ষা-কারিগর প্রমুখ সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের আলেখ্য—যে সব মানুষেব প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছিল মুর্শিদাবাদে বসবাসকারী ইংরেজ প্রশাসক ও বণিকদের।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা দেখা যায় ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্যরীতির দিকে ঝুঁকছেন—বিশেষ করে তাঁরা তাঁদেব পরম্পরাগত ঘন জলরঙের (gouache) বদলে স্বচ্ছ জলরঙের (watercolour) ব্রিটিশ রচনা পদ্ধতির দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন। চিত্রপট পাশ্চাত্য বর্ণবোধে সিপিয়ার নানা মাত্রার রঙে রঞ্জিত হল; মনুষ্যরূপ ও তার পোশাক-আসাকে দেখা দিল রেখাজনিত ছায়াপাত। সমস্ত ছবিটিতে দেওয়া হল কালো বর্ডাব। ছবির আকারও মুঘল মিনিয়েচারের চেয়ে বড় হল—বিশেষ কবে নিসর্গচিত্রে। এমনিভাবে, মুর্শিদাবাদেব শিল্পীদের কাজে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল ব্রিটিশ চিত্রকলার প্রভাব। কিন্তু তা সত্ত্বেও রূপসৃষ্টির আদর্শে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব পরম্পরাতেই মূলত নিবদ্ধ থাকলেন।

কাগজ ছাড়াও অভ্রের পাতের ওপর ছবি আঁকতে জানতেন মুর্শিদাবাদের চিত্রকরেরা। মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে অভ্রেব লণ্ঠন আঁকার কাজ নিয়েই তাঁরা শুরু করেছিলেন মুর্শিদাবাদে তাঁদের কর্মজীবন। এখন ইংরেজদের জন্য অভ্রের পাতের ওপর আঁকা হতে থাকল ছোট ছোট মিনিয়েচার—যার অধিকাংশই প্রতিকৃতিচিত্র। সেই সঙ্গে থাকল নানা যানবাহন, পোশাক-পরিচ্ছদ, শোভাযাত্রা ও উৎসবের ছবিও। এই মুর্শিদাবাদ থেকেই দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনাপল্লিতে অভ্রপাতের ওপর জলরঙে ছবি আঁকার করণকৌশল গিয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন মিলড্রেড আর্চার[২৩]।

মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব কিন্তু কমতে থাকল উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই। ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃহত্তর কেন্দ্র হয়ে উঠল কলকাতা—ইংরেজদের নিজস্ব শহর। তারপর রেলপথের প্রবর্তন হলে ভাগীরথীর প্রধান বাণিজ্যপথের ভূমিকাও আর থাকল না। ইতিপূর্বে কলকাতা থেকে উত্তরাপথে বাণিজ্য চলাচল করত এই ভাগীরথী-গঙ্গার পথ ধরেই। আর সেই পথে মুর্শিদাবাদ ছিল বণিকদের বিশ্রাম আর রসদ নেওয়ার স্থান। কিন্তু এখন সে ভূমিকা হারিয়ে মুর্শিদাবাদ আর্থিকভাবেও হয়ে পড়ল পঙ্গু। আর শাসনকেন্দ্র হিসাবে কলকাতার গুরুত্ব তো অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকেই সুনিশ্চিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতেই লেডি নুজেন্ট (Lady Nugent) তাঁর রোজনামচায় মুর্শিদাবাদ সম্পর্কে লিখছেন: "একদা সমৃদ্ধ বাংলার এই রাজধানী দ্রুত অবক্ষয়ের পথে নেমে যাচ্ছে। বিশেষ করে বাণিজ্যের দিক থেকে"[২৪]। তখন থেকে রাজধানীর নাগরিক-জন-কোলাহল হারিয়ে মুর্শিদাবাদ হয়ে পড়ল ঘুমন্ত এক জেলাশহর। মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব অধিকার করে নিল নতুন শহর কলকাতা।



১৮ ভাগীরথী থেকে পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম, টমাস ড্যানিয়েল, ১৭৮৭ খ্রি

১৪ কলকাতার সমৃদ্ধি ও ইয়োরোপীয় জীবনচর্যার আকর্ষণ

যে সব ইয়োরোপীয় বণিক ব্যবসা করে দ্রুত ধনী হওয়ার লোভে প্রথম প্রথম ভারতে এসেছিল, তারা ছিল দুর্দান্ত প্রকৃতির 'অভিযাত্রী'। স্বদেশে তাদের না ছিল বিত্ত, না ছিল মর্যাদা। ইংরেজ বণিকদের প্রথম দলও ছিল এই ধরনেরই। তাদের অনেকেই ব্যবসার সূত্রে ভারতীয়দের সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনধারাকে গ্রহণ করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। গ্রামে গঞ্জে মানুষের সঙ্গে মিশে তারা হুঁকো ধরেছে, বাইজির নাচ দেখেছে, এমন কি জীবনসঙ্গিনী হিসাবে এদেশীয় রমণীদের গ্রহণ করেছে। আসলে স্বদেশের সংস্কৃতির প্রতি তাদের বিশেষ কোনো মমত্ববোধ ছিল না।



১৯ কলকাতার ভাগীরথীতে ঝড়, অজ্ঞাতনামা শিল্পী আঃ ১৮০০ খ্রি

কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত রেগুলেটিং অ্যাক্টের ফলে কলকাতা যখন ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া'র রাজধানীর মর্যাদা লাভ করল, তখন থেকে সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত ইংরেজদের আগমন ঘটতে থাকল এই উদীয়মান শহরে। ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম ও একটি বাণিজ্য কুঠি থেকে সূত্রপাত হয়েছিল কলকাতার। তারপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা ও শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হল এই শহরের বিস্তার। আর যখন এই শহর পেল ভারতে প্রথম গভর্নর-জেনারেলের শাসনকেন্দ্রের মর্যাদা, স্বাভাবিকভাবেই তখন কয়েক দশকের মধ্যে তার এক অভাবনীয় রূপান্তর ঘটল। কলকাতার আকাশে মাথা তুলে দেখা দিল হর্ম্যশ্রেণী—কিছু কোম্পানির বাণিজ্য-অফিস, কিছু তার প্রশাসনিক আবাস। টমাস ও উইলিয়াম ড্যানিয়েল ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত তাঁদের সচিত্রিত 'ভারতভ্রমণ' গ্রন্থে লিখলেন . "হঠাৎ-ই সব বাঁশের ছাউনি অদৃশ্য হয়ে গেল ; ইটের দেওয়ালের জায়গা নিল মর্মরস্তম্ভ"[২৫]।

কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের মন নিয়ে স্বতন্ত্র একটা মহল্লা তৈরি করে নিল ইংরেজরা। সে মহল্লায় তারা স্বদেশের রুচি ও মেজাজে জীবনযাপনের সব ব্যবস্থাই করে নিল কয়েক বছরের মধ্যে। ইংল্যান্ডের তখনকার প্রচলিত 'নিও-ক্লাসিকাল' রীতিতে তৈরি হল সৌধ ও প্রাসাদ—যেমন বাণিজ্য ও প্রশাসনের প্রয়োজনে, তেমনি ক্ষমতাবান' ব্যক্তিদের বসবাসের জন্যেও। সে সময় কী প্রশাসনের কাজে, কী সদ্য প্রতিষ্ঠিত সুপ্রিম কোর্টের বিচার-পরিচালনার জন্যে ইংল্যান্ড থেকে এমন কিছু মানুষ এলেন যাঁরা ছিলেন সত্যিকারের শিক্ষিত ও উদারচেতা ব্যক্তি। তাঁদেরই কযেকজন উদ্যোগ নিয়েছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটি, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, হিন্দু কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কলকাতায় পাশ্চাত্যবিদ্যাচর্চার সূচনা করতে। তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই স্বদেশের সাংস্কৃতিক পরিবেশের ধারাটি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন তাঁদের নতুন বাসস্থান কলকাতায়। ধনী ও সম্ভ্রান্ত ইংরেজ পুরুষদের বাসভবনে যেমন দেখা দিল ড্রয়িংরুম, তার ফায়ার-প্লেস আর ম্যান্টল-পিস, তেমনই প্রয়োজন বোধ হল বারোক-রীতিতে সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো দেয়ালজোড়া অয়েল-পেইনটিং-এর।

ভারতে ইংরেজদের বৈভব আর তাদের বিলাসব্যসনের খবর ছড়িয়ে পড়েছিল ইংল্যান্ডে। তাই সেখানকার জীবনসংগ্রামে নাজেহাল শিল্পীদের কেউ কেউ অচিরেই এদেশের পথে পাড়ি দিলেন দ্রুত ভাগ্য-পরিবর্তনের আশায়। পেশাদার ব্রিটিশ শিল্পীদের মধ্যে প্রথম ভারতে এসেছিলেন টিলি কেটল—তিনি মাদ্রাজে পৌঁছন ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে আর কলকাতায় ১৭৭১-এ। তখন থেকে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ষাটজন ইংরেজশিল্পী কাজ করে গেছেন কলকাতায়। এঁরা যে সবাই উঁচুদরের শিল্পী ছিলেন তা নয় ; তবে কয়েকজন অবশ্যই ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করতে হয় টিলি কেটল-এর (১৭৭১-৭৬), যাঁর সাফল্যের খবর পেয়েই পরবর্তী শিল্পীরা এদেশে এসেছিলেন ; এবং জন জোফানি (১৭৮৩-৮৯) ও আর্থার ডেভিস-এর (১৭৮৫-৯৫), কেননা এঁরা প্রত্যেকেই স্বদেশেও ছিলেন খ্যাতিমান শিল্পী। এর সঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে জর্জ ফ্যারিংটন, টমাস হিকি, টমাস ও উইলিয়াম ড্যানিয়েল, ফ্রানচেস্কো রেনাল্ডি, জর্জ চিনেরি ও রবার্ট হোম-এর। এঁরা সকলেই ছবি এঁকেছেন তাঁদের স্বদেশের প্রচলিত রীতিতে—ক্যানভাসের ওপর তেলরঙে। আর সেগুলি এঁকেওছিলেন এদেশে বসবাসকারী ইংরেজদের জন্যেই। কলকাতায় আঁকা হলেও সাধারণভাবে তাই বাংলার চিত্রকলা প্রসঙ্গে এই ইংরেজ শিল্পীদের স্থান হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আধুনিককালের ভারতীয় চিত্রকলার বিকাশে তাঁদের এদেশে আসা ও ছবি এঁকে যাওয়ার ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে উনিশ শতকের বাঙালির জীবনে পাশ্চাত্যশিক্ষার সংস্পর্শে যে বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল—যা বাংলার রেনেসাঁস বলে পরিচিত—তার পরিপ্রেক্ষিতে এঁদের উপস্থিতি ও শিল্পকর্ম মনোযোগ দাবি করে। কেননা উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির শিল্পবোধ ও ভাবনার

অনেকটাই গড়ে উঠেছিল পাশ্চাত্য চিত্রকলার আদর্শে—যার চাক্ষুষ উদাহরণ ছিল এই ব্রিটিশ শিল্পীদের আঁকা কলকাতায় ছড়িয়ে-পড়া ছবিগুলি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে কলকাতার ইংরেজ ও বাঙালি শিল্পপ্রেমিকদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ব্রাশ ক্লাব (Brush Club)-এর ব্যবস্থাপনায় ১৮৩১ ও ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে টাউন হলে পরপর দুটি চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়[২৬]। এই প্রদর্শনী দুটির ছবি যাঁদের সংগ্রহ থেকে নেওয়া হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাংলার নবজাগরণের বেশ কয়েকজন নেতা—হেনরি ডিরোজিও, দ্বারকানাথ ঠাকুর, শ্রীনাথ মল্লিক, রঘুনাথ ঘোষাল প্রমুখ। প্রদর্শিত শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ইটালির ক্যারাভাজ্জো ও ক্যানালেত্তো, হল্যান্ডের রেমব্রান্ট, ইংল্যান্ডের রেনল্ডস, লরেন্স, টার্নার প্রমুখ। এ দেশে যে সব ইংরেজ শিল্পী কাজ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকেও ছিলেন টিলি কেটল, জোফানি, ড্যানিয়েল, ডয়েলি, বিচি ও হোম। এর থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে কলকাতার শিক্ষিত ও অভিজাত বাঙালিদের মধ্যে পাশ্চাত্য চিত্রকলার সমাদর উনিশ শতকেব শুরু থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল। এবং তাঁদের অনেকেই সে সময় ইংরেজ শিল্পীদের দিয়ে প্রতিকৃতি আঁকাতেও আরম্ভ করেন। তা ছাড়া হাত ঘুরে কলকাতার ইংরেজদের ঘরের ছবিও তাঁদের সংগ্রহে চলে আসত। কেননা তখন বিদেশ থেকে ইংল্যান্ডে ছবি নিয়ে যেতে হলে চড়া হারে শুল্ক দিতে হত; আর সেই জন্যে ইংরেজরা দেশে ফেরার আগে বড় বড় ছবিগুলিকে নিলামে বেচে দিয়ে যেত। উল্লিখিত ব্যক্তিরা ছাড়াও আর যাঁরা সারা উনিশ শতক জুড়ে পাশ্চাত্য চিত্রকলা সংগ্রহ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট হলেন পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুব, বর্ধমানের মহারাজা, পাইকপাড়ার মহারাজা প্রমুখ।

এখানে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠতে পারে,তা হল, ইংরেজ শিল্পীরা অষ্টাদশ শতকের শেষে কলকাতায় পাশ্চাত্য চিত্রকলার কোন্ আদর্শকে বয়ে এনেছিলেন? তাৎপর্যপূর্ণভাবেই উল্লেখ করা যায় যে টিলি কেটল ভারতে আসার ঠিক আগের বছরই (১৭৬৮ খ্রি) ইংল্যান্ডে রাজা তৃতীয় জর্জের পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েল অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি হন তখনকার ইংল্যান্ডের সবথেকে খ্যাতিমান ও প্রতিপত্তিশালী শিল্পী যোশুয়া রেনল্ডস্ (১৭২৩-৯২ খ্রি)। রেনল্ডস্ই অ্যাকাডেমির আদর্শকে নির্ধারিত করেছিলেন অ্যাকাডেমিতে প্রদত্ত তাঁর বাৎসরিক বক্তৃতাগুলিতে। রেনল্ডস্ তাঁর ভাষণগুলিতে বারংবার যে কথার ওপর জোর দেন তা হল ইটালির রেনেসাঁসের মহান শিল্পীদের আদর্শ সামনে রেখেই কাজ করতে হবে ইংল্যান্ডের তরুণ শিল্পীদের। তাঁর আগে ইংল্যান্ডে এ কথা এমন জোরের সঙ্গে কেউই বলেননি, এবং তিনিই প্রথম সচেষ্ট হন ব্রিটিশ চিত্রকলাকে তার মধ্যযুগীয় চরিত্র ও প্রাদেশিক মানসিকতা থেকে মুক্ত করে ইয়োরোপের চিত্রান্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত করতে। রয়াল অ্যাকাডেমির আদর্শ হিসাবে ইটালির রেনেসাঁস শিল্পীদের সৃষ্ট রূপাদর্শকেই (ideal beauty of form) তুলে ধরেন তিনি[২৭]। বস্তুজগৎকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করে, প্রকৃতির রূপ থেকে তার সারাৎসার আহরণ করে, 'আদর্শ সৌন্দর্য' রচনাই ছিল লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির উপদেশে দর্পণে প্রতিবিম্বিত রূপের মতোই বস্তুজগতের অনুকরণ ছিল আরব্ধ। বিষয় হিসাবে তিনি ছাত্রদের আগ্রহান্বিত করতে চেয়েছিলেন গ্রিক ও খ্রিশ্চান পুরাকাহিনীনির্ভর 'ঐতিহাসিক' (historical) ছবি আঁকার প্রতি। রেনল্ডস্ তাঁর পূর্ববর্তী ব্রিটিশ চিত্রকর হোগার্থের জীবনমুখী বাস্তবধর্মিতা বা তাঁর সমসাময়িক গেইন্‌সবোরো-র ব্যক্তিগত রোমান্টিক আবেদন থেকেই যেন মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন অ্যাকাডেমির ছাত্রদের। টিলি কেটল, জোফানি, ডেভিস প্রমুখ শিল্পীরা নানাভাবে যুক্ত ছিলেন এই রয়াল অ্যাকাডেমির সঙ্গে। কিছু কিছু ব্যক্তি ও চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও তাঁদের ছবিতে অ্যাকাডেমিক-রীতিই অনুসৃত হয়েছে।



২০ কর্নেল কাবনাক (হাতির দাঁতেব ওপব অঙ্কিত), ওজিয়াস হামফ্রি, আঃ ১৭৮৬ খ্রি

১৫ ইয়োরোপীয় শিল্পীদের সমাগম : চিত্রকলার ত্রিধারা

অষ্টাদশ শতকের শেষ আর উনিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে যে সব ইংরেজ শিল্পী কলকাতায় এসে কাজ করেছিলেন তাঁদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে ছিলেন তেলরঙের অ্যাকাডেমিক রীতির শিল্পীরা। এই দলের টিলি কেটল, জোফানি, ডেভিস, হিকি প্রমুখের কথা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। এঁরা প্রত্যেকেই প্রচলিত কেতায় ক্যানভাসে প্রতিকৃতি এঁকে পয়সা রোজগারের আশায় এসেছিলেন এবং এঁদের প্রায় সকলেরই সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে এও দেখা যায় যে এঁরা তখনকার ইংল্যান্ডের চিত্রকলার ধারা অনুযায়ী 'প্রতিকৃতি'র (portrait) পাশাপাশি কিছু কিছু 'ঐতিহাসিক' (historical) ও 'মজলিশি' (conversational) ছবিও এই কলকাতা শহরে বসে এঁকে গেছেন। এই সব ছবির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল জোফানির কয়েকটি কাজ। ইংল্যান্ডের রয়াল অ্যাকাডেমির মনোনীত সদস্য (১৭৬৯) জোফানি এ দেশে আসার আগেই প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কলকাতায় এসে স্বভাবতই বড় বড় ইংরেজ পুরুষদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেন তিনি। এই সব পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংস, ভারতে ইংরেজদের প্রথম গভর্নর-জেনারেল। তিনি ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সূত্রে অযোধ্যার নবাব দরবারের আনুকূল্যও লাভ করেছিলেন। কলকাতায় তাঁর যে সব ছবি আছে তার মধ্যে ঐতিহাসিক ছবি হিসাবে বিশিষ্ট হল সেন্ট জন চার্চের 'যিশুর শেষ ভোজ' দৃশ্যটি আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে রক্ষিত 'হায়দার বেগের দৌত্য' ও 'টিপু সুলতানের পুত্রকে লর্ড কর্নওয়ালিসের জামিনরূপে গ্রহণ' ছবি দুটি। ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে রাখা তাঁর 'ক্লদ মার্টিন ও তাঁর বন্ধুরা' মজলিশি ছবির এক সার্থক উদাহরণ। এই ছবিটিতে সে সময় ভারতে বসবাসকারী ইংরেজদের এক ঘনিষ্ঠ চিত্র জোফানি প্রায় হোগার্থের স্বতঃস্ফূর্ততায় রূপ দিয়েছেন। তাঁর আঁকা প্রতিকৃতিচিত্রের মধ্যে অবশ্যই নাম ৫
করতে হয় ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে রাখা ওয়ারেন হেস্টিংস ও শ্রীমতী হেস্টিংস (পূর্বতন শ্রীমতী ইম্‌হে)-এর ছবিটির। ডেভিসও ছিলেন স্বদেশে খ্যাতিমান শিল্পী। তাঁর আঁকা লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রতিকৃতি বিশেষ পরিচিত। 'মজলিশি' ছবিতেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজদের অভিযানের এক ঐতিহাসিক চিত্র তিনি আঁকেন লেফট্যানেন্ট কানিংহামের স্কেচ থেকে। সামাজিক দলিল হিসাবে মূল্যবান বাংলার গ্রাম-জীবনের বেশ কিছু ছবি আঁকেন ডেভিস। অন্যান্য শিল্পীরা কিন্তু প্রধানত প্রতিকৃতি রচনা করেই খ্যাত হয়েছিলেন। সে সময় ঐতিহাসিক ও মজলিশি ছবি আঁকার রেওয়াজ কমে আসছিল—কী ইংল্যান্ডে কী এদেশে। তার পরিবর্তে বরং দেখা দিচ্ছিল নিসর্গচিত্রের প্রতি আগ্রহ।

কিছুদিনের মধ্যেই বড় বড় ক্যানভাসে আঁকা তেলরঙের ছবির ক্ষেত্রে দু-রকমের অসুবিধা দেখা দিল। প্রথমত, এ দেশের উষ্ণ ও জলজ আবহাওয়ায় এসব ছবি দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে থাকল। দ্বিতীয়ত, বড় বড় ছবি স্থানান্তরিত করাও ছিল দুরূহ। কর্মজীবনের শেষে এসব ছবি ইংরেজদের পক্ষে স্বদেশে নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। তেলরঙের ছবির বিশেষ আভিজাত্য সত্ত্বেও এই সব অসুবিধার দরুন তার জনপ্রিয়তা হারাল। কেবলমাত্র বড় বড়

প্রতিষ্ঠান আর এদেশী রাজা-রাজড়াদের প্রতিকৃতিচিত্রের চাহিদা মেটাতে এই মাধ্যমের ছবির চল সারা উনিশ শতক জুড়ে থেকে গেল।

কেটল, জোফানি ও ডেভিস ছাড়াও যাঁরা তেলরঙের প্রতিকৃতি এঁকে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন টমাস হিকি, ফ্রান্‌চেস্কো রেনাল্ডি, রবার্ট হোম, জর্জ বিচি, মার্শাল ক্ল্যাক্‌সটন ও জেমস আর্চার। হিকি ছ-বছর কলকাতায় থেকে অনেকগুলি প্রতিকৃতিচিত্র এঁকেছিলেন, যার অন্যতম হল 'জামদানি বিবি'র (১৭৮৭ খ্রি) অতীব সংবেদনশীল উৎকৃষ্ট ছবিটি। পেশাগতভাবে অবশ্য তিনি খুব বেশি সফল হতে পারেননি, কারণ সে সময় এই শহরে জোফানির খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তবে সকল ইয়োরোপীয় চিত্রকরদের মধ্যে রবার্ট হোমই সম্ভবত এ দেশে সবচেয়ে বেশি দিন কাটিয়েছেন— ১৭৯১ থেকে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছরের মধ্যে তিনি লখনউ সহ ভারতের অন্যান্য স্থানে ছিলেন অনেকদিন, কিন্তু তাঁর কলকাতায় অবস্থানই ছিল দীর্ঘতম। একজন প্রতিকৃতি-রচয়িতা-শিল্পী হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতিমান হয়েছিলেন তাঁর রুচি ও দক্ষতার গুণে। তিনি কলকাতার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে সাংগঠনিকভাবে যুক্ত ছিলেন ; এবং তিনি তাঁর নিজের ও সংগ্রহের বহু তৈলচিত্র এই প্রতিষ্ঠানকে দান করে যান। হোমের তুলনায় রেনাল্ডি ও বিচি অনেক কম সময় কাটিয়েছেন বাংলা দেশে। ক্ল্যাক্‌সটন ও আর্চার কলকাতায় কাজ করেছেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে। ক্ল্যাক্সটনের আঁকা যুবাবয়সের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আর্চারের আঁকা স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতিকৃতি দুটি তাঁদের শিল্পকৃতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

দ্বিতীয়ভাগের শিল্পীরা ছিলেন হাতির দাঁতের ফলকের ওপর প্রতিকৃতি আঁকায় দক্ষ মিনিয়েচার শিল্পী। অষ্টাদশ শতকের ইয়োরোপে হাতির দাঁতের ওপর জলরঙে আঁকা ছবির বিশেষ কদর দেখা দিয়েছিল। ভারতে সেই ধারাকেই বহন করে আনেন জন স্মার্ট (১৭৮৫-৯৫), ওজিয়াস হামফ্রি (১৭৮৫-৮৭), স্যামুয়েল এন্ড্রুজ (১৭৯১-১৮০৭) ও ডায়না হিল (১৭৮৬-১৮০৬)। স্মার্ট প্রধানত কাজ করেছিলেন মাদ্রাজে ; হামফ্রি বাংলা দেশে ও লখনউতে। এঁরা সকলেই মিনিয়েচার এঁকে অর্থ ও সমাদর লাভ করেছিলেন। তবে এঁদের সকলের জনপ্রিয়তাকেই ম্লান করে দেন জর্জ চিনেরি (১৮০২-২৫)। একদিকে তিনি যেমন অনেক বেশি দিন এ দেশে, বিশেষ করে কলকাতায়, থেকে কাজ করেছিলেন, অন্যদিকে তাঁর কাজের পরিমাণও ছিল প্রচুর। কলকাতায় তিনি প্রায় পনেরো বছর ছিলেন আব সেই পনেরো বছর হাতির দাঁতের ওপর মিনিয়েচার আঁকায় তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। ছোট ও বহনযোগ্য বলে এই হাতির দাঁতের ছবিগুলির বিশেষ চাহিদা হয় কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে। তাঁর ছবি বেচে বছরে এক সময় আয় দাঁড়িয়েছিল পাঁচ হাজার পাউন্ড। চিনেরি যে খুব বড দরের শিল্পী ছিলেন তা নয়, তবে তেলরঙের ছবিতেও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ও খ্যাতি ছিল। এ দেশে পাশ্চাত্য চিত্রকলার কদর বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারে তাঁব ভূমিকা ছিল বহুমুখী। তিনি পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের ইয়োরোপীয় চিত্রকলার সংগ্রহের জন্য ছবি বেছে দেওয়াব দায়িত্বও পালন করেছিলেন। বেঙ্গল আর্মির কমান্ডার-ইন-চিফ জর্জ নুজেন্টের পত্নী শ্রীমতী নুজেন্ট[২৮] ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের ১২ মার্চ লিখছেন: "চিনেরির ছবি দেখলাম ; সাদৃশ্যধর্মিতায় অত্যুৎকৃষ্ট"। আর চার্লস ডয়েলি তো তাঁর একটি কবিতায় চিনেরিকে তখনকার ভাবতেব শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলেই উল্লেখ করেছেন।

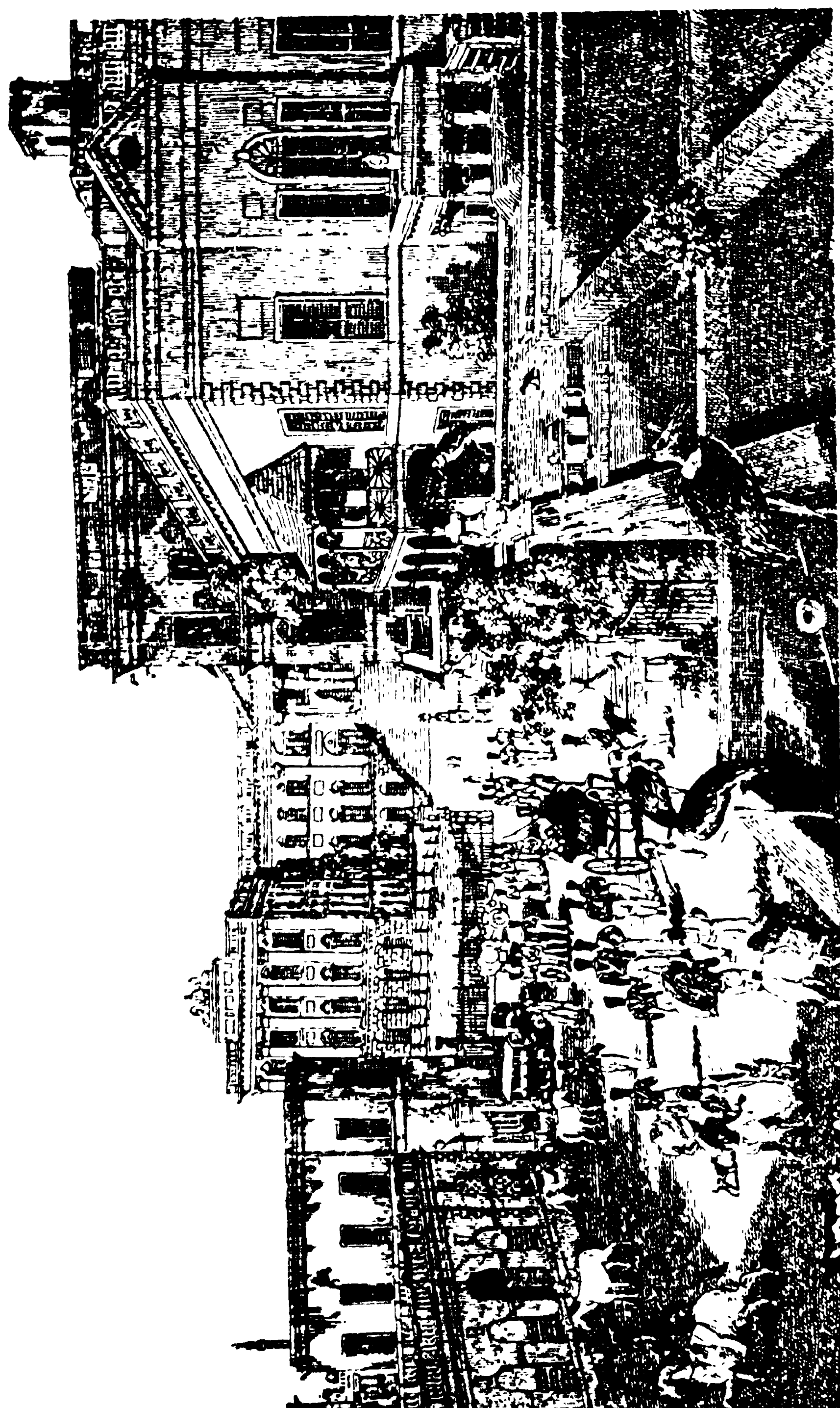
তৃতীয়ভাগের শিল্পীরা এঁকে গেছেন ব্রিটিশ পরম্পরাব স্বচ্ছ জলবঙেব ছবি। এই সব ছবি থেকে পবে অনেকেই এনগ্রেভিং একোয়াটিন্ট বা লিথোপদ্ধতিতে ছাপাই ছবির অ্যালবাম বানিয়ে অর্থ ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। এই তৃতীয় ভাগেব শিল্পীরা প্রধানত আঁকতেন এ

দেশের সব 'চমৎকারী' (picturesque) দৃশ্যাবলি আর সাধারণ মানুষের বিচিত্র বেশভূষা ও জীবনধারার ছবি। এ জাতীয় ছবি এঁকে প্রথম সফল শিল্পী হলেন উইলিয়াম হজেস (১৭৮০-৮৩)। হজেস ড্রাফটস্‌ম্যান হিসাবে ক্যাপ্টেন কুকের দ্বিতীয় দফার দক্ষিণ সাগর অভিযানে সঙ্গী ছিলেন। ভারতে আসার আগেই রয়াল অ্যাকাডেমিতে তাঁর ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল। ভারতে এসে তিনি প্রধানত কলকাতাকেই তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেন। এখানে তিনি অ্যাডভোকেট জেনারেল টমাস হেন্‌রি ও গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের আনুকূল্য পেয়েছিলেন। কলকাতা থেকে বারাণসী, কানপুর, লখনউ, আগ্রা ও অন্যান্য স্থান পরিভ্রমণ করে তিনি বহু স্কেচ আঁকেন। বিলেতে ফিরে তিনি তার ভিত্তিতেই ভারতীয় দৃশ্যের এনগ্রেভিং প্রিন্টের অ্যালবাম 'সিলেক্ট ভিউজ অব ইন্ডিয়া' (১৭৮৩ খ্রি) প্রকাশ করে প্রভূত অর্থোপার্জন করেছিলেন। ওই সব ছবি নির্ভর করে আঁকা তেলরঙের অনেকগুলি ক্যানভাস রয়াল অ্যাকাডেমিতে প্রদর্শিত হয় এবং অ্যাকাডেমি তাঁকে সহযোগী সদস্য নির্বাচন করে সম্মানিত করে । কয়েক বছর পর ভারতভ্রমণ নিয়ে লেখা তাঁর সচিত্রগ্রন্থ 'ট্রাভেলস অব ইন্ডিয়া' (১৭৯৩ খ্রি)-তেও তিনি একইভাবে এদেশের প্রকৃতি, মানুষজন, তাদের আচার-ব্যবহার, পেশা ইত্যাদির বিশ্বাসযোগ্য দলিল রেখে গেছেন।

হজেসের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আরও কয়েকজন ইংরেজ শিল্পী এ দেশে এসে এ দেশের নিসর্গ ও জীবনযাত্রার ছবি এঁকে ও পরে তা প্রিন্ট করে যথেষ্ট পয়সা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন টমাস ও উইলিয়াম ড্যানিয়েল। যে আট বছর (১৭৮৬-৯৪) তাঁরা ভারতে ছিলেন তার মধ্যে তাঁরা কয়েকটি কষ্টসাধ্য ভ্রমণে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত, এমন-কি তখনকার সিংহলেরও অনেক ছবি আঁকেন। তাঁরা ছিলেন অক্লান্ত পরিশ্রমী। নৌকোয় পালকিতে এমন-কি পদব্রজেও তাঁরা ভ্রমণ করেছেন। তাঁরা ছবি আঁকার জন্য 'ক্যামেরা অবস্কিউরা' নামে একরকম যন্ত্র ব্যবহার করে নির্বাচিত দৃশ্যকে সাদা কাগজের ওপর লেন্সের সাহায্যে প্রতিফলিত করতেন। এইভাবে তাঁরা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য প্রকৃতিবাদী ছবি এঁকে খ্যাতি অর্জন করেন। সেই কারণে তখনকার বাংলা সরকার তাঁদের ছবির ওপর নির্ভর করেই রোটাস দুর্গের জীর্ণ-সংস্কার করিয়েছিলেন। তাঁদের এনগ্রেভিং-এ ছাপা 'টুয়েলভ ভিউজ অব ক্যালকাটা' (১৭৮৬-৮৮), 'ওরিয়েন্টাল সিনারি' (১৭৯৫-১৮০৮) ও 'পিকচারেস্ক ভয়েজ অব ইন্ডিয়া' (১৮১০ খ্রি) বইগুলি মহার্ঘ হলেও দীর্ঘদিন ধরে বিক্রি হয়েছে। ড্যানিয়েলদের ছবির গুণ হল তাদের আলোকচিত্রসদৃশ বিশ্বস্ততা। নচেৎ তাঁদের ছবির শিল্পগুণ আদৃত হওয়ার মতো নয়।

হজেস ও খুড়ো-ভাইপো ড্যানিয়েলরা ছাড়াও যে সব শিল্পী জলরঙে এঁকে পরে তার থেকে এনগ্রেভিং প্রিন্ট ছেপে সাফল্য লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে 'ভিউজ অব ক্যালকাটা, বেহরামপুর, মোঙ্গির অ্যান্ড বেনারস' (১৮০৫ খ্রি)-এর শিল্পী জেমস মোফাট ও দু'শ পঞ্চাশটি এনগ্রেভিং চিত্রের বই 'ম্যানার্স অ্যান্ড কাস্টমস অ্যান্ড ড্রেসেস অব ইন্ডিয়া' (১৭৯৯ খ্রি)-র শিল্পী বালথাজার সোলভিন্স বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোফাট এঁকেছেন এ দেশের হাট-বাজার আর তার কেনাবেচায় রত মানুষজন; সোলভিন্সের ছবিতে ধরা আছে আঠারো শতকের বাঙালির জীবনধারা—তাদের পোশাক-আসাক, আচার-আচরণ, পালা-পার্বণ ইত্যাদির চাক্ষুষ বিবরণ।

আঠারো শতকের শেষদিক থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কালের বাংলার সমাজজীবন, ঐতিহাসিক নগরীর স্থাপত্যকর্ম ও নিসর্গের পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে কিন্তু কেবলমাত্র পেশাদার শিল্পীদের ওপর নির্ভর করলে চলে না। নতুন আর বিস্ময়কর এক উপমহাদেশের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করে সে দেশ সম্পর্কে যে বিপুল কৌতূহল ইংরেজদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল, সেই কৌতূহল আর উদ্দীপনা নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেশ কয়েকজন



উচ্চপদস্থ কর্মচারী শৌখিন চিত্রকর হিসাবে ভারতবিষয়ে বহু ছবি এঁকে গেছেন। এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় কোম্পানির সিভিলিয়ন চার্লস ডয়েলি-র (১৭৮১-১৮৪৫)। ডয়েলির জলরঙের ছবিতে অবশ্যই বেলজিয়ান শিল্পী সোলভিন্সের দক্ষতা আশা করা যায় না। কিন্তু ছবির বিষয় নির্বাচনে তিনি যে সোলভিন্সের চেয়েও অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়, তা স্বীকার করে নিতে হয়। ডয়েলি যেমন তাঁর 'ভিউজ অব ক্যালকাটা' (১৮৪৮ খ্রি) ও 'অ্যান্টিকুইটিস অব ঢাকা' (১৮১৬ খ্রি) গ্রন্থে এই দুই শহরের স্থাপত্যকর্মের দলিল রেখে গেছেন, তেমনই তাঁর 'দি ইয়োরোপিয়ান ইন ইন্ডিয়া' (১৮১৩ খ্রি) গ্রন্থে এঁকে গেছেন বাংলায় কর্মরত তখনকার ইংরেজদের বিলাসবহুল জীবনের দৃশ্যাবলি। অপর এক শৌখিন শিল্পী উইলিয়াম ফ্রাঙ্কলিন (১৭৬৩-১৮৩৯) ছিলেন ভারতীয় পুরাতত্ত্বে আগ্রহী ও এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য। রাজমহল থেকে গৌড় পর্যন্ত ভ্রমণ করে তিনি পাণ্ডুয়ার আদিনা ও গৌড়ের বড়সোনা মসজিদের ছবি এঁকেছিলেন। স্কটল্যান্ডের হেনরি ক্রেইটন ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় এসেছিলেন নীলকুঠিতে চাকরি করতে। গৌড় কর্মস্থান হওয়ায় তিনি সেখানকার পরিত্যক্ত স্থাপত্যের পনেরোটি ছবি এঁকে ছেপেছিলেন। অপর এক শখের শিল্পী জর্জ ফ্রাঙ্কলিন অ্যাটকিন্সন ছিলেন বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্স বাহিনীর ক্যাপ্টেন। তিনি ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'দি ক্যাম্পেন ইন ইন্ডিয়া'তে ২৬টি ছবির মাধ্যমে ভারতীয় ইতিহাসের ইংরেজবিরোধী প্রথম মহাবিদ্রোহ, যাকে তারা আখ্যা দেয় 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলে, তার রক্তাক্ত অধ্যায়টি চিত্রিত করে গেছেন—অবশ্যই ইংরেজদের দৃষ্টিকোণ থেকে। অন্যদিকে তিনি ছিলেন ব্যঙ্গাত্মক রচনা ও চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী। তিনি 'কারি অ্যান্ড রাইস' নামক তাঁর বইটির লেখায় ও ছবিতে এ দেশে বসবাসকারী কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের জীবনের ত্রুটিগুলি অনাবিল কৌতুকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ইয়োরোপীয় শিল্পীরা যাঁরা বিশেষ করে কলকাতায় বসে ছবি এঁকে গেছেন তাঁদের তালিকায় অবশ্যই নাম করতে হয় দু-জন মহিলা শিল্পীর—একজন শৌখিন, অন্যজন পেশাদার, নাম যথাক্রমে—এমিলি ইডেন ও দ্যাঁ জ্যাকুইস বেলনস। এমিলি ইডেন ছিলেন গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড (১৮৩১-৩২)-এর ভগিনী। বছরখানেক কাল কলকাতায় থাকার সময় তিনি এই শহরের জীবনযাত্রার বর্ণনা যেমন লিখে গেছেন তাঁর রোজনামচায়, তেমনই তাই নিয়ে অনেক ছোট ছোট জলরঙের ছবিও এঁকে গেছেন। সেই ছবিগুলি এখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের এক মূল্যবান সংগ্রহ। বেলনস ছিলেন বাংলায় ভূমিষ্ঠা ফরাসিভাষী কন্যা, তাঁর স্বামীও ছিলেন ফরাসি। একজন নারীর দৃষ্টি নিয়ে তিনি অনুপুঙ্খভাবে চিত্রিত করেছেন তখনকার কলকাতার নাগরিক জীবন, অন্তঃপুরিকাদের আচার-আচরণ-বেশভূষা, গ্রামের পাঠশালা, মজলিশ, আর বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর পূজা-অর্চনা ও পূজারী ব্রাহ্মণের একাগ্রনিষ্ঠা। এছাড়া আরও কয়েকজন শিল্পীর হাতে কলকাতার স্থাপত্য ও জনজীবন অতীব বিশ্বস্ততায় অঙ্কিত হয়েছে—যেমন জেমস মোফাট, জেমস বেইলি ফ্রেজার, উইলিয়াম টেলার, উইলিয়াম প্রিন্সেপ ও উইলিয়াম সিম্পসন। ৭



২২ সারস, শেখ জয়নুদ্দিন, কলকাতা, আঃ ১৭৮০-৮২ খ্রি

১৬ কোম্পানি শৈলী : কলকাতা পর্ব

কলকাতা শহর ইংরেজশাসিত ভারতের রাজধানীতে পরিণত হওয়ায়, অন্যান্য পেশার কারিগরদের মতো শিল্পীদের প্রয়োজনও নানা কারণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। পেশাদারি ইংরেজ শিল্পীরা তখন অবশ্যই ছিলেন; কিন্তু তাঁদের ছবি ছিল মহার্ঘ, তা ছাড়া ছোটখাট কাজ তাঁরা করতেন না। অন্যদিকে যে সব শৌখিন ইংরেজ শিল্পী ছবি আঁকতেন সেগুলিও সীমাবদ্ধ থাকত তাঁদের পরিবার ও আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যেই। অথচ তখন কী ইংল্যান্ডে কী ভারতবর্ষে ইংরেজদের মধ্যে এ দেশ সম্পর্কে কৌতূহল ছিল প্রবল। তাই বহুজনের দাবি মেটানোর প্রয়োজনেই দরকার হল দেশী শিল্পীদের দিয়ে নিজের রুচি ও ইচ্ছা অনুযায়ী ছবি করিয়ে নেওয়ার। সে সময় নবাব ও অভিজাত শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে মুঘল পরম্পরার শিল্পীরাও রুজি-রোজগারের আশায় হাজির হচ্ছিলেন 'নতুন নবাব' ইংরেজদের শহর কলকাতায়। কলকাতায় বসবাস করছেন এমন ইংরেজদের অনেকেই নিজের নিজের কাজে বহাল করলেন এই সব শিল্পীদের।

প্রসঙ্গত প্রথমেই উল্লেখ করা যায় কলকাতার সদ্য-প্রতিষ্ঠিত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্‌পের পত্নীর কথা। স্যার ইম্‌পে কলকাতায় আসেন ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে। ওয়ারেন হেস্টিংসের অন্যান্য পার্ষদদের মতো তিনিও ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি সংগ্রহ করতে থাকেন এ দেশের পুথি ও চিত্র; তাঁর পত্নী শ্রীমতী ইম্‌পে গড়ে তোলেন ভারতের, এমন-কি সুদূর পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আনা নানা রূপ ও বর্ণের পশুপাখির সংগ্রহশালা। এই সংগ্রহশালার পশুপাখির প্রামাণিক ছবি আঁকার প্রয়োজনে শ্রীমতী ইম্‌পে তিনজন দেশী শিল্পী নিযুক্ত করেন—জৈনুদ্দিন, ভবানী দাস ও রাম দাস। এঁদের আঁকা পশুপাখি সিরিজের অনেকগুলি ছবি বর্তমানে রক্ষিত আছে অক্সফোর্ডের অ্যাসমোলিয়ান মিউজিয়মে। এই সব ছবির পিছনের লেখা থেকে জানা যায়, এই তিনজন শিল্পীই কলকাতায় আসেন পাটনা থেকে। সেই সূত্রে প্রায় সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে এঁরা ছিলেন মুঘল পরম্পরার পাটনা কলমের শিল্পী। এঁদের মধ্যে শিল্পী হিসাবে নিঃসন্দেহেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন জৈনুদ্দিন। তাঁর ছবিগুলিতে মুঘল দরবারের মহান প্রকৃতি-পর্যবেক্ষক শিল্পী ওস্তাদ মনসুর ও ব্রিটিশ ধারার প্রকৃতিবিজ্ঞানী শিল্পীদের কাজের এক সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল। ইংল্যান্ডে তৈরি হোয়াইট ম্যান কাগজে ব্রিটিশ রীতির স্বচ্ছ জলরঙে ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি যে সব পশুপাখির ছবি আঁকেন তাতে মুঘল পরম্পরার অনুপুঙ্খ-প্রবণতা সুস্পষ্ট। তাঁর পাহাড়ি ইঁদুর আর ঝুলন্ত বাদুড় হয়ত কেবল জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেই গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু এ কথা মানতেই হয় যে তাঁর টিয়া আর সারস নান্দনিক গুণেই নয়নাভিরাম। কলকাতার প্রথম দিককার কোম্পানি ২২
শৈলীর শিল্পীদের মধ্যে জৈনুদ্দিনই ছিলেন অগ্রগণ্য।

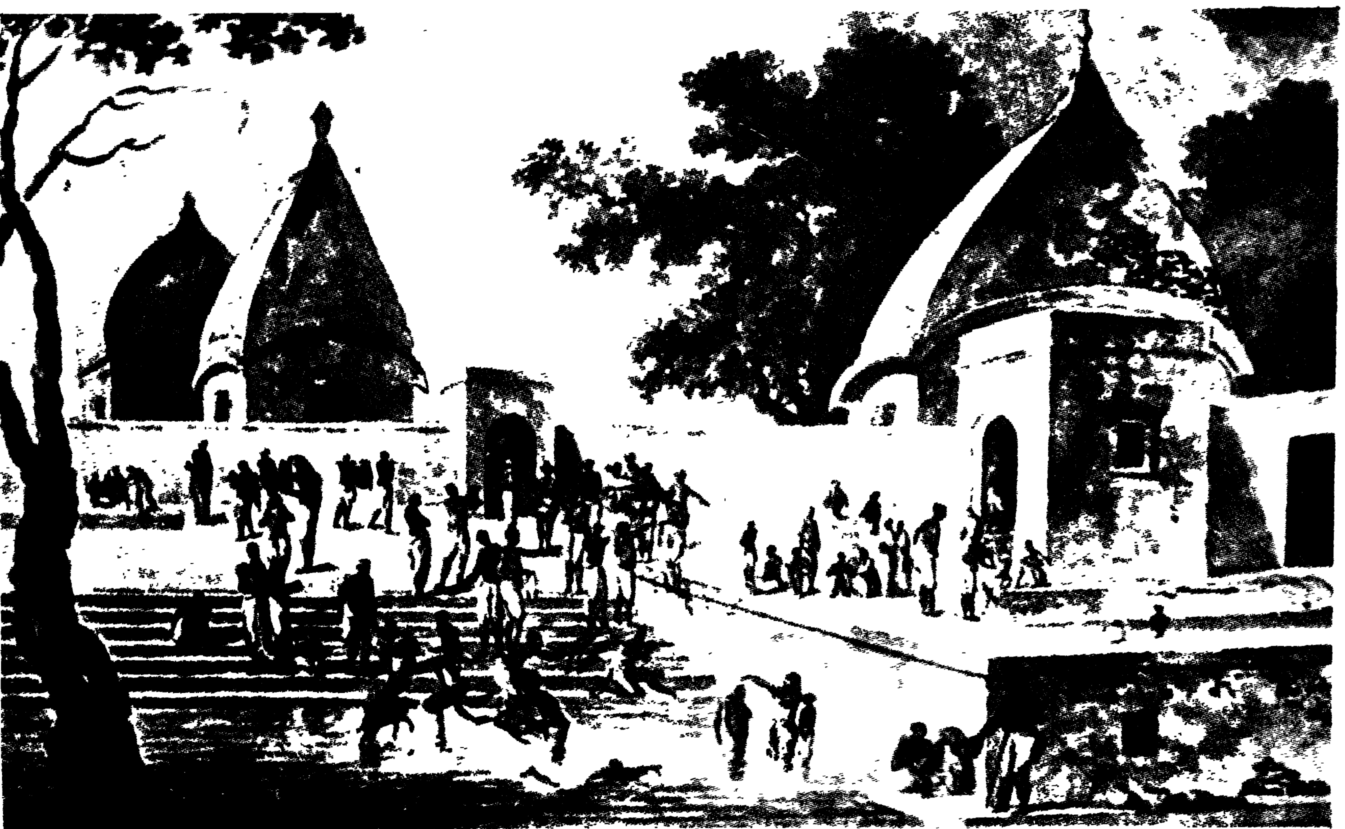
শ্রীমতী ইম্‌পে ছাড়া আরও অনেক ইংরেজ নারীপুরুষ সে সময় আপন আপন কাজে ভারতীয় শিল্পীদের নিযুক্ত করেছিলেন কলকাতায়—যেমন শ্রীমতী এডওয়ার্ড হুইলার ও নাথানিয়েল মিড্‌লটন। এমিলি ইডেন তো তাঁর বহু ছবিই কপি করিয়ে নিয়েছিলেন এ দেশী শিল্পীদের দিয়ে। চার্লস ডয়েলির মতো আবার কেউ কেউ ব্যক্তিগত যত্নে দেশী শিল্পীদের শিক্ষিত করেছেন ইয়োরোপীয় রীতিতে ছবি আঁকায়। কারণ এ দেশীয় পরম্পরাগত চিত্ররীতি তাঁদের সন্তুষ্ট করতে

পারেনি। কেননা তাঁরা উৎকৃষ্ট ছবি বলতেই রেনেসাঁস আদর্শের ছবি বুঝতেন। সেই আদর্শের বাইরে যে অন্য কোনো শিল্পাদর্শ থাকতে পারে তা তখন শিক্ষিত ইংরেজদের কাছেও ছিল অভাবনীয়।

কিন্তু কেবল ভারতবর্ষ—তার মানুষজন, পুরাকীর্তি, নিসর্গ—সম্পর্কে কৌতূহল মেটানোর জন্যেই যে ইংরেজরা দেশী শিল্পীদের নিযুক্ত করেছিলেন, তা নয়। কোম্পানির নানা ধরনের আঁকার কাজেও তাঁদের ডাক পড়ল। এই সব শিল্পীদের অনেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী হয়ে বিশেষ বিশেষ ব্যাবহারিক নকশা ও ছবি এঁকে পাবদর্শিতা অর্জন করলেন। এ দেশের শিল্পীদের প্রমাণ, পরিপ্রেক্ষিত ও ছায়াতপের ব্যবহার বিষয়ে অজ্ঞতার কথা ইংরেজ চিত্রবেত্তারা বারবার যেমন উল্লেখ করেছেন, সেই সঙ্গে তাঁরা এও বলেছেন যে প্রতিচিত্রণের কাজে তাঁদের দক্ষতা সব সময়েই ছিল প্রশংসনীয়। এই কারিগরসুলভ নিষ্ঠা ও দক্ষতা নিয়েই কোম্পানি-নিযুক্ত এককালের মুর্শিদাবাদ আর পাটনা কলমের শিল্পীরা আঁকলেন শিবপুরের ৬
বোটানিক্যাল গার্ডেনের লতা-পাতা-বৃক্ষ-ফল-ফুলের ছবি। তা ছাড়া ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে মার্কুইস ওয়েলেস্‌লি যখন ফ্রান্সিস বুকানন প্রমুখের সাহায্যে বারাকপুরে 'ইনস্টিটিউট অব প্রোমোটিং ন্যাচারাল হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া' প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন তার পশুশালার পশুপাখির ছবি আঁকার কাজেও নিযুক্ত হলেন অনেক ভারতীয় শিল্পী। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিশিষ্ট পেশাদার ইংরেজ শিল্পী রবার্ট হোম যে সব পশুপাখির ছবি সে-সময় জলরঙে আঁকেন, তার থেকে ২১৫টি ছবি নিয়ে দু-খণ্ডের একটি গ্রন্থ ছাপা হয়। ভারতীয় যে সব শিল্পী ওই একই পশুশালায় ছবি আঁকার কাজে কোম্পানির দ্বারা নিযুক্ত হন, তাঁরাও হোমের রীতিতেই ব্রিটিশ ধারায় জলরঙে পশুপাখির ছবি আঁকেন। এইভাবেই কোম্পানি-নিযুক্ত শিল্পীরা মুঘল পরম্পরার ঘন জলরঙের (gouache) বদলে ব্রিটিশ রীতির স্বচ্ছ জলরঙে (watercolour) কাজ করতে অভ্যস্ত হলেন।

বোটানিক্যাল গার্ডেন কিংবা পশুশালার কাজেই শুধু নিয়োজিত হননি কোম্পানির শিল্পীরা। ফ্রান্সিস বুকানন ও রবার্ট কিড তাঁদের দিয়ে ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের ছবি ও নকশাও আঁকিয়ে নিয়েছিলেন। এমন-কি, মিলড্রেড আর্চার দেখিয়েছেন যে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়োজনীয় ছবিও কোম্পানি শিল্পীরা করেছেন। এই সব নানা ধরনের ছবি আঁকার প্রয়োজনে, আর ব্রিটিশ রীতির ছবির নিদর্শন দেখে, ভারতীয় শিল্পীরাও তাঁদের এত দিনের নির্দিষ্ট ছবির আকার আর কাঠামো বদলে ফেললেন। ছবি বড় হল। আর পুরনো হাতে তৈরি বোর্ডের বদলে আঁকা হতে থাকল বিলেতি সাদা কাগজে।

উনিশ শতকের সূচনা থেকেই কলকাতার দেশী শিল্পীরা কাজ পেলেন বিশেষ করে ভারতীয় নিসর্গ, মানুষজন ও তাদের জীবনধারা, প্রাচীন স্থাপত্যকর্ম ইত্যাদির চিত্র রচনার কাজে। এই সব ছবি তখন গুচ্ছ করে ইংরেজদের মধ্যে বিক্রি হত—যাঁরা ইংল্যান্ড থেকে এ দেশে কাজে আসতেন তাঁরা বিশেষ উৎসাহে সংগ্রহ করে নিয়ে যেতেন ভারতের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে। এসব ছবির বিষয় কিন্তু কেবলমাত্র কলকাতা বা লখনউ এবং তার আশপাশের দৃশ্যাবলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং আগ্রা, দিল্লি, ফতেপুর সিক্রি, এমন-কি শ্রীরঙ্গপত্তম ও বার্মার স্থাপত্যকর্মের ছবিও আঁকা হল একই উদ্দেশ্যে। ইতিমধ্যে উইলিয়াম হজেস ও ড্যানিয়েলদের আঁকা ভারতীয় দৃশ্যাবলির যে সব প্রিন্ট কলকাতার বাজারে বিক্রি হত তা কিনে তার থেকেও শিক্ষা নিতে কুণ্ঠিত হলেন না কোম্পানি শৈলীর ভারতীয় শিল্পীরা। তা ছাড়া এনগ্রেভিং পদ্ধতিতে ছবি ছাপার কাজে ও রঙের ছোপ ধরানোয় দেশী শিল্পীদের যে ড্যানিয়েলবা নিযুক্ত করেছিলেন সে কথা জানা যায়। নানাদিক থেকে নানাভাবেই কোম্পানি শিল্পীরা ব্রিটিশ চিত্ররীতিতে দীক্ষিত হওয়ার সুযোগ



২৩ টিটাগড়ের কালী-মন্দির, কলকাতা, আঃ ১৭৯৮ ১৮০৪ খ্রি।

পেয়েছিলেন সে সময়। বেলজিয়ান শিল্পী বালথাজার সোলভিন্স হিন্দুদের আচার-আচরণ, বেশভূষা, ধর্মোৎসব বিষয়ে তাঁর যে বিরাট এচিং-এর অ্যালবামটি প্রকাশ করেছিলেন (১৭৯৬ খ্রি) তার থেকেও প্রভাবিত হয়ে ছবি করেছেন কোম্পানি রীতির শিল্পীরা।

কোম্পানি শিল্পীদের ছবির চাহিদা কলকাতায় উনিশ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত ছিল বলে জানিয়েছেন মিলড্রেড আর্চার। তারপর ফোটোগ্রাফির প্রচলন ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ছবির কদর কমতে থাকে। অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কালে স্পষ্টতই দেখা যায় তিন ধরনের ছবি এঁকেছিলেন কলকাতার কোম্পানিনিযুক্ত দেশী শিল্পীরা। প্রথম দিকে অবশ্যই তাঁরা মুঘল রীতির মুর্শিদাবাদ ও পাটনা কলমের ধারাতেই ছবি করেছেন—যদিও বিষয়ের কারণে তার মধ্যে দেখা দিয়েছে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য। দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন নানান ব্যাবহারিক কাজে এই সব শিল্পীরা নিযুক্ত হলেন এবং ইংরেজ অধিকর্তাদের নির্দেশে তাঁদের রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী ছবি করতে থাকলেন, তখন তাঁদের কাজে দ্রুত ব্রিটিশ করণকৌশল ও পাশ্চাত্য চিত্রকলার বাস্তবানুগতার ছাপ পড়তে থাকল।

এই সব কাজ এমনই তথ্যনিষ্ঠ যে এগুলিকে কলাশিল্পের পর্যায়ভুক্ত না করে বরং বলা চলে চিত্রিত নথি। তৃতীয় পর্যায়ে, উনিশ শতকের ত্রিশ থেকে ষাটের দশকের মধ্যে, কলকাতার কোম্পানি শৈলীর শিল্পীরা বিশেষ মনোযোগী হন নানান পেশার মানুষদের ছবি দিয়ে সেট তৈরি করে ইংরেজ ক্রেতাদের কাছে বেচতে। এই সব কিছু কিছু সেট এখন লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি ও অন্যান্য কয়েকটি সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। এ সময় শিল্পীদের কাজে ক্রমশ রানি ভিক্টোরিয়ার আমলের রুচি প্রভাব ফেলতে থাকে। ফলে অ্যাকাডেমিক বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণাঢ্যতাও যুক্ত হয়—আগেকার একঘেঁয়ে ছাই আর খয়েরির বদলে দেখা দেয় উজ্জ্বলতর নীল, বেগুনি, হলদে আর গোলাপির ব্যবহার। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির ছবিগুলিতে দু'জন কলকাতার শিল্পীর নাম পাওয়া গেছে—ই. সি. দাশ ও শেখ মুহম্মদ আমির। ই. সি. দাশের স্বাক্ষরিত চারটি স্কেচে মুনশি, নাপিত, চাকর আর সরকার চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তুলনায় মুহম্মদ আমিরের সেটের ছবির সংখ্যা অনেক বেশি। তিনি যে কেবল নানান পেশায় নিযুক্ত মানুষজনের ছবি এঁকেছেন তা নয়, শহরে ঘুরে ঘুরে ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতাতে অন্য ধরনের ছবিও করেছেন। তাঁর মনিবদের অন্যতম ছিলেন চৌরঙ্গি অঞ্চলের ৫নং পার্ক স্ট্রিটের অধিবাসী টমাস হলরয়েড। তাঁর ম্যানসন, ঘোড়ায় টানা গাড়ি, ঘোড়া, সইস ইত্যাদি এঁকেছিলেন তিনি। তাঁর ছবি দেখলে বোঝা যায় ইয়োরোপীয় বাস্তবধর্মিতা, ছায়াতপের ব্যবহার, পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞান ও শারীরবিদ্যার জ্ঞান তিনি কতখানি অর্জন করতে পেরেছিলেন। বিশেষ করে ঘোড়া আর কুকুর আঁকায় তাঁর পারদর্শিতা প্রায় অবিশ্বাস্য। তিনি যে কেবল কোম্পানি শৈলীর শেষ সার্থক শিল্পী, ৮
তাই নয়, সম্ভবত তিনি এই শৈলীর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিও।

কোম্পানি শৈলীর শিল্পীরা কেবল মুর্শিদাবাদ বা কলকাতাতেই তাঁদের কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখেননি। লেফ্‌ট্যানেন্ট কর্নেল ডব্লু. আর. গিলবার্ট-এর মতো পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে তাঁদের কেউ কেউ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে সেখানকার নিসর্গ, যুদ্ধ, স্থাপত্য ইত্যাদিও এঁকে ২৩
গেছেন। কলকাতার এই সব অনামী শিল্পীদের কাজের সাবলীল তুলিসঞ্চালন ও পরিপ্রেক্ষিতবোধ বিস্ময় উদ্রেক না করে পারে না।

১৭ বৈষ্ণব-ধর্মাশ্রিত চিত্রকলার বিস্তার

অষ্টাদশ শতক থেকে উনিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বাংলার চিত্রকলার বিকাশ আর বিবর্তন ঘটেছিল প্রধানত দুটি শহরকে কেন্দ্র করে—নবাবদের রাজধানী মুর্শিদাবাদ ও ইংরেজদের নগরী কলকাতা। তার বিস্তৃত ইতিহাস আগের কয়েকটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখন আমরা ফিরে তাকাব বাংলার গ্রাম-জনপদের দিকে—দেখব দেশের সেই রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় গ্রামের মানুষ কীভাবে কতখানি তাদের পরম্পরাগত কলাশিল্পের বর্ণাঢ্য অভিব্যক্তিটিকে সজীব রাখতে পেরেছিল।

নানা কারণেই অষ্টাদশ থেকে উনিশ শতকেব প্রথম ভাগ অবধি সময়ে আঁকা ছবির নিদর্শন গ্রামবাংলায় দুর্লভ। তার মধ্যে যে দুটি কারণ সহজেই চিহ্নিত করা যায় তার একটি সামাজিক, অন্যটি করণকৌশলগত। সে সময় এক বিরাট সমাজ – অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মুখে গ্রামের সমৃদ্ধি দ্রুত লোপ পেতে থাকায় সেখানকাব মানুষের পক্ষে কলাশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তার ফলেই সে সময় শিল্পীরা যতটুকু এঁকেছিলেন তাও আঁকতে বাধ্য হয়েছিলেন অস্থায়ী জমিতে। তাই তাঁদের অধিকাংশ কাজই প্রকৃতির হাত থেকে রক্ষা পায়নি। এই পরিস্থিতিতে গ্রামবাংলার এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে যে কয়েকটি ছবির সন্ধান পাওযা গেছে তার ওপর নির্ভর করেই আমাদের আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সপ্তদশ শতকে যেমন, তার পরবর্তী দুই শতকেও বাংলার চিত্রকলার প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল চৈতন্যদেব ও তাঁর বৈষ্ণবধর্ম। মধ্যযুগের বাঙালি জাতিসত্তা যে তাঁর দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছিল তা শুধুমাত্র চিত্রকলার সাক্ষ্য থেকেও উপলব্ধি করা যেতে পারে। গ্রামের উচ্চ-নিচ, ধনী-দরিদ্র, জ্ঞানী-মূর্খ সকলের জীবনই তাঁর 'প্রেমভক্তি'র মন্ত্রে সজীবিত ও রসসিক্ত হয়ে উঠেছিল। আর সেই কারণেই সংগীতে, সাহিত্যে ও রূপকলায় কীর্তিত হয়েছে তাঁর জীবন ও ধর্ম। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে ও তাঁর ধর্মকে আশ্রয় করে রচিত চিত্রে উচ্চকোটি ও লৌকিক দুই ধারাই প্রবহমান দেখা যায়। এই সব ছবি কখনও আঁকা হয়েছে পাটার ওপর, কখনও পটে, কখনও মন্দিরের ভেতর, কখনও আবার মুঘল পরম্পরার মুর্শিদাবাদ শৈলীতেও। কোনো কোনো ছবিতে রাজস্থানি চিত্রকলার ছাপও স্পষ্ট চোখে পড়ে।

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গ'[২৯] গ্রন্থে সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের প্রথমাবধি কালে আঁকা সপার্ষদ চৈতন্যদেবের অনেকগুলি ছবি ছেপেছেন। এই ছবিগুলির মধ্যে অবশ্যই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল কাগজের ওপর জলরঙে আঁকা নবদ্বীপে সপার্ষদ চৈতন্যদেবের নগর-সংকীর্তনের বড় আকারের (৭৫ সি·এম· X ৬০ সি·এম·) ছবিটি। এই ছবিটি শোনা ৯
যায় এককালে ছিল শ্রীনিবাস আচার্যের গৃহে এবং এটি পরবর্তী এক সময় গুরুর উপহার হিসাবে আড়িয়াদহের মল্লিকদের কোনো এক পূর্বপুরুষ লাভ করেন। সেই হিসাবে দীনেশচন্দ্র ছবিটির কাল নির্ণয় করেছেন সপ্তদশ শতক। কিন্তু ছবিতে নিসর্গের যে ধরনের রূপায়ণ লক্ষ করা যায়, তাতে মনে হয় ছবিটি পরবর্তী শতকের রচনা। শিল্পী এই ছবিটির বিস্তৃত পটভূমিতে সহস্রজনের সমাগমে এক উদ্দীপনাময় সংকীর্তনদৃশ্যকে ভাবক্রিয়ায় প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। রূপনির্মিতিতে শিল্পী প্রধানত দেশজ আদর্শই অনুসরণ করেছেন—বিশেষত রাজপুত চিত্রকলার অনুরূপ রেখায়



২৪ অশোকবনে রামসীতাব মিলন, 'বামচরিতমানস' পাণ্ডুলিপি চিত্র, মেদিনীপুর, ১৭৭২ ৭৩ খ্রি



২৫ রাম-রাবণের যুদ্ধ, 'রামচরিতমানস' পাণ্ডুলিপি-চিত্র, মেদিনীপুর, ১৭৭২-৭৬ খ্রি

চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে। কিন্তু দূরবর্তী প্রাসাদ ও আকাশের মেঘ, সম্মুখবর্তী নদী, তার জলধারা ও তটভূমি ইত্যাদি রূপায়ণে শিল্পী যে সচেতনভাবেই পাশ্চাত্য চিত্ররীতির পরিপ্রেক্ষিত ও আলোছায়ার সাহায্য নিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সপার্ষদ চৈতন্যদেবের নগর-সংকীর্তনের প্রভাবে হৃতচিত্ত মাঝি, তার যাত্রী ও নদীতে স্নানরতা রমণীদের যে বাস্তবতাবোধে উপস্থিত করা হয়েছে তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আড়িয়াদহের মল্লিকবাড়িতে গিয়ে এই ছবিটি যে প্রায়ই দেখে আসতেন, তার কারণও হল এই প্রাণবন্ত উপস্থাপনা।

দীনেশচন্দ্র অষ্টাদশ শতকের অপর একটি জলরঙের সুবৃহৎ ছবি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন—যার বিষয় হল 'শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধনগিরি ধারণ'[৩০], ছবিটি এঁকেছেন কলকাতার চাষা-ধোপা পাড়ার শশী কয়াল। এই ছবিটিতেও দেখা যায় মনুষ্যরূপ নির্মিতিতে রাজস্থানি শৈলীর আদল আর নিসর্গ রচনায় ব্রিটিশ জলরঙের কাজের ছাপ। এ ছাড়া তিনি তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গে' ২৪ পরগনা জেলা থেকে সংগৃহীত বৈষ্ণব গোস্বামী ও আচার্যদের অনেকগুলি আদর্শচিত্র প্রকাশ করেছেন। এই ছবিগুলি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় বৈষ্ণব ধর্মচর্চায় চিত্রকলার স্থান কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সপ্তদশ শতকের অন্তকাল থেকে উনিশ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত সময়ে আঁকা তিনটি চিত্রিত কাগজের পুথি অন্য এক ধারার চিত্রকলার পরিচয় দেয়। পুথি তিনটির মধ্যে যেটি প্রাচীনতম সেটি হল ভাগবতমহাপুরাণের দশম স্কন্ধ। সরসীকুমার সরস্বতীর ব্যক্তিগত সংগ্রহের এই পুথিটির কাল ১৬৮৯-৯০ খ্রিস্টাব্দ[৩১]। পুথিটির ভাষা সংস্কৃত কিন্তু লিপি বাংলা—যেমন দেখা যায় অন্ত-মধ্য যুগের অন্যান্য বহু সংস্কৃত পুথির ক্ষেত্রেও। দেশী, ৩৫ সি. এম. X ১১৫ সি.এম. সাইজের কাগজে লিখিত, ২০৩ পাতার এই পুথিটিতে ছবি পাওয়া গেছে ১৫৮টি। পুথিটির উৎপত্তি কোথায় জানা না গেলেও, ছবিগুলির শৈলী বিচারে মনে হয় এটি মেদিনীপুর জেলায় প্রস্তুত। ছবিগুলির বিষয় ভাগবত বর্ণিত কৃষ্ণলীলা। বর্ণ ও রেখার সুমিত প্রয়োগে ছবিগুলি অঙ্কিত হয়েছে লোকশিল্প পরম্পরার সারল্যে। ছবিগুলিতে মানবরূপ উপস্থাপনায় দেহভাগ সামনাসামনি ও মুখভাগ পাশ থেকে দেখানোর 'মধ্যযুগীয়' চিত্ররীতি অনুসৃত হয়েছে। ছুঁচালো থুতনি ও দীর্ঘ নাক এই রীতির চরিত্রকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। পুথির কাগজের পাতাগুলি তালপাতার পুথির পাতার চেয়ে প্রায় তিনগুণ বড়, অথচ ছবিগুলি আঁকা হয়েছে তালপাতার পুথির ছবির মতোই ছোট করে। আরও লক্ষণীয় হল, সাদা কাগজের ওপর কোনো জমি তৈরি না করেই ছবিগুলি সরাসরি স্বচ্ছ জলরঙে আঁকা। পরম্পরাগত ঘন জলরঙের বদলে স্বচ্ছ জলরঙের এই ব্যবহার থেকে এমনও মনে করা যেতে পারে যে ব্রিটিশ জলরঙের কৌশল জানার আগেই বাঙালি শিল্পীদের কেউ কেউ স্বকীয় পদ্ধতিতে স্বচ্ছ জলরঙে ছবি আঁকতে পারতেন[৩২]।

দ্বিতীয় চিত্রিত পুথিটি হল তুলসীদাস রচিত 'রামচরিতমানস'-এর। এটি রক্ষিত আছে আশুতোষ সংগ্রহশালায় এবং এর একটি পূর্ণাঙ্গ ক্যাটালগও প্রকাশিত হয়েছে[৩৩]। পুথিটি লিখিত হয়েছিল ১৭৭২ থেকে ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দকালে মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের রানী জানকীর পৃষ্ঠপোষকতায়। বিলিতি ফোলিও সাইজের (৩৫ সি.এম X ১১৫ সি.এম.) কাগজে আবধী হিন্দি ভাষার এই রামায়ণটি নাগরি হরফে লিখেছিলেন জনৈক ইচ্ছা মিশ্র। এই পুথিটির ২০৩ পাতায় ছবি আছে ১৫৩টি। কিন্তু ছবিগুলি কার আঁকা তা পুথি থেকে জানা যায় না। অবশ্য প্রায় সব পুথির চিত্রকরের নামই ভারতীয় পরম্পরায় এইভাবে উহ্যই থেকে যায়। এই ছবিগুলিও ভাগবতমহাপুরাণের ছবির মতোই লোকশিল্পের সারল্যে আঁকা। এখানেও মানবরূপ রচনায়



২৬ কৃষ্ণলীলা-চিত্র, 'গীতগোবিন্দ' পুথিচিত্র, স্থান অজ্ঞাত, উনিশ শতকের সূচনাকাল

দেহভাগকে দেখানো হয়েছে পূর্ণায়তভাবে সামনাসামনি, অথচ মুখভাগ পার্শ্বাগতভাবে। অর্থাৎ ২৪
'মধ্যযুগীয়' চিত্ররীতি'র যে দ্বিমাত্রিকতা তা এই রামচরিতমানসের ছবিগুলিতে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। কিন্তু এই সাধাবণ সাদৃশ্য থাকলেও ভাগবতমহাপুরাণ ও রামচরিতমানসের ছবিগুলি একই শৈলীর এ কথা বলা যায় না। কেননা একটু ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে রামচরিতমানসের ছবি অনেক বেশি ঋজু ও দৃঢ়বদ্ধ এবং তার রচনা পদ্ধতি জৈন পাণ্ডুলিপি-চিত্রের অনুগামী। তুলির বদলে কালি-কলমের বহুল ব্যবহার এবং চোখের অন্তবেখাকে প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই আকর্ণ টেনে নিয়ে যাওয়ার রীতি পশ্চিমভারতীয় জৈন মিনিয়েচার চিত্রেব সঙ্গে রামচরিতমানসের ছবির সম্বন্ধ স্থাপন করে। তা ছাড়া পারিপার্শ্বিক প্রমাণ থেকেও মনে হয লিপিকর ইচ্ছা মিশ্রের মতো চিত্রকরও উত্তরপ্রদেশ থেকে মহিষাদল রানী জানকীর উদ্যোগে আনীত হয়েছিলেন। কেননা বাংলা দেশে বসবাস করলেও মহিষাদল রাজবংশের সঙ্গে তাঁদের আদি নিবাস উত্তরপ্রদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। রানী জানকী মহিষাদল পরগনার রামবাগ গ্রামে উত্তরপ্রদেশ-বিহারের বহু-পূজিত রামজিউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর জন্য রচিত ও চিত্রিত তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' পুথির লিপিকর ও চিত্রকর যে উত্তরপ্রদেশ-বিহার থেকেই আসবেন তাতে
সন্দেহ নেই। বাস্তবিক পক্ষে, এই পুথির ছবিগুলিতে চরিত্রচিত্রণে ও ঘটনা বর্ণনায় যে বলিষ্ঠতা ২৫
দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যেও বাঙালি অপেক্ষা হিন্দুস্থানি ভাবই বেশি প্রতিফলিত হয়েছে।

তৃতীয় পুথিটি জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ'-এর। এই পুথিটি চুঁচুড়ার এক প্রাচীন জমিদার পরিবার মণ্ডলদের সংগ্রহে ছিল এবং পুথিটি সম্পর্কে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে স্টেলা ক্রামরিশ একটি সচিত্র নিবন্ধ প্রকাশ করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন[৩৮]। পুথিটিতে ৩৭টি চিত্রিত পাতায়
(সাইজ ৩৫ সি.এম. X ২৮ সি.এম.) আয়তাকার মধ্যাংশে লিখিত শ্লোকের চারদিক ঘিরে ২৬
কখনও চারটি কখনও ছয়টি ছবি অঙ্কিত হয়েছে। পুথিটির সময় উনিশ শতক বলে ক্রামরিশ উল্লেখ করেছেন। তিনি এই 'গীতগোবিন্দ'র চিত্রগুলিতে সমকালীন কাংড়া শৈলীর কোনো এক ধারার চরিত্রলক্ষণ দেখতে পেয়েছেন। তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত না হয়েও এ কথা বলা যায় যে পুথির ছবিগুলি রাজস্থানি চিত্রকলার পরম্পরাতেই আঁকা। কিন্তু মনে হয় মুঘল শাসনসূত্রে বিহার ও বাংলায় ওই চিত্রকলার যে ধারাটি বিশেষভাবে প্রবাহিত হয়েছিল তারই অবদান এই গীতধর্মী সূক্ষ্ম ও সুচারু অণুচিত্রগুলি। মুঘল শাসনকালে, বিশেষত নবাবি আমলে, বাংলা দেশের সঙ্গে রাজস্থানের যোগাযোগ যে বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল তা নানা দিক থেকেই জানা যায়। বাড়ি-ঘর-মন্দির নির্মাণে অনেক ক্ষেত্রেই জয়পুরের কারিগরদের নিয়োগ করাই হয়ে উঠেছিল

রীতি। মুর্শিদাবাদ জেলার বড়নগরে রানী ভবানী স্থাপিত মন্দিরগুলির অন্যতম 'চার বাংলা'। অষ্টাদশ শতকের এই 'চার বাংলা' মন্দির সমষ্টির পুব দিকের মন্দিরের গায়ে পঙ্কে যে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক চিত্রমালা রূপায়িত করা হয়েছে তাতেও রাজস্থানি রূপধারার বিশিষ্ট আদর্শ লক্ষ করা যায়[৩৫]। গীতগোবিন্দের ছবিগুলিতে এই একই আদর্শ অনুসৃত হয়েছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের পাটাচিত্রে রাজস্থানি চিত্রকলার যে আলংকারিক প্রভাব ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তারই ধারায় গীতগোবিন্দ পুথির ছবিগুলি অঙ্কিত বলে মনে করা অসংগত হবে না। তবে ছবির আধার এখানে কাগজ এবং পরিসর আরও ক্ষুদ্র; ফলে শিল্পীর অণুচিত্র রচনার দক্ষতাও এখানে অনেক বেশি স্পষ্ট। ছবিগুলির রূপনির্মিতি প্রধানত রেখানির্ভর এবং ফলে গীতিধর্মী। নারীর দেহভঙ্গিমায় যে লীলায়িত রূপ দেখতে পাওয়া যায় তাই যেন প্রতিফলিত হয়েছে ২৭
বৃক্ষচিত্রেও। পৃথক ক্ষুদ্রাকার বর্গক্ষেত্রে যে পাখিগুলি আঁকা হয়েছে তা বাস্তবতাগুণে ও ভাবসৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ অণুচিত্রের উদাহরণ হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে।

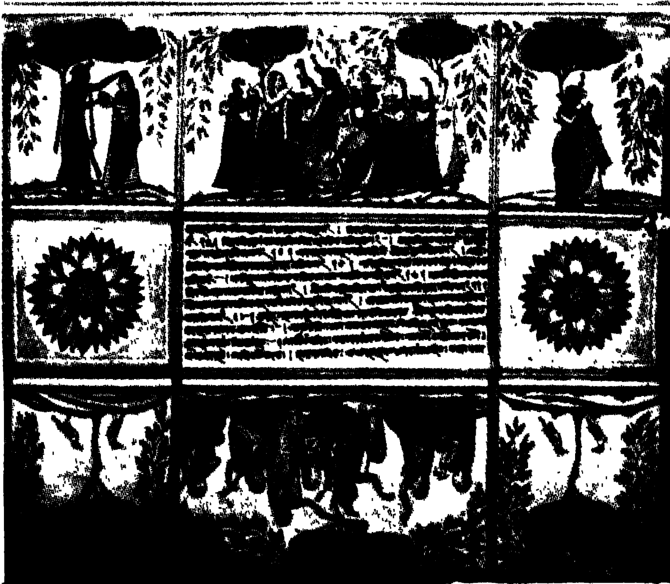
কয়েকটি চিত্রিত পুথি আলোচনা করার পর এখন অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তেল ও ঘন জলরঙের মিশ্রমাধ্যমে আঁকা একটি ছবির উল্লেখ করতে হয়। ছবিটি মহারাজ নন্দকুমারের ১০
কুঞ্জঘাটার রাজবাড়িতে সংরক্ষিত; বিষয়—পুরীধামে ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হয়ে চৈতন্যদেব ভাগবতপাঠ শুনছেন। এই ছবিটি নন্দকুমার তাঁর গুরু প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য রাধামোহন ঠাকুরের কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন। প্রাচীন হলেও ছবিটি আজও নতুনের মতোই উজ্জ্বল। যদিও প্রচলিত আছে যে চৈতন্যদেবের সপার্ষদ এই ছবিটি ওড়িশ্যারাজ প্রতাপরুদ্রদেবের আদেশে অঙ্কিত হয়েছিল এবং চৈতন্যদেবের যথাযথ রূপ এই চিত্রে ধৃত হয়ে আছে, তবু ইয়োরোপীয় চিত্ররীতির পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞানে রচিত বলে ছবিটিকে কোনোমতেই অত প্রাচীন বলে স্বীকার করা যায় না। এই ছবিটি আঙ্গিকগত বিচারে অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় পাদের রচনা বলেই মনে হয়। এতে পাশ্চাত্য চিত্ররীতির বর্ণপ্রয়োগের পূর্ণদক্ষতার সঙ্গে মিলিত হয়েছে বিষয়ানুগ বাঙালি রূপবোধ। চিত্রে কী বসার ভঙ্গিমায়, কী ভাবের প্রশান্তিতে, কী প্রতিটি চরিত্রের রূপরচনায় এমন এক পরিশীলিত রসবোধ কাজ করেছে যা ওই সময়ের অন্য কোনো এ দেশীয় বিষয়নির্ভর ছবিতে দেখা যায় না। বাস্তবতাবোধ ও আদর্শায়িত রূপসৃষ্টির এমন মিলন দৈবাৎই চোখে পড়ে। এই চিত্রটি বাঙালি রূপভাবনা ও ইয়োরোপীয় রচনারীতির সার্থক সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল আদি দৃষ্টান্ত। পারিপার্শ্বিক বিচারে চিত্রটি মুর্শিদাবাদেরই কোনো শিল্পীর রচনা বলে মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যায়, প্রায় সমগোত্রীয় চুঁচুড়া-চন্দননগরের বনেদি পরিবারগুলিতে উনবিংশ শতাব্দী থেকে রক্ষিত ক্যানভাসের ওপর তেলরঙে আঁকা দেবদেবীদের বর্ণাঢ্য ছবিগুলির কথা। এই ছবিগুলিতে পাশ্চাত্য রীতির তেলরঙের মাধ্যম ছাড়াও একজাতীয় বাস্তবধর্মিতার সঙ্গে ভারতীয় রূপাদর্শের এক অভিনব মিশ্রণ ঘটেছে। এই সব ছবিতে শিব, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কালীর উপস্থিতি যথেষ্ট হলেও বিষয় হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছে রাম-সীতা ও রাধা-কৃষ্ণের রূপ। অনেকে চুঁচুড়া-চন্দননগরের এই চিত্রশৈলীকে ৩৮
ডাচ্-বেঙ্গল আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু ডাচ্ চিত্র-পরম্পরার সঙ্গে এই শৈলীর সংযোগ এখনও পর্যন্ত স্পষ্টত প্রমাণিত হয়নি।

উনিশ শতকের প্রথমপাদে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বহড়ুগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান নন্দকুমার বসু প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দরজীর মন্দিরটিতে অনেকগুলি বৈষ্ণবভাবাশ্রিত ভিত্তিচিত্র অঙ্কিত আছে। বৃন্দাবনের গোবিন্দ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে খ্যাত নন্দকুমার কিছুকাল জয়পুর রাজ্যেরও দেওয়ান ছিলেন। মথুরা গমনে অসমর্থ বৃদ্ধা জননীর জন্যই এই মন্দিরটি তিনি নির্মাণ করেন চুনার থেকে পাথর আর জয়পুর থেকে স্থপতি ও শিল্পী এনে।

মন্দিরলিপি থেকেও জানা যায় সন ১২৩২ সালে (১৮২৫ খ্রি) পশ্চিম দেশীয় মন্দিরের আদর্শে
শ্যামসুন্দরজীর মন্দিরটি নন্দকুমার প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের সামনের দালানের পুব ও
পশ্চিমদিকের দেওয়াল জুড়ে এবং মন্দিরের পাঁচটি প্রবেশপথের ওপরের খিলানে অঙ্কিত
ছবিগুলি সরাসরি দেওয়ালের ওপর আঁকা। ছবিগুলি যে ভক্তশিল্পী গঙ্গারাম ভাস্করের আঁকা তা
দেওয়ালের একটি লিপি থেকে সুনিশ্চিতভাবে জানা যায়। 'ভাস্কর' পদবি এবং মধ্যনামের 'রাম'
থেকে মনে হয় গঙ্গারাম ভাস্কর ছিলেন দাঁইহাটের বিখ্যাত ভাস্কর পদবিধারী শিল্পী-পরিবারের
মানুষ। ছবিগুলিতে অষ্টাদশ শতকের বাংলার চিত্রকলায় লক্ষিত রাজস্থানি প্রভাবের ছাপ ২৯
থাকলেও মূলত বাঙালি রূপদৃষ্টিই ফুটে উঠেছে। দরদালানের পশ্চিম ও পুবের দেওয়ালের
বিস্তৃত পটভূমিতে বিন্যস্ত ছবির রূপ-নির্মিতিতে গঙ্গারামের দক্ষতার পরিচয় সুস্পষ্ট। অবয়বের
ডৌল ও সুষমায়, অলংকরণের সূক্ষ্মতায় এই ছবিগুলি অবশ্যই মিনিয়েচারধর্মী। তুলনায়
মন্দিরগৃহে প্রবেশের ওপরকার খিলানের ছবিগুলিতে ভিত্তিচিত্রের চরিত্রই প্রতিভাত হয়েছে। এই
ছবিগুলির মধ্যে ভরত-শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণ-হনুমান পরিবৃত রামসীতা ও চৈতন্য-নিত্যানন্দ-
অদ্বৈত-হরিদাস-শ্রীবাসের বেড়া-সংকীর্তনের দৃশ্যটি বিশিষ্ট। মধ্যবর্তী খিলানের গণেশ সন্নিধানে
সপুরোহিত ও সপুত্র মন্দির প্রতিষ্ঠাতা নন্দরামের ছবিটি ঐতিহাসিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তেমনই, ২৮
কী চিত্রকর্ম কী ধর্মীয় ইতিহাসের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হল পুব-দেওয়ালের
চৈতন্য-ষড়ভুজের ছবিটি।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিককার আর কোনো ভিত্তিচিত্রের নিদর্শন বাংলা দেশে পাওয়া না যাওয়ায় বহড়ুর শ্যামসুন্দরজীর মন্দিরের ছবিগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু দুঃখের বিষয় মোট আটান্নটি ছবির মধ্যে অধিকাংশই এখন নষ্ট হতে চলেছে।



২৭ কৃষ্ণ ও গোপিনীবৃন্দ, 'গীতগোবিন্দ' পুথিচিত্র, স্থান অজ্ঞাত, উনিশ শতকের সূচনাকাল



২৮ ষডভূজ-চৈতন্যদেব, গঙ্গাবাম ভাস্কব অঙ্কিত, বহড়ু, উনিশ শতকেব প্রথমার্ধ



২৯ পূজারিণী, গঙ্গারাম ভাস্কর অঙ্কিত, বহড়ু, উনিশ শতকের প্রথমার্ধ

চৈতন্যদেব ও তাঁর বৈষ্ণবধর্ম-আশ্রিত চিত্রকলা কেবলমাত্র উচ্চবর্গের মানুষের পৃষ্ঠপোষকতাতেই রূপলাভ করেনি। রাজা, জমিদার বা দেওয়ানদের আনুকূল্যে যেমন বড় বড় ছবিতে, পুথিচিত্রে এমন-কি ভিত্তিচিত্রে চৈতন্যদেব ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক দৃশ্যাবলি অঙ্কিত হয়েছে, তেমনই এও দেখা যায় যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের লোকপ্রিয়তার কারণেই বাংলার পটচিত্রের প্রবহমান ধারাতেও ওই বিষয় দুটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। কেবল বৈষ্ণব-ভাবকল্পনার ছবির জন্যই নয়, তার সামগ্রিক সামাজিক ও নান্দনিক অবদানের জন্যও পটচিত্রের ধারাটিকে বাঙালির রূপকলা সাধনার সবথেকে সহজ, সাবলীল ও স্বকীয় প্রকাশ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। পটচিত্রের মতো অন্য কোনো ধারার ছবিই এত সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ও এমন সর্বব্যাপী আবেদনের অধিকারী নয়।

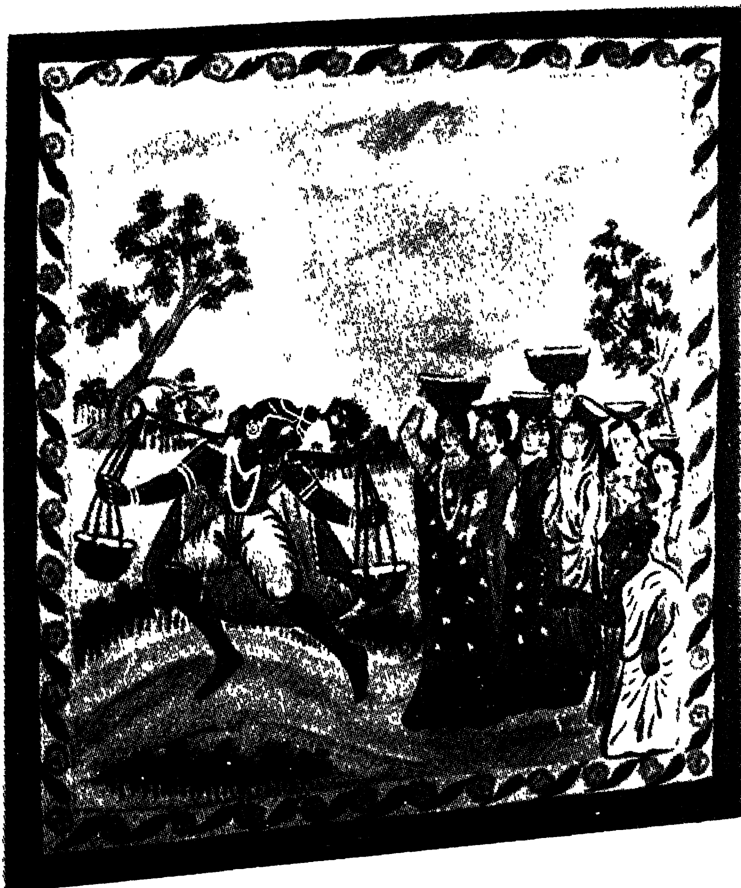
পটচিত্রের প্রাচীনত্ব নির্দেশ করতে সহজেই ভারতীয় ইতিহাসের প্রথম পর্বে পৌঁছে যাওয়া যায়। বুদ্ধদেব খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে স্বয়ং যে 'চরণচিত্র'-এর প্রশংসা করেছিলেন, তা ছিল পরবর্তীকালের পটচিত্রেরই পূর্বসূরি। কারণ বুদ্ধদেবের দেখা চরণচিত্রের ব্যাখ্যায় খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের লেখক অশ্বঘোষ জানিয়েছেন এই চরণচিত্রে একটি ছবির নিচে অপর একটি ছবি অঙ্কিত হয়। বাংলার পটচিত্রেও দেখা যায় ওপর থেকে নিচে একইভাবে কাহিনীর ঘটনাগুলিকে পরপর আঁকা হয়েছে। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক আজীবক ধর্মমতের প্রবর্তক গোসাল ছিলেন জনৈক সংখ বা চিত্রকরের পুত্র। তিনি নিজেও সন্ন্যাস অবলম্বনের আগে পিতার মতোই ছবি দেখিয়ে বেড়িয়েছেন। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে যেমন, পাণিনি ও পতঞ্জলির গ্রন্থেও এমন এক শ্রেণীর চিত্রকরের উল্লেখ করা হয়েছে যারা পথের পাশে গান গাইতে গাইতে ছবি দেখিয়ে পথিকদের মনোরঞ্জন করতেন। বাণ তাঁর 'হর্ষচরিত'-এ বর্ণনা দিয়েছেন যে হর্ষবর্ধন থানেশ্বর নগরীতে ঢোকার মুখে এমন এক 'পট্টিকার'কে দেখেন যিনি তাঁর বাঁ হাতে ঝোলানো পট খুলে খুলে গান গেয়ে গেয়ে 'যমপট' দেখাচ্ছিলেন। বাংলার পটুয়ারা ঠিক এইভাবেই যুগ যুগ ধরে গ্রামে-গঞ্জে 'যমপট' ও নানাবিধ আরও অনেক পট দেখিয়ে আসছেন।

পট কথাটির উৎপত্তি সংস্কৃত 'পট্ট' থেকে যার অর্থ কাপড়। পটচিত্র কাপড়ের ফালির ওপর আঁকা হয়। আগে তা হত কাপড়ের ওপর খড়িমাটির জমি তৈরি করে, পরে জমির বদলে কাগজ সেঁটে। পট হয় দুরকম. ১ আয়তাকার 'চৌকস পট' ও ২ দু-হাত চওড়া ও বারো থেকে পঁচিশ হাত লম্বা 'জড়ানো পট'। কাঠের একটি দণ্ডে গোটানো এই 'জড়ানো পট'ই মনে হয় প্রাচীনকাল থেকে 'যমপট' নামে সাধারণভাবে পরিচিত হয়ে আসছে। পটচিত্রে এই জড়ানো পটের গুরুত্বই বেশি, কেননা পটুয়ারা এইরকম পট দেখিয়ে গান গেয়েই একই সঙ্গে 'লোকশিক্ষক' ও 'লোকরঞ্জক'-এর ভূমিকা পালন করে এসেছেন। পটুয়ারা সেই বিচারে কেবল চিত্রকর ছিলেন না, তাঁরা সেই সঙ্গে ছিলেন কবি-গীতিকার ও সুরকারও। ধর্মবোধ ও সামাজিক নীতিজ্ঞানে তাঁরা যে কতখানি সমৃদ্ধ ছিলেন তার পরিচয় কেবল ছবিতে নয়, তা তাঁদের গানেও রক্ষিত আছে[৩৬]। এক হিসাবে নিম্নবর্গের মানুষের নৈতিক শিক্ষাদানের দায়িত্ব যেন এঁরাই পালন করে গেছেন রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ, ভাগবতপুরাণ, মঙ্গলকাব্য, ও চৈতন্যজীবন অবলম্বনে অঙ্কিত পট

৩১ ১ঃ



৩০ কৃষ্ণলীলা পট, মেদিনীপুর, উনিশ শতকের শেষভাগ



৩১ কৃষ্ণ ও গোপিনীবৃন্দ, মেদিনীপুর, বিশ শতকের প্রথমার্ধ

প্রদর্শন করে। বিশেষত, এই সব পটের সঙ্গেই তাঁরা দেখাতেন 'যমপট', যাতে মৃত্যুর পর যমরাজের বিচারে পাপীর জুটত নরকবাসের যন্ত্রণা আর পুণ্যবানের স্বর্গবাসের সুখ। এইভাবে সকলকে সৎপথে থাকার শিক্ষা দিতেন পটুয়ারা। অথচ, এই পটুয়ারা ছিলেন জাতিবর্ণে বিভক্ত ব্রাহ্মণ্য-হিন্দুসমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়—তাঁদের স্থান ছিল শূদ্রদের মধ্যে। শাস্ত্রেও দেখা যায় চিত্রকর্ম রয়েছে শূদ্রদের পেশার তালিকায়[৩৭]।

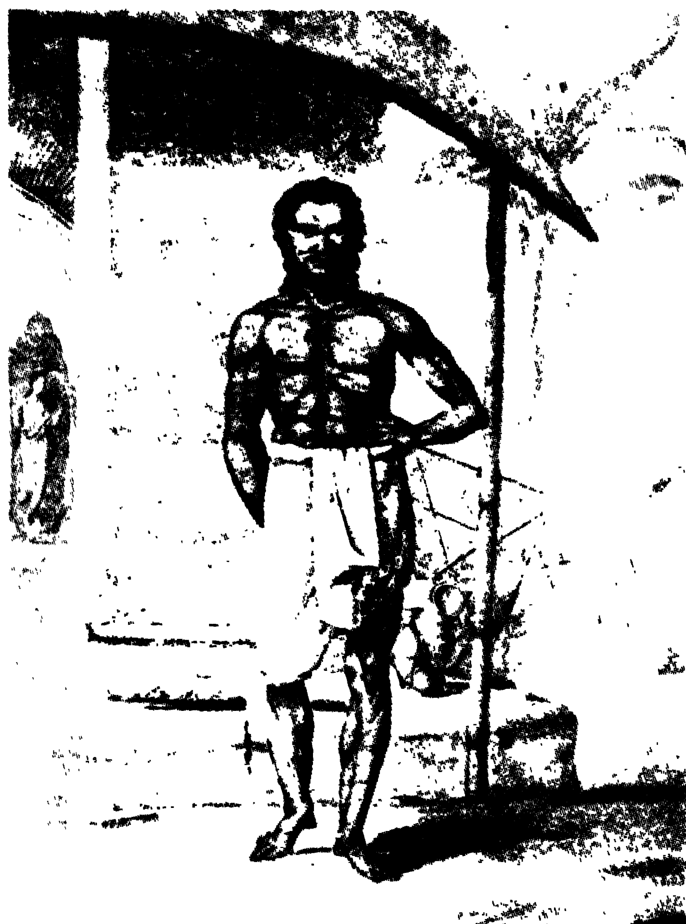
পটচিত্রকাররা বাংলা দেশের নানা জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। উত্তর-পশ্চিম বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় 'পটিদার', বীরভূম ও মেদিনীপুরের কোনো কোনো অঞ্চলে 'চিত্রকর' এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় 'পটুয়া' নামের চল বেশি। বিনয় ঘোষ[৩৮] ভৌগোলিক অবস্থানবিশেষে পটুয়াদের সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য লক্ষ করেছেন। সব পটুয়াই দরিদ্র আর অবহেলিত। কিন্তু তার মধ্যেও দেখা যায় বাঁকুড়া আর পুরুলিয়ার পটুয়ারা তুলনায় মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি ও চব্বিশ পরগনার পটুয়াদের চেয়ে অনেক বেশি পশ্চাদ্‌পদ। এই দুই পর্যায়ের পটুয়াদের মাঝখানে

বীবভূমের পটশিল্পীদের স্থান। বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার পটুয়াদের বাস উপজাতি সমাজে, তাঁদেব মধ্যে তাই পরিশীলিত আচাব-আচবণের বদলে ববং চোখে পড়ে আদিবাসীব সারল্য। মেদিনীপুব, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ ও আংশিকভাবে বীবভূমের পটুয়াদেব বসবাস হিন্দু সমাজেব কাছাকাছি—কাজকারবাবও সেই সমাজেব মানুষের সঙ্গে। ফলে তাঁবা যেমন অনেকটা পরিশীলিত হয়ে উঠেছেন, তেমনই সেই সমাজে তাদেব যে পেশাগত অমর্যাদা সে সম্পর্কে ক্ষোভও অনেক বেশি। এই সামাজিক অবিচাবের কাবণেই সমতল বাংলাব বহু পটুয়া হিন্দু সমাজেব প্রান্তবাসী হয়ে থাকার চেয়ে মুসলমান ধর্ম আশ্রয় কবা শ্রেয় মনে করেছেন। তাতে তাঁরা যে মুসলমান সমাজে সমান মর্যাদা পেয়েছেন তা নয়; তবু হিন্দু সমাজেব অপশাসন থেকে অনেকখানি রেহাই পেয়েছেন। সাধাবণভাবে নিজেদেব মুসলমান বললেও পটুয়াবা মুসলমান পীব ও গাজিব পটের সঙ্গে হিন্দু দেবদেবী, পুরাণ, মহাকাব্য, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদিব পটও দেখিয়ে বেড়ান ঘরে ঘরে। এঁদেব জীবনধাবণ নির্ভব করে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েব মানুষের আনুকূল্যেব ওপব। এবা তাই সব সময়েই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিব পক্ষে। এমন-কি হিন্দু ধর্ম সম্প্রদায়গুলিব মধ্যেও তারা চান পারস্পবিক মিলন—তাই দেখা যায় বীরভূমেব পটুয়া আঁকেন পঞ্চকল্যাণী পটও। এই পটেব বিভিন্ন অংশে যথাক্রমে মনসা, কালী-কাত্যায়নী ও রামপ্রসাদ, নিমাই-সন্ন্যাস মহিষাসুরমর্দিনী এবং বামেব সভা দেখানো হয়েছে সকলেরই মনস্তুষ্টির জন্য— মিলনের জন্য।

অবস্থান ও পরিবেশ অনুযায়ী পটের বিষয় ও শৈলীতেও বিভিন্নতা ঘটেছে। বিষয় বিচারে বাংলাব পটচিত্রকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ কবা যেতে পারে। ১ সাঁওতাল উপজাতিব জন্মকথা ও তাদেব মধ্যে প্রচলিত 'চক্ষুদান পট', ২ 'যমপট'; ৩ 'গাজিপট' এবং ৪ হিন্দু পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলা পট।

প্রথম ভাগের পটের প্রচলন পুরুলিয়া ও বাঁকুড়াব উত্তব-পশ্চিম অঞ্চলে। বিনয় ঘোষেব[৪০] সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, সাঁওতাল-প্রধান এই অঞ্চলের প্রধান শিল্পীরা প্রধানত সাঁওতাল উপকথা অনুযায়ী তাদের জন্মকথা চিত্রিত কবতেন। এই উপকথা 'কো রিয়াক কথা' নামে পরিচিত। তাব কাহিনী ওপর থেকে নিচে পাঁচটি অংশে এইভাবে আঁকা হত: ১ জলমগ্ন পৃথিবীতে আকাশে উড়ছে হংস ও হংসী; কোথাও তাদের বসার মতো এতটুকু জমি নেই, ২ একটা কেঁচো সেই থই থই জলের মধ্যে মাটিব সামান্য একটা ভিত গড়ে তুলছে। ৩ হংস-হংসী সেখানে বসেছে—দুটি ডিম পেড়েছে; ৪ ডিম থেকে জন্ম নিয়েছে দুটি সন্তান—একটি পুরুষ, অপবটি নারী; ৫ এই প্রথম নারী-পুরুষের মিলনে জন্ম নিল প্রথম সাঁওতাল।

সাঁওতালদের মধ্যে আর এক শ্রেণীর পটেব চল দেখতে পাওয়া যায়—তার নাম 'চক্ষুদান ১৫
পট'। এই শ্রেণীর পটিদার বা পটুয়া সাধারণত জাদু-পটুয়া নামে পরিচিত। গুরুসদয় দত্ত[৪১] চক্ষুদান পটের বিষয়ে লিখছেন: যখনই কোনো পুরুষ, নারী অথবা শিশু মাবা যায়, তখনই মৃতের কল্পিত একটি ছবি এঁকে জাদু-পটুয়া হাজিব হন শোকসন্তপ্ত সাঁওতালগৃহে। এই ছবিতে সাদৃশ্য রচনার চেষ্টা না করে কেবল লিঙ্গভেদে ও বয়সভেদে মৃতকে পুরুষ অথবা নারী, বয়স্ক অথবা শিশু হিসাবে চিত্রিত করা হয়। রং ও রেখায় ছবিটি সম্পূর্ণ করলেও পটুয়া চক্ষুতারকার জায়গাটা খালি বাখেন। সেই চক্ষুতারকাবিহীন ছবিটি দেখিয়ে মৃতের স্বজনদের তিনি বলেন যে চক্ষুহীন অবস্থায় মৃতজন পরলোকে ঘুরে ঘুরে কষ্ট পাচ্ছে, তাদের কাছ থেকে ভুজ্জি পেয়ে পটুয়া চিত্রে চক্ষু এঁকে দিলে তবেই সে পরিত্রাণ পাবে। এইভাবে মৃতের স্বজনদের কাছ থেকে টাকাকড়ি ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে ছবিটিতে 'চক্ষুদান' করেন জাদু-পটুয়া। এই ছবিটিব 'ম্যাজিক' চরিত্রের জন্যই পটুয়ার নাম জাদু-পটুয়া। সাঁওতাল ছাড়াও এই চক্ষুদান পটের প্রচলন



৩২ জনৈক পটুয়া বা বাজার চিত্রকব, ফ্রাঁসোয়া বেলথাজার সোলভিন্স, আঃ ১৭৯৫ খ্রি

দেখা গেছে পূর্ববঙ্গের ভেদিয়া উপজাতিব মধ্যে। উপজাতি পটুয়াবা সাওতাল জন্মবৃত্তান্ত ও চক্ষুদান পট ছাড়াও বাঘ, সিংহ প্রভৃতি পশুদেবতাদের ছবিও এঁকেছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর 'যমপট'ও চক্ষুদান পটেব মানসিকতাতে পারলৌকিক বিষয় নিয়ে আঁকা। তবে যমপট বিশেষভাবে সমতল বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই প্রচালিত হয়ে এসেছে। এতে যম বা ধর্মরাজের বিচারে দণ্ডিত ব্যক্তিব নবকযন্ত্রণা আব পুবস্কৃত ব্যক্তিব স্বর্গসুখের দৃশ্যাবলি আঁকা হয়েছে। নরকে প্রেরিত পাপীর নরকযন্ত্রণার দৃশ্যগুলি ভযানক ও বীভৎস। অন্যদিকে, স্বর্গে রমণীদের সঙ্গে কামকেলীতে নিরত পুণ্যবানের দৃশ্যগুলি আকর্ষণীয়। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই রচনাশৈলী অমার্জিত। যমপটের গুরুত্ব অবশ্যই শিল্পকর্ম হিসাবে নয়, নীতি-শিক্ষার বাহক হিসাবে।

তৃতীয় শ্রেণীর পটগুলি হল মুসলমানি পট। পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় চলিত মুসলিম ধর্মযোদ্ধা গাজি ও মহাত্মা পীরদের বীরত্ব ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হয়েছে এই শ্রেণীব পটে। তাই

সাধারণত এগুলি 'গাজিপট' নামে পরিচিত। এই গাজিপটের মধ্যেও লৌকিক ব্যাঘ্র দেবতা, বনবিবি প্রমুখের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। অঙ্কনরীতিতেও গাজিপট বিশেষ দক্ষতার পরিচয় বহন করে না। কালু গাজির পট পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলায় বিশেষ জনপ্রিয়। মৈমনসিংহ জেলাতেও পটচিত্রের যথেষ্ট চল ছিল।

বিষয়-বৈচিত্র্য ও রচনাগুণে অবশ্যই সব থেকে আকর্ষণীয় হল চতুর্থ ভাগের পটগুলি।
সমতল বাংলার বিস্তৃত কৃষিজীবী মানুষের মধ্যে প্রচলিত এই পটচিত্রগুলির আখ্যান
পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-মঙ্গলকাব্য ও চৈতন্যজীবন থেকেই প্রধানত আহৃত হয়েছে।
হিন্দুদের এই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধর্মগ্রন্থগুলির কাহিনী নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলাতেই পট
আঁকা হয়েছে। তবু দেখা যায় মেদিনীপুরে কৃষ্ণলীলা ও মঙ্গলকাব্যের, বর্ধমান ও নদীয়ায়
চৈতন্যলীলার এবং বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় শাক্ত ও বৈষ্ণব বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে
মনসামঙ্গলের জনপ্রিয়তা। রচনাশৈলীর বিচারেও এই সব পটে শিল্পীর দক্ষতা অনেক বেশি
স্পষ্ট। সাঁওতাল বা চক্ষুদান পটগুলির রেখা ও বর্ণ চিত্রিত বস্তুকে আদিম শিল্পরীতির
দ্বিমাত্রিকতায় রূপায়িত করে। চিত্রনির্মিতি ও বিষয় উপস্থাপনাতেও আদিম মানসিকতার পরিচয়
পাওয়া যায়। এই সব ছবিতে কালো, গাঢ় খয়েরি, হলুদ ও কিছু কিছু গাঢ় লালের ব্যবহার দেখা
যায় সাদা জমির ওপর। তুলনায় অবশ্যই গাজিপটের বর্ণ ও রেখা কিছুটা উন্নত। কিন্তু এই সব
পটেও আদিম চিত্ররীতির বাক্‌ধারারই প্রাবল্য। অন্যপক্ষে, চতুর্থ শ্রেণীর
পুরাণ-মহাকাব্য-মঙ্গলকাব্যনির্ভর পটচিত্রে রেখা ও বর্ণের অনেক বেশি সমৃদ্ধ ব্যবহার চোখে
পড়ে। যেমন, রেখার ছন্দোময় প্রয়োগে স্থানে স্থানে ত্রিমাত্রিক গড়নের ভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৩
বর্ণের ব্যবহারও কেবলমাত্র প্রাথমিক লাল, হলুদ, নীল বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে একাধিক
বর্ণের মিশ্রণে বৈচিত্র্যময় ও নয়নাভিরাম রূপ নেয়। কাহিনীর বিভিন্ন কুশীলবের চারিত্রিক
লক্ষণগুলিকেও পটুয়ারা সচেতনভাবে ছবিতে চিহ্নিত করে দর্শকের কাছে তাদের অধিক
গ্রহণযোগ্য করে তোলেন। এমন-কি, ছবিতে ভাবক্রিয়া এনে দর্শকের মনে রসসঞ্চারে তাঁরা
সফল হয়ে ওঠেন। কোনো কোনো চিত্রে কাহিনী বর্ণনায় শিল্পীর দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা পটচিত্রকে
লোকায়ত স্তর থেকে উচ্চাঙ্গ স্তরে পৌঁছে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ মেদিনীপুর জেলার কৃষ্ণলীলা ৩০
পটটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই পটে যমুনা নদীকে ওপর থেকে নিচে তরঙ্গভঙ্গে
লীলায়িত করে এবং তার দু-পাশে আনুভূমিক পাঁচটি প্যানেলে কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার রূপদানের
মধ্য দিয়ে শিল্পী চিত্রনির্মিতির উন্নতবোধের পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষত, গোবুর পালের যমুনা
পার ও বকাসুরের বিস্তৃত পাখার সাহায্যে শিল্পী যেভাবে চিত্রপটের দৃশ্যবস্তুগুলিকে সূত্রবদ্ধ
করেছেন, তা প্রশংসার দাবি রাখে। ঠিক একই পদ্ধতিতে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের ভারহুতের
রিলিফে ওপর থেকে নিচে প্রবহমান গঙ্গার তীরে মহাকপি জাতকের কাহিনীটিকে উৎকীর্ণ করা
হয়েছে। মহাবলীপুরমের 'কীরাতার্জুনীয়'-এর বিস্তৃততর প্রেক্ষাপটেও পল্লব ভাস্কর প্রবহমান
গঙ্গাকে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত নানান প্যানেলের ঐক্যসূত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এইভাবে লক্ষ
করা যায় যে লৌকিক শিল্পীর বোধ ও মার্গরীতির বোধের মধ্যে প্রকৃত অর্থে কোনো গুণগত
পার্থক্য ছিল না, যা ছিল তা মাত্রাগত।

কেবল কৃষ্ণলীলা নয়, রামায়ণ-মহাভারতের চিত্রণেও পটুয়াদের উদ্ভাবনী শক্তির বিস্ময়কর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, সীতাপহরণকারী রাবণের পথরোধে মৃত্যুপণ জটায়ুর দৃশ্যটিকে স্মরণ করা যেতে পারে। মনসামঙ্গলের কাহিনীর দৃশ্যগুলিও—বিশেষত চাঁদ সওদাগরের কমলেকামিনী দর্শন ও লখীন্দর-বেহুলার ঘটনাবলি মর্মস্পর্শ করে। চৈতন্যলীলার অন্তর্গত সংকীর্তনের দৃশ্যে বৈষ্ণব প্রেমভক্তির ভাব স্পষ্ট রূপ নেয়।

রচনাশৈলীর দিক থেকেও বিভিন্ন অঞ্চলের পটের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। পুরুলিয়ার পটে, যেমন বলা হয়েছে, এক ধরনের গাঢ় খয়েরি রঙের প্রাধান্য ও বিষয়-বিন্যাসে ঘন বুনট বিশেষ করে চোখে পড়ে। মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার পটেও একই ধরনের ঘন বিষয়-বিন্যাস ; কিন্তু এই দুই জেলায় পটুয়ারা অলংকরণ ও সূক্ষ্মকর্মে অনেক বেশি উন্নত এবং ওড়িশ্যার চিত্রকরদের প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত। বীরভূম, বাঁকুড়া ও বর্ধমানের জমি সাধারণত গাঢ় রক্তবর্ণের ; কিন্তু হুগলির পটের জমি গাঢ় খয়েরি। পুরুলিয়া ও হুগলির পটের রেখা মণ্ডনগুণহীন দ্বিমাত্রিক। বীরভূম ও বাঁকুড়া পাশাপাশি হলেও এই দুই জেলার পটে শৈলীগত পার্থক্য আছে। বাঁকুড়ায় পরিহিত বস্ত্রের ভাঁজগুলি আঁকা হয়েছে পরপর সমান রেখার টানে। বীরভূমের পটের রেখা তুলনায় অনেক বেশি বর্তনাগুণযুক্ত। বাঁকুড়ায় মুখ আঁকা হয়েছে সাধারণত পাশ থেকে ; কিন্তু বীরভূমে স্যাচী বা ত্রিচতুরাংশে। জোড়া ভ্রূ বীরভূমের ছবির আর এক চরিত্র লক্ষণ। সব মিলিয়ে বীরভূমের পট শৈলীগত উৎকর্ষে বিশিষ্ট।

বীরভূমের পটচিত্রকলার করণকৌশল প্রসঙ্গে দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়[৪২] লিখছেন : "পটের বিষয়বস্তু অনুযায়ী মূর্তির (ফিগার) কল্পনা করে প্রথমে হাল্কা লাল রং দিয়ে মূর্তির আউটলাইন এঁকে নিতে হয়। এই লাল রঙের সাহায্যেই ফিগারের হাত, আঙুল, চোখ ও মুখ বের করে আনেন পটুয়া। আউটলাইনের ভেতরে ফিগারের অন্যান্য অংশে এবার প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ রং ভরাটের পালা। এরপর কালো রং দিয়ে চুল ও চক্ষুদান। সবশেষে সাদা বা হবিতাল রং দিয়ে ফোঁটার কাজ সারা"। ব্যবহৃত রংগুলি প্রায় সবই বনজ অথবা খনিজ। যেমন, সিঁদুরের লাল, বাজারের ময়ূরকণ্ঠী গুঁড়ো নীল, হরিতালের হলুদ, খড়িমাটির সঙ্গে অল্প নীল মিশিয়ে সাদা, ভুসোকালি ইত্যাদি। গৌরবর্ণের বেলায় অবশ্য পিউরির সাহায্যে রং তৈরির কথাও জানা যায়। তবে সব সময় সর্বত্র যে একই সূত্র থেকে রংগুলি তৈরি হয়েছে এমন নয়। যেমন, এখনকার কালের মেদিনীপুর জেলার নয়াগ্রামের শ্যামসুন্দর চিত্রকর[৪৩] লাল তৈরি করেন পাকা তেলাকুচা ফল থেকে, পাকা টেপিফল আর ঘুষুংমাটি মিশিয়ে করেন নীল, কাঁচা হলুদ আর ঘুষুংমাটি মিশিয়ে হলুদ, উনুনের ছাই আর ঘুষুংমাটি মিশিয়ে ছাই-ছাই রং, চাল কালো করে ভেজে কালো ইত্যাদি। মাধ্যম হিসাবে পোটোরা সাধারণত গঁদের আঠা ব্যবহার করেন। শ্যামসুন্দর বেলের আঠার কথা বলেছেন। তা ছাড়া বাবলা, নিম, খয়ের ইত্যাদি গাছের থেকেও আঠা তৈরি হয়। তেঁতুল বিচি ভিজিয়ে বেটে তার থেকে তৈরি আঠা, এমন কি সিরিসের আঠারও প্রয়োগ দেখা যায়। তবে নিমের আঠা ভালো, ছবিতে সহজে পোকা লাগে না। একাধিক রং মিশিয়ে কীভাবে নানা মিশ্রবর্ণ তৈরি করতে হয় তার শিক্ষা পটুয়ারা ছড়া মুখস্থ করেই শিখে নেন। সাধারণত তাঁদের তুলি তৈরি হয় বাঁশকাঠির সঙ্গে ছাগলের লোম সুতো দিয়ে বেঁধে নিয়ে। কাপড়ের লম্বা ফালির ওপর সাধারণ কাগজ আঠা দিয়ে সেঁটে পটুয়া ছবির ভূমি তৈরি করে নেন।

পটচিত্রের ঐতিহ্য যতই প্রাচীন হোক, সবথেকে পুরনো যে পট এখনও রক্ষিত আছে তার বয়স একশ বছরের বেশি নয়। ক্ষণস্থায়ী আধারে তৈরি বলে, এবং পটচিত্রের বিশেষ মর্যাদা না থাকায়, প্রাচীনতর পটগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। বাংলার পটের নিদর্শন তবু ভাগ্যক্রমে নানান ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহে এখনও যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রাহকদের মধ্যে অবশ্যই বিশিষ্ট হল আশুতোষ সংগ্রহশালা ও গুরুসদয় মিউজিয়ম। প্রথম যাঁরা পট সংগ্রহে ব্রতী হন তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় হলেন দীনেশচন্দ্র সেন ও গুরুসদয় দত্ত। দীনেশচন্দ্রের সংগ্রহের অনেকটাই রয়েছে আশুতোষ সংগ্রহশালায় এবং গুরুসদয়ের সবগুলিই গুরুসদয় মিউজিয়মে। গুরুসদয় যে কেবল একজন পটচিত্রের উদ্যমী সংগ্রাহকই ছিলেন, তা নয়। তিনিই প্রথম তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে একটি ইংরেজি নিবন্ধে বাংলার পটচিত্রশৈলীর চিত্রগুণ সম্পর্কে

শিক্ষিত সমাজকে অবহিত করেছিলেন। একজন পরিশীলিত চিত্ররসিক হিসাবে তিনি লিখলেন : এই পটচিত্রকলা আগাগোড়া নির্ভর করেছে ভারতীয় শিল্পের দুই প্রধান বর্ণমালা—শুদ্ধরেখার শক্তিশালী প্রয়োগ ও উজ্জ্বল বর্ণের সমতল বা দ্বিমাত্রিক ব্যবহারের ওপর। অবিশ্বাস্য মনে হলেও এই শৈলীর প্রাচীন ও দক্ষ শিল্পীরা দেখা যায় আদিম শিল্পের শ্রেষ্ঠ গুণগুলির সঙ্গে উন্নত ধারার শিল্পরীতির গুণগুলিকে মেলাতে সক্ষম হয়েছেন। কাহিনী বর্ণনার সুস্পষ্টতায় ও আদিম শিল্পের প্রাণশক্তির পরিশীলিত প্রকাশমানতায় এই শৈলী ভাস্বর। ধ্রুপদী রীতির সৌন্দর্য ও লাবণ্য, ছন্দ ও চমৎকারিত্ব এবং তার বাস্তবধর্মিতায় অভিষিক্ত হলেও সেই রীতির অতিপরিমার্জন ও অতিব্যবহারজাত দুর্বলতা থেকে মুক্ত এই চিত্ররীতি। পটে অজন্তা, গ্রিস ও ইটালীয় শিল্পের অনুরূপ সুন্দর মানবরূপ চিত্রিত হয়েছে; কিন্তু তা হয়েছে বিশেষ এক পুরুষোচিত দৃঢ়তায়, নারী রূপের কোমলতা বা ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় নয়। বাস্তবতাকে পটে গ্রহণ করা হয়েছে পশ্চিমের এক্সপ্রেশনিস্টদের ধারায়, ফোটোগ্রাফির মতো অনুকরণধর্মিতায় নয়। পটের শক্তিশালী, ছন্দোময় ও প্রকাশক্ষম রেখাকর্ম এবং সংগতিপূর্ণ বর্ণবিন্যাস প্রাচীন ও আধুনিক কোনো চিত্রশৈলীর চেয়ে গুণগত বিচারে হীন নয়। ভাবনা ও করণকৌশলেব বিচারেও দেখা যাবে পটচিত্রে সেইসব লক্ষণই সুস্পষ্ট যা ছিল পশ্চিমি ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদেব লক্ষ্য, ১৩
অর্থাৎ—যা কিছু বর্জন করা সম্ভব, তা বাদ দিয়ে মূলগত রূপকে ফুটিয়ে তোলা[৪৪]।

গুরুসদয় ছিলেন পটচিত্রের প্রথম একনিষ্ঠ প্রচারক। তাই তাঁর লেখায় পটচিত্রশৈলী সম্ভবত কিছু অতিরঞ্জিত গুণে ভূষিত হয়েছে—যেমন হয়ে থাকে পথিকৃৎদের বিচারে। কিন্তু তিনি যে সাধারণভাবে এই শৈলীব মূল চরিত্রলক্ষণগুলিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কথা বিস্মৃত হওয়া ঠিক হবে না যে পটশিল্পীরা কেবল নান্দনিক গুণার্জনের জন্যে ছবি আঁকেননি, তাঁদেব ছবি আঁকার প্রধান প্রেরণা ছিল অন্যত্র।

পটচিত্র রচনার উদ্দেশ্য কী? এই প্রশ্নের উত্তরে নয়াগ্রামের শ্যামসুন্দর চিত্রকর তাঁর পরম্পরাগত শিক্ষায় জানান—জ্ঞান, শিক্ষা, আনন্দ ও পুণ্য। এই আদর্শ বাংলার পটুয়াদের যুগে যুগে অনুপ্রাণিত করেছে এবং নানা সামাজিক অবিচার সহ্য করেও তাঁরা সেই অনুপ্রেরণায় গ্রাম-বাংলার জনসমষ্টির জীবনকে আত্মিকভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন। প্রধানত পারলৌকিক ও ধর্মীয় বিষয় নিয়ে পটরচনা করলেও পটুয়ারা বিষয় নির্বাচনে রক্ষণশীল ছিলেন না। বরং দেখা যায় যে গ্রাম থেকে শহরের পথে এসে তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় নিয়েও ছবি আঁকছেন ও গান বাঁধছেন। এইভাবেই নগরায়ণের সঙ্গে সংগতি রেখে মেদিনীপুরের পটে বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে; যেমন স্বাধীনতা-পট, সাহেব-পট, স্টিমার-পট, সিনেমা-পট, পরিবার পরিকল্পনা-পট ইত্যাদি। এক সময় মেদিনীপুরের চিত্রকরের তুলিতে নথিভুক্ত হয়েছে উপজাতি বিদ্রোহের বীর শহিদের ফাঁসিকাঠে ওঠার কাহিনীও। অন্যদিকে অবশ্য বীরভূমের পটুয়ারা পৌরাণিক পটের মধ্যেই ধরে রেখেছেন নিজেদের। তুলনায় বরং আদিবাসী পটুয়াদের বিষয় তাঁদের উপকথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; তাঁদের পটে, বিশেষ করে মুণ্ডাদের মধ্যে প্রচলিত পটে, কৃষ্ণ ও চৈতন্যলীলা রূপ লাভ করেছে। সব মিলিয়ে এ কথা মানতেই হয় যে পবম্পরাগত বাংলার গ্রাম-জনপদের সাধারণ মানুষের বিশ্বাসেব জগতের সবথেকে নির্ভরযোগ্য দলিল হল নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত এই সব পটগুলি। এই পটচিত্রের ধাবা আজও পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে ক্ষীণভাবে বয়ে চলেছে; কিন্তু কঠিন হলেও এই সত্য স্বীকার কবা ছাড়া উপায় নেই যে আজকের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিবেশে এই লৌকিক শিল্পধারাটিকে পুনরুজ্জীবিত কবা আর সম্ভবপর নয়।



৩৩ কালী, কলকাতা, উনিশ শতকের মধ্যভাগ

১৯ কালীঘাটের পটশৈলী

গ্রামবাংলার পটচিত্রের পরম্পরা ধরে এসে পড়তে হয় কালীঘাটের পটে। এখন বাঙালির নিজস্ব এক শিল্প-অভিব্যক্তি হিসাবে দেশে ও বিদেশে বিশেষ গৌরব অর্জন করেছে কালীঘাটের পট। রেখার নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমানতার সাহায্যে রূপের গড়নকে ফুটিয়ে তুলে, স্বচ্ছ বর্ণের সুমিত বিন্যাসে সেই গড়নকে পরিপূর্ণতা দিয়ে, রূপ-নির্মিতিতে কালীঘাটের পটুয়া এমন এক নতুন চিত্রাদর্শ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন যা সাধারণভাবে বলা চলে 'আধুনিক' কলাশিল্পের লক্ষণাক্রান্ত। বিশেষ করে চিত্রপটকে বহু কিছু দিয়ে ভাবাক্রান্ত না করে, কোনো একটি নির্ধারিত বস্তু বা ঘটনাকে বলিষ্ঠভাবে 'চৌকস' পটে ফুটিয়ে তুলে তাঁরা এই আধুনিক মননেরই পরিচয় দিয়েছেন। গ্রামের পটচিত্রের পাশাপাশি ধবলে কালীঘাটের পটের নাগরিক চরিত্র সহজেই চোখে পড়বে।

আজ কালীঘাটের পট যতই সমাদৃত হোক না কেন, এ কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না যে তার সৃজনশীলতার কালে এই বিশিষ্ট পটশৈলী শিক্ষিত বাঙালির কাছে ছিল নিকৃষ্ট চিত্রকর্মের উদাহরণ। তখনকার ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির মনোভাব কী ছিল তা জানা যায় প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক ও শিল্প-গবেষক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত একটি নিবন্ধ থেকে[৪৫]। এই নিবন্ধে তিনি তখনকার প্রচলিত দুই শ্রেণীর চিত্রকলার কথা বলেছেন—তার একটি উন্নতমানের, অপরটি নিম্নমানের। তাঁর মতে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার পরম্পরায় আঁকা উন্নতমানের চিত্রকলার ধারা তখনও জয়পুরে সজীব ছিল ; আর নিম্নমানের চিত্র হল পটুয়াদের আঁকা ছবি—কালীঘাট ও তারকেশ্বরের তীর্থক্ষেত্রে ও হাটে হাটে যা এক পয়সা থেকে এক আনা মূল্যে হাজার হাজার বিক্রি হত। আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে, কালীঘাটের পটের গৌরব অস্তমিত হয়নি এমন সময়কার গ্রামবাংলার হাটে-বাজারে ছবির চাহিদা কেমন ছিল তার এক সুন্দর বর্ণনা লিখে গেছেন দীনেন্দ্রকুমার রায় তাঁর 'পল্লীচিত্র' বইটির 'দুর্গোৎসব' অধ্যায়ে। তিনি লিখছেন : "বাজারে যে তিন চারিখানি মনোহারী দোকান আছে, পূজা উপলক্ষে সেই সকল দোকানে নানারকম জিনিসের আমদানী হইয়াছে। দেশী বিলাতী ছবিতে দোকানের দেয়ালগুলি ঢাকা ; কিন্তু ছবিগুলি সাজাইয়া টাঙ্গাইবার শৃঙ্খলার সীমা নাই! এক জায়গায় কালীঘাটের এক পয়সা দামের কালো রঙের পট ; তাহার পাশেই হনুমান দুই হস্তে বক্ষঃবিদারণ করিয়া দেখাইতেছে,—সেখানেও রামসীতার যুগলমূর্তি অঙ্কিত আছে। তাহার পরেই একখানি আর্ট স্টুডিওর ছবি, শিবের কপাল হইতে লাল রঙ্গের ছাঁটা বাহির হইয়া মদনভস্ম করিতেছে! তৃতীয় ছবি একখানা জার্মান 'ওলিওগ্রাফ', যুবতী অভিমান করিয়া একদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছে, যুবকটিও প্রতিশোধপ্রদান-বাসনায় মান করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছে। বিলাতী মানিনীর মানের মূল্য-পরিমাপক এই চিত্রের পাশেই একখানি রঙ্গদার ছবি,—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চতুর্থ পক্ষের পত্নীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দান করিতেছে, আর ব্রাহ্মণী, মা দুর্গা কর্তৃক অসুরের টিকি ধরিবার ভঙ্গীতে এক হাতে ব্রাহ্মণের সুদীর্ঘ টিকি আকর্ষণ করিয়া অন্য হাতে তাহার পৃষ্ঠে দিব্যাস্ত্র শতমুখী চালাইতেছে!" শেষের ছবিটিও যে কালীঘাটের পটুয়ার আঁকা, তাতে সন্দেহ নেই।

কালীঘাটের পটচিত্র সম্পর্কে ত্রৈলোক্যনাথের মনোভাব যাই-ই হোক না কেন, তাঁর ও দীনেন্দ্রকুমার রায়ের সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে সে সময় শহর ও গ্রামের হাটে-বাজারে কালীঘাটের পটের চাহিদা ছিল যথেষ্ট। আর এই চাহিদা প্রধানত ছিল শহর ও গ্রামের সাধারণ গরিব মানুষের মধ্যেই। পটুয়ারাও তাঁদের পট আঁকতেন এই সব ক্রেতাদের প্রয়োজন ও রুচির কথা মনে রেখেই। কালীঘাটের মন্দির ঘিরেই এই পটশৈলীর বিকাশ। তাই স্বভাবতই পটের প্রধান বিষয় হিসাবে দেখা দিয়েছে কালী ও অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিকৃতি। আঙ্গিকের বিচারে আশুতোষ সংগ্রহশালার প্রাচীনতম যে কালীঘাটের পটটি দেখতে পাওয়া যায় সেটিও একটি কালীপট—আঁকা হয়েছে ঘন জলরঙে। এর থেকে মনে করা যেতে পারে যে প্রথম প্রথম কালীর পট এবং পাশাপাশি অন্যান্য দেবদেবীর পট আঁকার মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন কালীঘাটের পটুয়ারা। তারপর দিন যেমন বদলেছে, সেই মতো সমকালীন জীবনের চিত্রও বিষয় হয়ে ধরা দিয়েছে তাঁদের পটে। এইভাবে ধর্মনির্ভর ও ধর্মনিরপেক্ষ উভয় ধারার বিষয়কে অবলম্বন করেই কালীঘাটের পট অর্জন করেছে তার জনপ্রিয়তা।

কালীঘাটের পটচিত্রের সূচনা ঠিক কোন্ সময় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণায় উপনীত হওয়ার অসুবিধার কথা মুকুল দে তাঁর একটি নিবন্ধে স্বীকার করেছেন ১৯৩২ অব্দে[৪৬]। তবে সকলেই সাধারণভাবে মনে করেন যে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এই পটশৈলীর উদ্ভব ঘটেছিল আর তার বিকাশ অব্যাহত ছিল ওই শতাব্দের শেষাবধি। বিশ শতকের প্রথমদিকেও এই চিত্রধারা প্রবহমান ছিল ; এবং তার অবলুপ্তি ১৯২০ থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ কালের মধ্যে[৪৭]। এই শৈলী কাদের হাতে কীভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্য আহরণ করেছেন এ কালের গবেষকেরা[৪৮]। তাঁরা অনুসন্ধান করে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে রুজি-রোজগারের আশাতেই গ্রামবাংলার পরম্পরাগত শিল্পীরা এসে হাজির হয়েছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্যে সরগরম কলকাতায়—বিশেষ করে কালীঘাটের আশপাশে। এই সব শিল্পীরা যে প্রধানত দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা থেকেই এসেছিলেন তা জানা গেছে সরেজমিন তদন্তের সাহায্যে। বিশেষ করে 'পটুয়া' ও 'চিত্রকর' এই দুই পদবি থেকে অনুমান করা যায় যে কালীঘাটের পটুয়াদের আদি নিবাস ছিল প্রধানত দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনা ও মেদিনীপুরে। তবে কেবল পরম্পরাগত পটুয়ারাই নয়, জীবিকার সন্ধানে অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত শিল্পীরাও যে কালীঘাটে জড়ো হয়েছিলেন সে তথ্যও সংগৃহীত হয়েছে গবেষকদের অনুসন্ধানের সূত্রে। এইভাবেই, যেমন নাগরিক পরিবেশে আশা করা যায়, গ্রামের সমাজ-বন্ধনের বাইরে এসে নানা সম্প্রদায়ের শিল্পীর পারস্পরিক মেলামেশার মাধ্যমেই জন্ম নেয় কালীঘাটের শৈলী। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারীদের নির্দেশে ব্রিটিশ জলরঙের আঙ্গিকে কাজ করেছেন এমন শিল্পীও যে হাজির হয়েছিলেন কালীঘাটের পোটোপাড়ায় তা বোঝা যায় পরম্পরাগত ঘন জলরঙ ছেড়ে ব্রিটিশ স্বচ্ছ জলরঙের ছবি আঁকায় কালীঘাটের পটুয়াদের দক্ষ হয়ে ওঠার সাক্ষ্যে। এমনিভাবেই দেশজ রঙের বদলে বিদেশে তৈরি রাসায়নিক রং, দেশি কাগজের বদলে বিলেতি কাগজ মাধ্যম হয়ে উঠেছিল কালীঘাটের পটুয়াদের। পটের যে পরম্পরাগত চরিত্র তার থেকেও কালীঘাটের পট আলাদা হয়ে পড়েছিল মাধ্যমগত পার্থক্যের কারণে। বিশেষ করে সাদা ঝকঝকে কাগজে উজ্জ্বল স্বচ্ছ রঙের প্রয়োগে যে দ্যুতি দেখা দিল তা পুরনো রীতির পটে অভাবনীয়।

ব্রিটিশ জলরঙের এই ব্যবহারের কারণে উইলিয়াম আর্চার কালীঘাটের পটশৈলীতে ব্রিটিশ চিত্ররীতির প্রভূত প্রভাব লক্ষ করেছেন[৪৯]। এমন-কি কালীঘাটের পটের বস্তুরূপায়ণে যে বর্তুলতা বা মণ্ডনগুণ সৃষ্টি হয়েছে শেডিং বা ছায়াপাতের সাহায্যে, তাতেও তিনি পটুয়াদের পাশ্চাত্যরীতির চিত্রকলার আদর্শকে অনুসরণ করতে দেখেছেন। কিন্তু আর্চারের এই সিদ্ধান্ত দুটি

কারণে স্বীকার করা যায় না। প্রথমত, শেডিং বা বর্তনা—বিশেষ করে বহিঃরেখার
অনুসরণে—অজন্তার কাল থেকেই ভারতীয় চিত্রকলার এক বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ। এই শেডিং বা
ছায়াপাত ইয়োরোপীয় রীতি অনুযায়ী কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে বিচ্ছুরিত আলোর
অনুসরণে হয় না। এই শেডিং বা বর্তনা বাইরের আলোর পরিবর্তে বরং রূপায়িত অবয়বের
শর্তেই নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয়ত, আঠারো-উনিশ শতকের ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের
চিত্রকলাতেও—যেমন কেরলের ভিত্তিচিত্রে, রাজস্থানের নাথদ্বারের ঝোলানো পটচিত্রে,
এমন-কি পঞ্জাবের অমৃতসরের ভিত্তিচিত্রেও—একই ধরনেব বর্তনার সাহায্যে গড়নে বর্তুলতা
আনতে দেখা যায়। তাই ব্রিটিশ স্বচ্ছ জলরঙের প্রভাবের কথা মেনে নিলেও কালীঘাটের পট
যে ভারতীয় চিত্রকলার পরম্পরাতেই বিকশিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও কালীঘাটের পটুয়াদের প্রধান উপজীব্য ছিল ধর্ম। কেবল কালীর
পট নয়, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, গণেশ-জননী, শিব, শিব-পার্বতী, গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী,
যশোদা-কৃষ্ণ, রাধা-কৃষ্ণ, কৃষ্ণের অন্যান্য নানান লীলা, রাম-সীতা, হনুমান, চৈতন্য-ষড়ভুজ ও ১৬
আরও নানান দেবদেবীর পট অঙ্কিত হয়েছে ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে। সেই সঙ্গে, অবশ্যই
নাগরিক জীবনের পরিবেশে, নানা সামাজিক চিত্রও ধরা পড়েছে পটুয়াদের রঙে ও তুলিতে।

উনিশ শতকের কলকাতার জীবন বইত দুই ধারায়। একদিকে ছিল সাহেব পাড়া, অন্যদিকে
দেশী পাড়া। এই দুই পাড়ার অধিবাসীদের বিলাস-ব্যসনই বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে কালীঘাটের
পটে। সাহেব-বিবির প্রতিকৃতি, হাতিতে চেপে সাহেবের বাঘশিকার, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি ছবিতে
রয়েছে সাহেব পাড়ার আলেখ্য। অন্যদিকে, তখনকার উচ্চবিত্ত বাঙালির বাবু-কালচারের যে
চিত্র টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'
ইত্যাদি গ্রন্থে পাওয়া যায় তারই চাক্ষুষ নিদর্শন রেখে গেছেন কালীঘাটের পটুয়ারা তাঁদের পটে।
বিশেষত, তখনকার দিনের বারবিলাসিতার প্রমাণ হিসাবে অঙ্কিত হয়েছে সুন্দরী লাস্যময়ী
বারবণিতাদের ছবি—যার মধ্যে সবথেকে সুপরিচিত হল গোলাপসুন্দরীর রূপ। এই সব ১৪
বারবণিতাদের কাছে বাবুরা কেমন ভেড়া বনে যেতেন তাও আঁকা হয়েছে প্রতীকী তাৎপর্যে।
তারকেশ্বরের মহান্ত, এলোকেশী আর নবীনের যে কাহিনী সেকালে সারা দেশে তুমুল আলোড়ন
সৃষ্টি করেছিল, তারও বিস্তৃত রূপায়ণ ঘটেছে কালীঘাটের পটে।

কালীঘাট শৈলীর বৈশিষ্ট্য তার আঙ্গিকে নয়, রূপাদর্শে। তাই দেখা যায় দেবদেবী কিংবা
সাধারণ মানব-মানবী সকলেরই রূপ নির্মিত হয়েছে বিশেষ এক আদর্শায়িত সৌন্দর্যবোধে।
পটল-চেরা চোখ, ধনুকাকৃতি ভ্রু, বাবরি করা চুল, নধর বপু—এইগুলি হল আদর্শ সুন্দর পুরুষের
লক্ষণ। নারীর ক্ষেত্রে এর সঙ্গে যুক্ত হবে সুপুষ্ট দেহসৌষ্ঠব ও লীলায়িত ভঙ্গিমা। এই রূপাদর্শ
অবশ্যই ভারতীয় পরম্পরা থেকে গৃহীত, কিন্তু সেই সঙ্গে এই আদর্শ যে লৌকিক স্তরেও
প্রসারিত হয়েছিল তা জানা যায় দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনার মাটির পুতুলের সাক্ষ্যে—বিশেষকরে
মাটির 'বাবু পুতুল' আর কালীঘাটের পটুয়ার আঁকা 'বাবু' যে একই আদলে সৃষ্ট তা সহজেই
চিনতে পারা যায়। আর দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনার কুমোর-পোটোদের অনেকেই যে কালীঘাটে
এসে হাজির হয়েছিলেন রুজি-রোজগারের আশা নিয়ে, তা এখন প্রায় সকলেরই জানা।
কালীঘাট শৈলীর রূপাদর্শ অন্তত সাধারণ বাঙালির জীবনে যে সহজ স্বীকৃতি লাভ করেছিল
তাতে সন্দেহ নেই। কেননা এই আদর্শেই লিথো আর কাঠখোদাই পদ্ধতিতে ছাপা ছবিতে রূপ ১৬
পেয়েছেন বাঙালি রমণী। এমন-কি, তেলরঙে আঁকা উনিশ শতকের ছবিতেও কালীঘাটের সৃষ্ট ১৭
নারীরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে।

রূপ-নির্মিতির আদর্শে যেমন, পটরচনার উদ্দেশ্যের বিচারেও কালীঘাটের পটুয়া তাঁর ধর্ম

থেকে দূরে সরে যাননি। গ্রামবাংলার পটুয়াদের হাতে যেমন, কালীঘাটের পটুয়ার হাতেও ছবি
আঁকা হয়েছে সেই জ্ঞান, শিক্ষা, আনন্দ আর পুণ্যকে উদ্দেশ্য করে। দেবদেবীর পটে অর্জিত
হয়েছে পুণ্য, বাবু-কালচারের ব্যঙ্গচিত্রে দেওয়া হয়েছে নীতিশিক্ষা। রামায়ণ ও চৈতন্য-ষড়ভুজ
পটে ঘটেছে জ্ঞান ও পুণ্যের মিলন। কিন্তু কালীঘাটের শিল্পী গ্রামবাংলার পোটোদের থেকে
স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছেন আনন্দ বিতরণের ক্ষেত্রে। তিনি যখন আঁকেন জোড়াপায়রা, মুখে-মাছ ৩৫
বেড়াল, মুঠোয় ধরা গলদা চিংড়ি, কিংবা সাপের মাছগেলা, তখন তাঁর মনে না পুণ্যবোধ না
নীতিজ্ঞান কাজ করে। সেখানে তিনি দর্শককে দিতে চান বিশুদ্ধ এক নয়নাভিরাম
আনন্দ—বিষয়কে রূপ দেন ছন্দোময় রেখার ডৌলে। কেবল গ্রামবাংলার 'লতাই' পট ছেড়ে



৩৪ বারবিলাসিনী, কলকাতা, আঃ ১৮৯০ খ্রি

শহরের 'চৌকস' পটের আধারে ছবি আঁকার কারণেই নয়, নতুন নাগরিক পরিবেশে, ব্রিটিশ চিত্রকলার সংস্পর্শে এসে, নতুনতর রসবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে কালীঘাটের পটুয়া গুণগতভাবেই বদলে যান অনেকটা—হয়ে ওঠেন আধুনিক অর্থে 'শিল্পী'। এমন-কি, তাঁদের অনেকেই—যেমন মধ্যপর্বের নীলমণি দাস, বলরাম দাস ও গোপাল দাস এবং শেষপর্বের নিবারণচন্দ্র ঘোষ ও কালীচরণ ঘোষ—জীবৎকালেই খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন আধুনিক শর্তে। বাংলার লোকশিল্পের পরম্পরা তাঁদের মধ্য দিয়ে নাগরিক মনকে জয় করে নেয় অন্তত কিছুকালের জন্য। তারপর এই পটশৈলী তারই জার্মানি থেকে ছেপে-আসা নিদর্শনগুলির চাপে ক্রমশই প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে। অসম প্রতিযোগিতায় হেরে কালীঘাটের পটুয়ারা ক্রমে ক্রমে অন্য পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এইভাবেই বিলুপ্ত হয় বাংলার পটশিল্পের শেষ সৃজনশীল ধারাটি।



৩৫ গলদা-চিংড়ি মুখে বেড়াল, কলকাতা, উনিশ শতকের মধ্যভাগ



৩৬ গোলাপ-সুন্দরী (কালীঘাট শৈলী অনুসরণে লিথোগ্রাফ), কলকাতা, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ



৩৭ একটি গোলাপ ও দুই নারী (কালীঘাট শৈলী অনুসরণে তেলরঙের ছবি), কলকাতা, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ



৩৮ রাম-সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমান, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ

২০ ইয়োরোপীয় রীতির চিত্রকলা শিক্ষার সূত্রপাত

ইতিমধ্যে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে কলকাতা শহরে ইয়োরোপীয় রীতির কলাশিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা চালু হয়েছে। অবশ্য এর অনেক আগে থেকেই কোনো কোনো ইয়োরোপীয় চিত্রকর চিত্রশিক্ষার প্রাইভেট টুইশন আরম্ভ করেছিলেন এই শহরে। যেমন উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে জনৈক শিল্পী মি. হোন-এর কথা। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে, ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ একটি বিজ্ঞপ্তি ছেপে মি. হোন জানিয়েছিলেন যে তিনি এই শহরের ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাদের সপ্তাহে তিন দিন তাঁর রাধাবাজারের বাড়িতে ছবি আঁকা শেখাবেন বলে স্থির করেছেন[৫০]। তবে এই ধরনের চিত্রশিক্ষা কলকাতার অভিজাত দেশী সমাজে সে সময় কতখানি কার্যকর হয়েছিল তা ঠিক জানা যায় না। কিন্তু নানা খবর থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে উনিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকের মধ্যে শহরের অভিজাত বাঙালিদের কাছে পাশ্চাত্য জীবনধারার অঙ্গ হিসাবে ইয়োরোপীয় চিত্রকলা আদৃত হতে শুরু করে। বিশেষ করে কর্নওয়ালিসের আমল থেকে যে-সব ব্যক্তি বিভিন্ন সাহেব কোম্পানির দেওয়ানি, বেনিয়ানি, মুৎসুদ্দিগিরি করে বা তাদের সঙ্গে ব্যবসা করে ধনাঢ্য হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরাই ইয়োরোপীয় জীবনচর্চার প্রতি যেমন, ঠিক তেমনই কমবেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন পাশ্চাত্যরীতির কলাশিল্পের প্রতি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই তালিকায় গোপীমোহন ঠাকুর ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তিরাও পড়েন।

এই পরিবেশে, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার তখনকার রাজধানী কলকাতা শহরেই প্রথম পাশ্চাত্য শিল্পশিক্ষার সূচনা ঘটেছিল ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে। ওই বছর ২৬ ফেব্রুয়ারি 'ইন্ডিয়া রিভিউ' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ফ্রেডরিক কোরবিনের উদ্যোগে টাউন হলে অনুষ্ঠিত একটি সভায় একটি 'মেকানিকাল ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উদ্দেশ্য হল নির্মাণপ্রকল্প সহায়ক ব্যাবহারিক কাজে এ দেশের ছাত্রদের দক্ষ করে তোলা; এই উদ্দেশ্যে গঠিত সমিতির সভাপতি হন জন পিটার গ্রান্ট, অন্যতম যুগ্ম-সচিব হন খ্যাতিমান শিল্পী কোল্সওয়ার্দি গ্র্যান্ট; এবং সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রামমোহন রায়ের শিষ্য, 'ইয়াং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক তারাচাঁদ চক্রবর্তী। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন যে উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সময় যে পাঁচটি 'শুভানুষ্ঠানে' নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ যোগ দেন, তার একটি হল এই 'মেকানিকাল ইনস্টিটিউশন'। তিনি এও লিখেছেন যে "এদেশীয়দিগকে শ্রমজাত শিল্প" শেখাবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছিল[৫১]। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ প্রথমে হত টাউন হলে ও পরে সাঁ সুসি নাট্যঘরে। তারপর রাজভবনের পূর্বদিকের বাড়িতে ক্লাস খোলা হয়। সপ্তাহে দুদিন সেখানে কোল্সওয়ার্দি গ্র্যান্ট নির্মিতিমূলক বুনিয়াদি আঁকা শেখাতেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই উৎসাহ থিতিয়ে গেলে প্রতিষ্ঠানটি উঠে যায়। সম্ভবত তখন পর্যন্ত শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক স্বীকৃতির অপেক্ষায় ছিল।

এক দশক পরে শিল্পশিক্ষার বিষয় আবার নতুন উদ্যোগ দেখা দিল। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে অনুষ্ঠিত 'গ্রেট এক্‌জিবিশন'-এ প্রদর্শিত ভারতীয় কারুকলার নিদর্শনগুলি ইয়োরোপীয় কলাশিল্প



৩৯ শিবের বিবাহ (লিথোগ্রাফ), কলকাতা, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ

জগতে সাড়া তুলেছিল। ভারতীয় কারুশিল্পের রূপ, নকশা ও রঙের ব্যাপক স্বীকৃতি ও প্রশংসা, এমন-কি ইংল্যান্ডের 'ডিসাইন স্কুল'-এ ভারতীয় আলংকারিক কারুকলা অনুশীলনের ব্যবস্থা, এ দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে শিল্পকলা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে। এই পরিবেশেই ১৮৫৪ সালের ২ মার্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল ই. গুডউইন 'বিজ্ঞান বাণিজ্য ও কলাশিল্পের সমন্বয়' বিষয়ক কলকাতার বেথুন সোসাইটি আয়োজিত একটি বক্তৃতায় তরুণদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যাবহারিক শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। এর ফলে 'সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট' গঠিত হয়। সোসাইটির সভাপতি হন গুডউইন এবং যুগ্মসচিব হন হজসন প্রাট ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয়—সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী রামগোপাল ঘোষ, রামচন্দ্র মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রতাপচন্দ্র সিংহ। হজসনের আবাসে প্রথম সভাতেই সোসাইটি 'দি ক্যালকাটা স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট' নামে একটি শিল্পশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়।

স্থির হয়, প্রস্তাবিত শিক্ষালয়ে শেখানো হবে, ১ আদর্শ (মডেল, অবজেক্ট) ও প্রকৃতি (নেচার) অনুসরণে আঁকা, ২ ধাতুপাত, কাঠের ফলক ইত্যাদিতে খোদাই করে বই প্রভৃতিতে ছবি ছাপা ও লিথোগ্রাফি বা ছাপার জন্য পাথরফলকে আঁকা; ৩ মৃৎপাত্র ও মাটি, মোম ইত্যাদির সাহায্যে বিবিধ জিনিস বানানো। শরচ্চন্দ্র দেব তার 'কলিকাতার ইতিহাস' শীর্ষক রচনায় শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রয়াসগুলি বিবৃত করার প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, এই স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট-এর "উচ্চ অঙ্গের শিল্পশিক্ষা দিবার আদৌ উদ্দেশ্য ছিল না। যাহাতে দেশের কতকগুলি লোক সহজে জীবিকার্জনে সমর্থ হয়, সেই উদ্দেশ্যেই" এই বিদ্যালয় খোলা হয়। এই বিদ্যালয়ের জন্য ভারতীয় ও বিদেশীরা চাঁদা ও এককালীন অনুদান দেন। প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তার অনুজ ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য বিনা ভাড়ায় গরানহাটায় তাদের একটি বাড়ি ছেড়ে দেন। ওই বাড়িতে ১৬আগস্ট মূর্তি ও মৃৎশিল্পের শিক্ষক রিগো (M Rigaud) আর অঙ্কনের শিক্ষক আগ্যায়ার (M. Agyar) শুরু করেন বিদ্যালয়ের ক্লাস। বিদ্যালয়ে ছাত্রের অভাব ঘটেনি। প্রথম বছরেই মূর্তিশিল্পে পঁয়তাল্লিশ ও অঙ্কনে পঞ্চাশ জন ভরতি হয়। আরও বেশি ছাত্রের স্থান সংকুলানের জন্য গরানহাটার বাড়ি থেকে বিদ্যালয়টি তুলে আনা হয় কলুটোলার মতিলাল শীল ফ্রি কলেজ ভবনে। পরের বছর বিদ্যালয়ের পরিচালকরা ছাত্রদের শিল্পকর্ম নিয়ে একটি প্রদর্শনী করলে (জানুয়ারি ২২-ফেব্রুয়ারি ৩, ১৮৫৫), তাদের শিল্পকর্ম দর্শকদের ও সংবাদপত্রের প্রশংসা পায়। ঐ বছরই এচিং, কাঠখোদাই ইত্যাদি শেখানোর জন্য ইংল্যান্ড থেকে তিনশ টাকা বেতনে তিন বছরের জন্য টি. এফ. ফাউলারকে আনা হল।

সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের এককালীন দান, চাঁদা আর ছাত্রদের সামান্য বেতনে বিদ্যালয়ের ব্যয় চালানো বেশিদিন সম্ভব হল না। ফলে সরকারের কাছে দরবার করে বড়লাট ক্যানিং-এর সৌজন্যে বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ছ'শ টাকা মঞ্জুর করানো হয়েছিল। কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের দরুন সেই অনুদান কমে দাঁড়ায় সাড়ে তিনশ-তে। তা সত্ত্বেও বিদ্যালয় পুরোদমে চলতে থাকে। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে পূর্ববর্তী মৃন্ময় গঠন (modelling), প্লাস্টারের ছাঁচ (moulding) ও ফিগার ড্রয়িং শিক্ষার সঙ্গে ল্যান্ডস্কেপ অঙ্কন ও পরিপ্রেক্ষিত শিক্ষা এবং ফোটোগ্রাফি শিক্ষা যুক্ত হতে দেখা যায়। এই সময় বিদ্যালয়ের পাঁচজন ছাত্র—প্রমথনাথ মিত্র, জিতেন্দ্রলাল পাইন, হরিশঙ্কর খাঁ, প্রসন্নকুমার রায়, ও কালিদাস পাল—বিদ্যালয়ের শুভানুধ্যায়ী বিচারপতি লরেন্স পিল-এর নামাঙ্কিত বৃত্তি লাভ করেন। এর আগে প্রথম যে ছাত্র-শিল্পী এই বৃত্তি পান তিনি হলেন তারাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিন্তু দিনে দিনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট স্কুলের আর্থিক অনটন বাড়তেই থাকে। আর তার ফলে

সরকারের কাছে হয় অনুদান বৃদ্ধি নতুবা সম্পূর্ণ অধিগ্রহণের আরজি জানানো ছাড়া উপায় থাকে না। বাংলার লাট তখন সিসিল বিডন। তিনি ছিলেন এক সময় এই বিদ্যালয়েব উদ্যোক্তা। তাঁব উদ্যোগে সরকার এই শর্তে বিদ্যালয়টি অধিগ্রহণে রাজি হয় যে, ইংল্যান্ড থেকে একজন যোগ্য অধ্যক্ষ এনে তাঁর ওপর বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে। সেই অনুযায়ী লন্ডন স্কুল অব ডিজাইনের সুপারিন্টেন্ডেন্টকে চিঠি লিখলে তিনি হেন্‌রি হোভাব লক-কে মনোনীত কবে পাঠান। আঠারো শ চৌষট্টির ২৯ জুন লক বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির কাছ থেকে বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন এবং বিদ্যালয়টি তখন থেকে সরকারের শিক্ষা-অধিকর্তার আওতায় আসে। লকের কার্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়টির এক নতুন জীবন শুরু হয়।



৪০ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায, বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায, আঃ ১৮৮২ খ্রি

২১ হেন্‌রি হোভার লক ও পাশ্চাত্য চিত্ররীতির প্রসার

হেন্‌রি হোভার লক ১৮৬৪ থেকে ১৮৮২ পর্যন্ত একটানা আঠারো বছর কলকাতার সরকার অধিগৃহীত আর্ট স্কুলের পরিচালনায় থেকে আধুনিক অর্থে শিল্পশিক্ষা বলতে যা বোঝায় বাংলায় তার ভিত্তি স্থাপন করেন। কলাশিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলা দেশে নানাভাবে কলাশিল্পের চর্চাকে প্রসারিত করার জন্যে তাঁর যে আন্তরিক প্রয়াস এবং ছাত্রদের প্রতি তাঁর যে গভীর প্রীতি তা তাঁকে তাঁর জীবৎকালেই সকলের কাছে মহাত্মা নামে খ্যাত করেছিল।

লক এ দেশে কী ধরনের শিল্পশিক্ষা প্রবর্তন করেছিলেন তা বুঝতে হলে অবশ্যই জানতে হয় তাঁর নিজের শিল্পশিক্ষার পটভূমিকাকে। তিনি ছিলেন লন্ডনের সাউথ কেন্‌সিংটন মিউজিয়মের স্কুল অব ডিজাইন-এ চিত্রকলার ছাত্র। এই বিদ্যালয় থেকেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিশ শতকের প্রথম পাদে ভারতের সব কটি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ এসেছিলেন। লক ও তাঁর মতন অনান্য আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষরা স্বাভাবিকভাবেই ভিক্টোরীয় আমলের ইংল্যান্ডে অনুসৃত শিল্পাদর্শ ও করণকৌশল এদেশে বহন করে আনেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ভারতে ইয়োরোপীয় রীতির, বিশেষ করে ইংল্যান্ডের অ্যাকাডেমিক রীতির অনুবর্তন করেন আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গেই। কিন্তু যে কথা বিশেষ করে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে তা হল সাউথ কেন্‌সিংটন স্কুলে যোশুয়া রেনল্ডস প্রবর্তিত ক্লাসিকাল তথা রেনেসাঁস অনুগামী অ্যাকাডেমিক রীতি অনুসৃত হলেও, ইয়োরোপীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে, এমন-কি ইংল্যান্ডেও তখন পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। রেনল্ডসের যুগ শেষ হয়ে তখন চলছে জন রাস্কিনের কাল। অ্যাকাডেমিক রীতির পরিবর্তে টার্নারের ছবির রোমান্টিক অভিব্যক্তিকে তখন বড় করে তুলে ধরছেন রাস্কিন। এমন-কি, তাঁর শিল্প-ভাবনায় উৎসাহিত হয়ে জন্ম নিচ্ছে প্রি-র‍্যাফেলাইট আন্দোলন—মিলেইস, ম্যাডক্স-ব্রাউন, রোসেটিদের হাতে ব্রিটিশ চিত্রকলা বস্তুজগতকে ছাপিয়ে কাব্যময় মনোজগতে বিচরণ শুরু করে দিয়েছে।

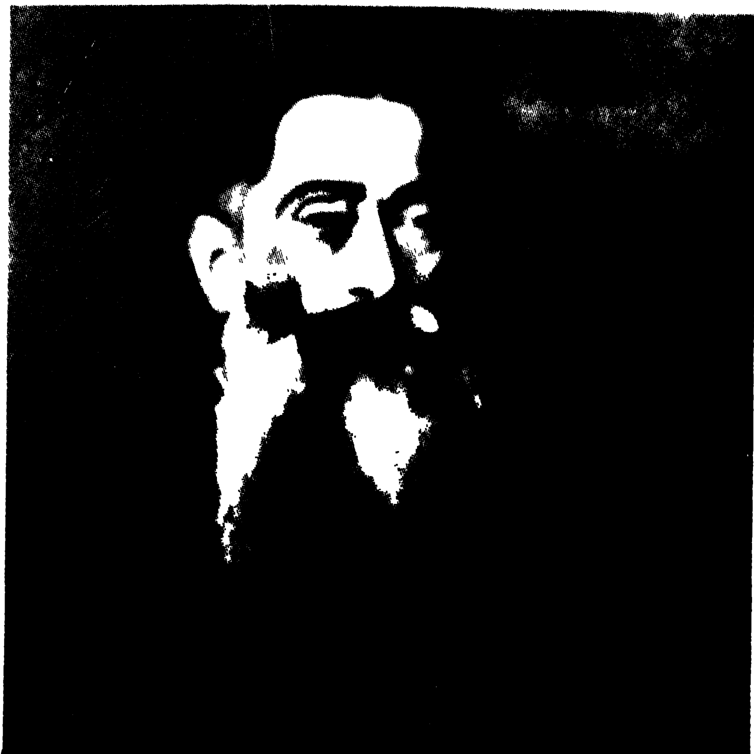
রক্ষণশীল সাউথ কেন্‌সিংটনের ছাত্র লক অবশ্যই এই সব নতুন শিল্পভাবনা বিষয়ে তেমন উৎসাহী ছিলেন না। তাঁর লক্ষ্য ছিল এদেশের তরুণদের ইয়োরোপীয় অ্যাকাডেমিক শিল্পরীতিতে সুদক্ষ করে গড়ে তোলা। এ কাজে তাঁর সততার অভাব ছিল না। তিনি যোগদানের পরই বিদ্যালয়টি উঠে আসে বউবাজার স্ট্রিটের ১৬৬ নম্বর বাড়িতে। নতুন বাড়িতে নতুন পাঠক্রমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নিলেন তিনি। সেই সঙ্গে তিনি শিক্ষাশ্রেণী, শিক্ষাবর্ষ, ছাত্রদের উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে শৃঙ্খলা আনার দিকেও যত্নবান হলেন। শিক্ষণীয় বিষয়গুলি হল : ১ রেখাঙ্কন, ২ চিত্রাঙ্কন, ৩ মডেলিং বা মৃৎকর্ম, ৪ কারুধর্মী নকশা (design for manufacturers), ৫ লিথোগ্রাফি, ৬ কাঠখোদাই ও ৭ ফোটোগ্রাফি। নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষে শিক্ষা যাতে সম্পূর্ণ হয় তার জন্যে লক শিক্ষার বিষয়গুলিকে কয়েকটি স্তরে ও উপস্তরে বিন্যস্ত করেছিলেন। ১ বুনিয়াদী রেখাঙ্কন, ২ মুক্তহাতে উচ্চমানের রেখাঙ্কন, ৩ মুক্তহাতে আলোছায়ার সাহায্যে অঙ্কন, ৪ যন্ত্রাদির সাহায্যে জ্যামিতিক নকশা, ৫ বুনিয়াদি রঙিন চিত্রাঙ্কন, ৬ রঙে উচ্চমানের চিত্রাঙ্কন, ৭ মডেলিং বা মাটির মূর্তি রচনা, ৮ প্রাথমিক নকশা, ৯ যন্ত্রাদির নকশা, ১০ লিথোগ্রাফি, ১১

কাঠখোদাই ও ১২ ফোটোগ্রাফি বা আলোকচিত্র। প্রতিটি স্তরই আবার দুটি বা তিনটি উপস্তরে বিভক্ত ছিল। যেমন দ্বিতীয় স্তরটি, অর্থাৎ মুক্তহাতে উচ্চমানের রেখাঙ্কনের ক্ষেত্রে তিনটি উপস্তর—১ ড্রয়িং বই থেকে সমতলীয় নকশা, ফুল, পাতা, মানুষ, পশু প্রভৃতির বহিঃরেখা-প্রধান কপি ; ২ বর্তুলতা ও ঘনত্ব বিশিষ্ট বস্তুর বহিঃরেখাঙ্কন, পুরামূর্তি, গয়না, অবয়ব ইত্যাদি দেখে বহিঃরেখা অঙ্কন ; এবং ৩ প্রকৃতির ফুল, পাতা ইত্যাদির রেখাঙ্কন।

এই পাঠক্রম থেকে বোঝা যায় আর্ট স্কুলের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল দৃশ্যমান বস্তুকে যথাযথভাবে অনুকরণ করা ও ব্যাবহারিক ছবি ও নকশা আঁকায় ছাত্রদের পারদর্শী করে তোলা। শিক্ষার্থীর চিন্তা বা কল্পনাশক্তিকে সমৃদ্ধ করে তাকে মননশীল শিল্পী হিসাবে গড়ে তোলার কোনো পরিকল্পনা এই পাঠক্রমে ছিল না। কিন্তু তাঁর যে লক্ষ্য লক তা তাঁর প্রবর্তিত বিস্তৃত পাঠক্রমের মাধ্যমে অচিরেই অর্জন করেছিলেন। তাঁর ছাত্রদের কয়েকজন পাশ্চাত্য শিল্পরীতিতে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই দক্ষতা লাভ করে কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। এঁদের সাহায্য নিয়ে ফোর্ট উইলিয়ামের সেন্ট পিটার্স চার্চের অভ্যন্তরভাগের অলংকরণের কাজ সুচারুভাবে সম্পাদনে সক্ষম হন তিনি। এই অলংকরণের কাজের উল্লেখে লক তাঁর ১৮৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দের প্রতিবেদনে লিখলেন[৫৩] : "নানান স্তরের ছাত্রদের অগ্রগতি সাধারণত এমন যা আমাকে খুবই সন্তুষ্ট করেছে। এখানকার ইয়োরোপীয়ানরা বারবার যে কথাটা বলে প্রায় তাদের ধর্মমত করে তুলেছে, সেই বাঙালিরা কেবল ভালো 'অনুকরণকারী' হতে পারে, তার যথার্থতা সম্পর্কে আমার সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। বিদ্যালয় মাত্র অল্প দিনের···, তবু··· এরই মধ্যে বর্তুল বস্তু, পুরাকীর্তি ও প্রকৃতির ভালো রেখাঙ্কন যথেষ্ট পরিমাণে দেখা দিচ্ছে"। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রিয়নাথ দাসের কালি-কলমে আঁকা কাজের উদাহরণ দেখলে সহজেই বোঝা যাবে অ্যাকাডেমিক চিত্ররীতির মূল নিয়মগুলি—পরিপ্রেক্ষিত (perspective), ক্ষয়বৃদ্ধি (fore-shortening), প্রমাণ (anatomy) ও বস্তুসংস্থাপন (composition)—লকের ছাত্ররা কতখানি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। লক তাঁর প্রথম সারির ছাত্রদের ওপর কতদূর আস্থাবান ছিলেন তা ধারণা করা যায় তাঁর এক দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত থেকে। তিনি তাঁর তিন ছাত্র অন্নদাপ্রসাদ বাগচী, শ্যামাচরণ শ্রীমানী ও আর. বি. লসনকে ছাত্র-শিক্ষক পদে নিযুক্ত করে এক নতুন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ১৮৬৯-৭০-এর বাৎসরিক প্রতিবেদনে তিনি লিখলেন[৫৪] : "···এই পরিকল্পনাটি পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছে"। স্কুলের শিল্পশিক্ষায় উৎসাহ সৃষ্টি ও সেই সঙ্গে শিল্পীর পেশা অবলম্বনের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে লক বাড়তি কয়েকটি ব্যবস্থা নিতেও প্রয়াসী হন। তাঁর এই সব ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে তিনি অবশ্য বিশেষ সহায়ক হিসাবে পান পরপর দুই লেফ্‌ট্যানেন্ট-গভর্নর সিসিল বিডন ও রিচার্ড টেম্পল-কে ; এমন-কি তখনকার ভাইসরয় নর্থব্রুকও ছিলেন কলাশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় আগ্রহী। লকের প্রতিটি উদ্যোগেই এঁরা সেসময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। মেধাবী ছাত্রদের জন্যে কয়েকটি পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হলে পরবর্তীকালে খ্যাতিমান অন্নদাপ্রসাদ বাগচী ও কালিদাস পালের মতো শিল্পীরা তা লাভ করেন। তা ছাড়া, ১৮৭৩ ও ১৮৭৯ সালে কলকাতায় সর্বভারতীয় চারুকলা প্রদর্শনী আয়োজনেও সংগঠকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন লক। দুটি প্রদর্শনীতেই কলকাতার আর্ট স্কুলের ছাত্রদের কাজ বিশেষভাবে আদৃত হয়ে পদক ও অন্যান্য পুরস্কার লাভ করেছিল। তাঁদের কাজ লন্ডনের কেন্‌সিংটনে আয়োজিত ১৮৭৩-এর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ও মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ১৮৭১-এর সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতেও প্রশংসিত হয়।

ফোর্ট উইলিয়ামের সেন্ট পিটার্স চার্চের অলংকরণ ছাড়াও লক তাঁর ছাত্রদের সহযোগে গভর্নমেন্ট হাউস বা রাজভবনের দরবার হলের অভ্যন্তরে অলংকরণের কাজ সম্পূর্ণ

করেছিলেন। অন্যান্য নানান অজুরার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র রচিত 'এন্টিকুইটিস অব ওড়িশ্যা' (দুই খণ্ড : প্রকাশকাল ১৮৭৫ ও ১৮৮৮) ও 'বুদ্ধগয়া' (১৮৭৮) নামক দুটি মহৎ গ্রন্থ এবং জে. ফেয়েরার রচিত 'দি থানাটোফিডিয়া অব ইন্ডিয়া' (১৮৭২) নামক ভারতীয় সর্পবিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থ সচিত্রকরণ। এই সব গবেষণামূলক গ্রন্থের ছবি আঁকার কাজে লক তাঁর প্রথম সারির ছাত্রদের নিযুক্ত করেছিলেন। রাজেন্দ্রলালের ওড়িশ্যা বিষয়ক গ্রন্থের চিত্র আঁকার জন্য প্রধানশিক্ষক ডেভিড গ্যারিকের নেতৃত্বে অন্নদাপ্রসাদ বাগচী, গোপালচন্দ্র পাল, কালিদাস পাল ও হরিশচন্দ্র খাঁ ওড়িশ্যা ভ্রমণ করেন। এঁদের আঁকা থেকে নির্বাচিত ওড়িশ্যার স্থাপত্য ও তার অলংকরণের চিত্র ১৮৭১-এ লন্ডনের সাউথ কেন্‌সিংটনে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। লকের দুই ছাত্র মেডিকেল কলেজের জন্য ৪৩৩টি অস্থিবিদ্যাসংক্রান্ত ছবি এঁকে দিয়ে তখনকার চিকিৎসাবিদ্যা প্রসারেও সাহায্য করেন।



৪১ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শশীকুমার হেশ, ১৮৯৯ খ্রি

কলকাতায় প্রথম স্থায়ী শিল্প প্রদর্শশালা বা আর্ট গ্যালারি প্রতিষ্ঠাতেও প্রধান উদ্যোগ ছিল লকের। বড়লাট নর্থব্রুক ও ছোটলাট রিচার্ড টেম্পলের সহযোগিতায় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে আর্ট স্কুলের সংলগ্ন ১৬৪ ও ১৬৫ নম্বর বউবাজার স্ট্রিটে এই আর্ট গ্যালারিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানত নর্থব্রুকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত আর্ট গ্যালারিটির উদ্দেশ্য ছিল দুটি : ১ সাধারণের মধ্যে কলাশিল্প বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি এবং ২ আর্ট স্কুলের ছাত্রদের কলাশিল্পের বিভিন্ন বিভাগের নিদর্শনগুলির সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে বিশেষ শিক্ষাদান। বলা বাহুল্য, প্রথমদিকে শেষ উদ্দেশ্যটিই ছিল সামনে। কেননা আর্ট গ্যালারি প্রসঙ্গে ১৮৭৬-৭৭-এ প্রকাশিত ডি. পি. আই.-এর প্রতিবেদনে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে[৫৫], "এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল এদেশীয় তরুণদের ইয়োরোপের প্রাচীন ও বর্তমানকালের শিল্প ও মানুষ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া; ইয়োরোপীয় শিল্পের দুর্বল নকল করতে শিখুক তার জন্য নয়, বরং এর থেকে ছাত্ররা ইয়োরোপের শিল্পের সাদৃশ্যধর্মিতার রচনাপদ্ধতি শিখে নেবে এবং সেই পদ্ধতিতে নিজেদের দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য, সৌধস্থাপত্য, নৃ-বৈচিত্র্য ও জাতীয় পোশাক-আসাক আঁকবে"। বাস্তবিক পক্ষে, লক তাঁর দীর্ঘ আঠারো বছরের শিক্ষকতার কালে কখনোই ভারতীয় ছাত্রদের ইয়োরোপীয় কলাশিল্পের অন্ধ অনুকারী করে তুলতে চাননি। বরং দেখা যায় তিনি তাঁর ১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দের সরকারি প্রতিবেদনে লিখছেন[৫৬] : "আমার ইচ্ছা বাংলার আর্ট স্কুলের ছাত্ররা এক দিকে যেমন ক্যালিমাকাস (Callimachus) অ্যাপোলোডোরাস ঘিবার্টি (Apollodorus Ghiberti) ও সানসোভিনো (Sansovino) থেকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে শিক্ষা নেবে, তেমনই তারা তাদের পূর্বপুরুষদের প্রশংসনীয় আলংকারিক শিল্পের গঠন ও অনুপুঙ্খের বিষয়েও জ্ঞানার্জন করবে"। লক যেসময় আর্ট স্কুলের কার্যভার বহন করছিলেন সে সময় ইংল্যান্ডে ভারতীয় কারুশিল্পের আলংকারিক ঐশ্বর্য বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত ভারতীয় কলাশিল্পের প্রকৃত মহত্ত্ব সে দেশের শিল্পরসিকদের সামনে ঠিকমতো উন্মোচিত হয়নি। তখন কেবলমাত্র সাউথ কেন্‌সিংটন মিউজিয়মের পরিচালক হেন্‌রি কোল্ প্রমুখ শিল্পী ও শিল্পরসিকেরা ভারতীয় আলংকারিক শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ করে সেখানকার স্কুল অব ডিজাইনে তা শেখাবার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। সেই অনুযায়ীই লকও চেয়েছেন বাংলার আর্ট স্কুলের ছাত্ররা ভারতীয় আলংকারিক শিল্পের জ্ঞান অর্জন করুক। কিন্তু প্রকৃত শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর বিশ্বাসমতো ইয়োরোপীয় রীতির চিত্র ও ভাস্কর্যকলা শিক্ষার ব্যবস্থাই নিয়েছিলেন। তাঁর সাফল্য হল এই যে তিনি সেই শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিককালের বাঙালি শিল্পীদের প্রথম প্রতিনিধিদের গুরুপদে আসীন থেকে 'মহাত্মা' আখ্যা লাভ করতে পেরেছিলেন। তাঁর সময়েই কলকাতার সমাজে শিল্পকলার ও শিল্পীর মর্যাদা কিছুটা স্বীকৃত হয়। তাই হেন্‌রি হোভার লকের মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে মৃত্যু ঘটলে (২৪ ডিসেম্বর, ১৮৮৫) 'সঞ্জীবনী'-তে লেখা হল[৫৭] : "তিনি যখন স্কুলে প্রথম পদার্পণ করেন···তখন কামার, কুমার, ছুতার প্রভৃতি শ্রমজীবী শ্রেণীর লোক ভিন্ন ভদ্রবংশীয় সন্তানগণ এখানে শিক্ষালাভ করিতে বড় অগ্রসর হইত না।···এখন এই বিদ্যালয়ে সদ্বংশীয় ও শিক্ষিত বালকগণের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে"। (১৯ পৌষ, ১২৯২) মধ্যযুগীয় বংশ পরম্পরার কারিগরের আওতা থেকে শিল্পকে আধুনিককালের ব্যক্তিতান্ত্রিক বিকাশের পথে এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন এ হল তার স্বীকৃতি।

২২ গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্‌ট : প্রথম পর্বের কৃতী ছাত্রবৃন্দ

আধুনিক শর্তে হেন্‌রি হোভার লকের যে ক'জন ছাত্র শিল্পী ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়ে খ্যাতি লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট হলেন অন্নদাপ্রসাদ বাগচী ও শ্যামাচরণ শ্রীমানী। এঁরা দুজনেই লকের একেবারে গোড়ার দিকের ছাত্র এবং এঁদের দুজনকেই তিনি আর্ট স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক পদে নিয়োগ করেন। এঁদের মধ্যে শ্যামাচরণের পারদর্শিতা ছিল কাঠখোদাই, লিথোগ্রাফি ও জ্যামিতিক রেখাঙ্কনে। তাঁকে লক আর্ট স্কুলে জ্যামিতিক চিত্রকলার শিক্ষকতাতেই যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু শ্যামাচরণের প্রসিদ্ধি তাঁর স্বাদেশিকতার জন্য। নবগোপাল মিত্র ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল স্কুল চালু করলে তিনি লকের অনুমতি নিয়ে সেখানে চারু ও মূর্তিকলার শিক্ষকতা শুরু করেন। নবগোপাল মিত্র ও অন্যান্য স্বদেশী নেতাদের উদ্যোগে আয়োজিত হিন্দুমেলার প্রদর্শনীর দায়িত্ব বহন করেন তিনি। ভারতীয়দের মধ্যে সম্ভবত তিনিই প্রথম ভারত-শিল্পকলা বিষয়ে নিয়মিত বক্তৃতা ও নিবন্ধ লিখে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্রতী হন। 'আর্যজাতির শিল্পচাতুরি' নামে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থে তিনিই প্রথম ভারতীয় শিল্পীদের ইয়োরোপীয় চিত্রকলার অন্ধ অনুকরণ থেকে নিবৃত্ত হয়ে ভারতীয় শিল্পাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান। গ্রন্থটি তখনকার অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাতেই সপ্রশংসভাবে সমালোচিত হয়। একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং বঙ্গদর্শনে এই গ্রন্থটির সমালোচনায় লেখেন[৩৮], "···এই ক্ষুদ্র গ্রন্থপাঠে আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি"। আর শ্যামাচরণের মৃত্যুর (১৮৭৫) তিরিশ বছর পর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শিল্প-ভাবনার অন্যতম অনুপ্রেরণা বোধে এই গ্রন্থটির উল্লেখ সহ আর্ট স্কুলের ছাত্রদের সভায় শ্যামাচরণকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

অন্নদাপ্রসাদের ভূমিকা ভিন্ন এবং অবশ্যই আরও ব্যাপক। তিনি লকের একনিষ্ঠ ছাত্র হিসাবে ইয়োরোপীয় চিত্রকলার রীতি-পদ্ধতিতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে সেই আদর্শেই আজীবন কলাশিল্পের সেবা করেছিলেন। কী শিক্ষক হিসাবে, কী চিত্রকর হিসাবে অন্নদাপ্রসাদ আধুনিককালে যতখানি সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন তার আগে তাঁর মতো আর কেউই হননি। আর্ট স্কুলে লকের অধ্যক্ষতার প্রথম দিকে (১৩ জুলাই ১৮৬৫) ভরতি হয়ে তিনি কাঠখোদাই, লিথোগ্রাফি ও এন্‌গ্রেভিং শেখার পর লক-এরই তত্ত্বাবধানে ইয়োরোপীয় রীতির তেলরঙের চিত্রকলা অনুশীলন করেন। তারপর ছাত্র হিসাবে কৃতিত্ব প্রদর্শনের দরুন তিনি অপর দুই সহপাঠীর সঙ্গে আর্ট স্কুলে ছাত্র-শিক্ষক নিযুক্ত হন।

অন্নদাপ্রসাদের প্রাথমিক খ্যাতি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিখ্যাত দুই গ্রন্থ 'অ্যান্টিকুইটিস অব ওড়িশ্যা' ও 'বুদ্ধগয়া'র ছবির জন্য। এই ছবিগুলি আঁকার সূত্রে তিনি রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে ওড়িশ্যা ও বুদ্ধগয়া ভ্রমণ করে ভারতীয় মন্দিরস্থাপত্য ও তার অলংকরণের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হন। এই গ্রন্থ দুটিতে তাঁর আঁকা কালি-কলমের ছবিগুলিতে অঙ্কনদক্ষতা বিশেষ করে চোখে পড়ে। প্রতিকৃতির সাদৃশ্য রচনায় লকের ছাত্ররা যে কতদূর নিষ্ঠাশীল ছিলেন তা বোঝা যায় জে. ফেয়েরার রচিত ভারতীয় সর্পবিষয়ক গবেষণা-গ্রন্থের ছবির প্রসঙ্গে। এই বইটির জন্য প্রামাণ্য ছবি আঁকার প্রয়োজনে বিষধর জীবন্ত সাপ এনে ধরা হয়েছিল অন্নদাপ্রসাদের সামনে।

ইয়োরোপীয় রীতির তেলরঙের প্রতিকৃতি রচনাতেও কৃতবিদ্য ছিলেন অন্নদাপ্রসাদ। তারই স্বীকৃতিতে বড়লাট নর্থব্রুকের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি উনিশ শতকের দিক্‌পাল পুরুষ রমানাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিকৃতি আঁকেন। তেলরঙের মাধ্যমে তিনি অনেকগুলি পৌরাণিক ছবিও এঁকেছিলেন—যেমন কুবেরের লক্ষ্মীপূজা, মানভঞ্জন, শাক্যমুনির আশ্রম ইত্যাদি।

অন্নদাপ্রসাদের এক দুঃসাহসী উদ্যোগ হল সরকারি আর্ট স্কুলের ছাত্র নবকুমার বিশ্বাস, ফণিভূষণ সেন, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণচন্দ্র পালকে সঙ্গে নিয়ে যৌথভাবে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিয়ো প্রতিষ্ঠা (১৮৭৮)। এঁদের মধ্যে নবকুমার ছিলেন জলরঙের এক কৃতী শিল্পী। ১৮৫ নম্বর বউবাজার স্ট্রিটে স্থাপিত এই আর্ট স্টুডিয়ো-তে প্রতিকৃতিচিত্রাঙ্কন ও গ্রন্থচিত্রণের ব্যবস্থা ছিল। তা ছাড়া এখান থেকে বাংলা ও ইংরেজি অ্যালফাবেট বোর্ড, কপিবুক ও দেবদেবীর রঙিন লিথোচিত্র মুদ্রিত হয়ে তখনকার বাজারে বহুল পরিমাণে বিক্রি হত। এইভাবে চিত্রকলা শিক্ষাকে পেশা করে নিয়ে যৌথ প্রয়াসে ব্যবসা পরিচালনার চেষ্টা সেসময় ছিল অভাবনীয়। এই প্রতিষ্ঠানটি কেবল সেই কারণেই নয়, বাঙালির ঘরে ঘরে নানান দেবদেবীর রঙিন ছবি পৌঁছে দিয়ে ইয়োরোপীয় সাদৃশ্যধর্মী ছবির প্রতি সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করে তোলার কারণেও গুরুত্বপূর্ণ। এই আর্ট স্টুডিয়ো থেকেই বহু বাঙালি মনীষীর প্রতিকৃতিচিত্র মুদ্রিত হয়ে বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলিই এঁকেছিলেন অন্নদাপ্রসাদ নিজে—যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগবতী দেবী, প্যারীচরণ সরকার, বেথুন, মেরি কার্পেন্টার ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। আর্ট স্টুডিয়ো থেকে চৈতন্যজীবন অবলম্বনেও বেশ কয়েকটি রঙিন ছবি ছাপা হয়েছিল। সাধারণ বাঙালি পরিবারগুলির মধ্যে চিত্রকলার মাধ্যমে জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে এই আর্ট স্টুডিয়োর ভূমিকা অনেকখানি।

অন্নদাপ্রসাদ অধ্যক্ষ লকের আহ্বানে আর্ট স্কুলে প্রধানশিক্ষক হিসাবে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে যোগদান করেন এবং সে সময় তিনি তাঁর সহকর্মীদের ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিয়োর স্বত্ব দান করে দেন। একটানা পঁচিশ বছর আর্ট স্কুলের প্রধানশিক্ষকের পদে অধ্যক্ষ লক, জুলে শ্যামবার্গ, উইলিয়াম জবিন্স এবং ই. বি. হ্যাভেলের অধীনে শিক্ষকতার পর তিনি অবসর নেন (১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৫)। এই দীর্ঘকালের শিক্ষকতার কারণে এবং নিজস্ব চিত্রকর্মের বিপুল স্বীকৃতির ফলে অন্নদাপ্রসাদ তাঁর জীবৎকালেই প্রতিষ্ঠানবিশেষে পরিণত হন। 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি প্রমোশন অব ফাইন আর্টস অ্যান্ড ন্যাশনাল গ্যালারি' নামক বাঙালি শিল্পীদের প্রথম চারুকলা সংস্থা গঠিত হলে (১৮৯২) তিনি তার সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত চারুকলা বিষয়ক প্রথম মাসিক পত্রিকা 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি'র তিনি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা (প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৯২)। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত (১৯০৫) 'বঙ্গীয় কলা সংসদ'-এরও তিনি সভাপতি হন। অন্নদাপ্রসাদ লকের আমলের আর্ট স্কুলের শিক্ষাকে একদিকে যেমন সংখ্যাগতভাবে বহুজনের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, অন্যদিকে গুণগতভাবে তাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের কাছেও।

২৩ লক-পরবর্তীকালের আর্ট স্কুল

হেনরি লকের অধ্যক্ষতাকালের পরবর্তী দশ বছর প্রয়োজনমতো কিছুটা পরিবর্তিতভাবে তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাধারাই আর্ট স্কুলে চালু থাকে। এ সময় স্কুলের নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যক্ষ উইলিয়ম জবিন্স ও সহ-অধ্যক্ষ ওলিন্টো গিলার্ডি। এঁরা দুজনেই নানা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে স্কুলের ভেতরে ও বাইরে ইয়োরোপীয় কলাশিল্পের শিক্ষা ও প্রচার লকের ধারাতেই অব্যাহত রাখেন। জবিন্স স্বয়ং ছিলেন একজন কৃতী তেলরঙের নিসর্গ চিত্রকর। তখনকার কলকাতার প্রায় সব চিত্রপ্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে তিনি শিল্পী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তা ছাড়া সাধারণের মধ্যে শিল্পপ্রচারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য (১৮৮৯) হিসাবে, কিংবা পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরদের বিখ্যাত শিল্পসংগ্রহের জন্য ইয়োরোপীয় শিল্পের নির্বাচক হিসাবে তাঁর বিশেষ ভূমিকার কথা জানা যায়। কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউস বা রাজভবনের চিত্রগুলি তালিকাভুক্ত করার কাজও তিনি শুরু করেছিলেন। তাঁর অধ্যক্ষতার কালেই বউবাজার স্ট্রিট থেকে আর্ট স্কুল ও তার আর্ট গ্যালারি চৌরঙ্গিতে উঠে আসে। আর্ট স্কুলের শিক্ষা-প্রণালীতে কিছুটা পরিবর্তন আনা ছাড়াও জবিন্স নতুন করে ফোটোগ্রাফি শেখানোর ব্যবস্থা নেন। সেইসঙ্গে গিলার্ডির তত্ত্বাবধানে চালু করা হয় তামার পাতে এচিং-এর কাজ।

আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষের পদে গিলার্ডি ছিলেন দীর্ঘ উনিশ বছর (১৮৮৬-১৯০৫)। প্রায় এই দুই দশক কাল ধরে তিনি কলকাতার বুকে ইয়োরোপীয় শিল্পকলা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অনলস শ্রম করে গেছেন। ছাত্রদরদী সুশিক্ষক হিসাবে তাঁর ভূমিকা অনেকটাই লকের মতো। তেলরং, প্যাস্টেল ও এচিং—এই তিনটি মাধ্যমেই তাঁর যোগ্যতা ছিল অবিসম্বাদী। সে সময় কলকাতার বড় বড় চিত্র-প্রদর্শনীতে তিনি অংশ নিয়েছেন; তাঁর ছবি তখন পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরদের দ্বারা সংগৃহীতও হয়েছে। কিন্তু এখন তাঁর ছবি দুর্লভ। তবু তাঁর শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত পারদর্শিতার মান অনুমান করা যায়। তাঁর উপদেশেই আর্ট স্কুলের ছাত্র শশীকুমার হেশ (১৮৬৯-?), রোহিণীকান্ত নাগ (১৮৬৮-৯৫) ও ফণীন্দ্রনাথ বসু (১৮৮৮-১৯২৬) ইয়োরোপে গিয়ে উচ্চতর অ্যাকাডেমিক শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। রোহিণীকান্ত ও ফণীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধানত ভাস্কর। ইটালিতে রোমের রয়াল অ্যাকাডেমিতে সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষাগ্রহণের পর রোহিণীকান্ত দুরারোগ্য যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় ফিরে মাত্র সাতাশ বছর বয়সে মারা যান। ফণীন্দ্রনাথ স্কটল্যান্ডের 'এডিনবরা কলেজ অব আর্ট'-এ শিক্ষা সমাপ্ত করে বাকি জীবন ইয়োরোপেই ভাস্কর্যকর্ম করে খ্যাতি লাভ করেন। শশীকুমার প্রথমে তিন বছর রোমের 'রয়াল অ্যাকাডেমি' ও তারপর জার্মানির 'মিউনিক অ্যাকাডেমি'-তে শিক্ষা নিয়ে ইয়োরোপীয় রীতিতে পেইনটিং আঁকায় অনন্য সাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন। বিশেষত তেলরঙে ও প্যাস্টেলে প্রতিকৃতি অঙ্কনে তাঁর সময় তিনি ছিলেন ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শশীকুমার বিশ শতকের সূচনায় কলকাতায় ফিরে কয়েক বছর বসবাস করেন। এই সময়েই তিনি ফ্লামা নামে এক ফরাসি বিদুষীকে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পৌরোহিত্যে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেছিলেন। শিল্পী হিসাবে কৃতিত্বের জন্য তিনি ইংল্যান্ডে থাকার সময়েই ডবলিউ. সি. বোনার্জি, দাদাভাই নৌরজি, রমেশচন্দ্র দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিপিনচন্দ্র ৪১

পাল প্রমুখের দ্বারা আদৃত হন। কলকাতাতেও তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু ও আরও অনেকের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রতিকৃতি রচনার বেশ কিছু কাজ তিনি করেছিলেন। তার মধ্যে বরোদা ও ত্রিপুরার রাজপরিবারের ব্যক্তিদের ছবির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে শশীকুমারের খ্যাতি প্রধানত তাঁর আঁকা সমকালীন ভারতীয় মনীষীদের প্রতিকৃতির জন্য। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রমেশচন্দ্র দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, জগদীশচন্দ্র বসু, অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের ছবিগুলি কলকাতায় দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া ভাইসরয় নর্থব্রুক, বাংলার লেফ্‌ট্যানেন্ট-গভর্নর স্টুয়ার্ট বেইলি, দাদাভাই নৌরজি, অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ও আরও অনেক বিশিষ্টজনের ছবি তিনি এঁকেছেন। কিন্তু এত কাজ করা সত্ত্বেও আর্থিক অনটনে পড়ে তিনি সস্ত্রীক চিরকালের মতো এ দেশ থেকে চলে যেতে বাধ্য হন। শোনা যায় চল্লিশের দশকের গোড়ায় শশীকুমার আমেরিকায় মারা যান।

বিশেষভাবে বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত শশীকুমারের আগেই, উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকেই তেলরঙে প্রতিকৃতি রচনায় বাঙালি শিল্পীরা পারদর্শিতা দেখাতে শুরু করেছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রথম যিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন তিনি হলেন গঙ্গাধর দে। তিনি অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর চেয়েও বয়সে বড় ছিলেন। তাঁর শিক্ষা বা ছবির পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। 'অন্নদা-জীবনী' (১৩১৪) গ্রন্থে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, "দে মহাশয় বাগচী মহাশয়ের চেয়ে প্রাচীন ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বাঙালির মধ্যে পাশ্চাত্যানুকরণে শিল্পশিক্ষা করে যশস্বী হইয়াছিলেন"[৩৯]। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আলোকচিত্রশিল্পী মন্মথনাথ চক্রবর্তীর উৎসাহে সংগঠিত 'ভারতীয় শিল্প সমিতি'র সভাপতির পদে বৃত হয়েছিলেন গঙ্গাধর। শিল্পী যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথমে তাঁর কাছেই চিত্রশিক্ষা করেছিলেন। তিনি উনিশ শতকের শেষদিকে গতায়ু হন।

গঙ্গাধরের সমসাময়িক প্রমথনাথ মিত্রও প্রতিকৃতি রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রমথনাথ ছিলেন 'স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট'-এর ছাত্র এবং তিনি ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বৃত্তি লাভ করেন। 'হিন্দুমেলা'র প্রদর্শনীতে (১৮৭২) তাঁর ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল। তিনি তৃতীয় 'ক্যালকাটা ফাইন আর্ট এক্‌জিবিশন'-এ কয়েকটি প্রতিকৃতিচিত্র দিয়েছিলেন (১৮৭৯)। তাঁর আঁকা দ্বারকানাথ মল্লিকের একটি প্রতিকৃতি পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরদের সংগ্রহে ছিল। গঙ্গাধর ও প্রমথনাথের প্রতিকৃতি রচনার ধারাকেই অন্নদাপ্রসাদ বাগচী আরও শক্তিশালী করে উনিশ শতকের শেষ অবধি প্রবাহিত রেখেছিলেন।

অন্নদাপ্রসাদের পাশাপাশি আর এক শিল্পী কলকাতায় তাঁর সমকালেই প্রতিকৃতি রচনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি হলেন বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বামাপদ হেন্‌রি লকের অধ্যক্ষতাকালে আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তা ছাড়া তিনি প্রমথনাথ মিত্রের কাছে তেলরঙের ছবি আঁকায় বিশেষ শিক্ষা নিয়েছিলেন। কলকাতার কয়েকটি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে ও পুরস্কৃত হয়ে তিনি উত্তরভারত ভ্রমণে যান। এই সময় অমৃতসর, আম্বালা, দিল্লি, মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা, আলিগড়, গোয়ালিয়র, ভরতপুর ও অন্যান্য স্থানে তখনকার করদরাজ্যের অমাত্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি আঁকেন। এই ভ্রমণকালেই তিনি জয়পুরের মহারাজা সয়াই মাধো সিং-এর ছবি এঁকেছিলেন।

কলকাতায় ফিরে বামাপদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস ৪০
বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রমাধব ঘোষ প্রমুখ বহু বিখ্যাত ব্যক্তির প্রতিকৃতি এঁকে খ্যাতিমান হন। প্রতিকৃতি রচনা ছাড়াও বামাপদ রামায়ণ ও মহাভারত

অবলম্বনে বেশ কিছু ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর আঁকা রঙিন ছবির ওলিওগ্রাফ পদ্ধতিতে করা প্রতিলিপি বসুমতী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে জার্মানি থেকে ছাপা হয়ে এ দেশে প্রচারিত হয়। 'অর্জুন ও উর্বশী' এবং 'উত্তরা ও অভিমন্যু' নামক তাঁর প্রথম ওলিওগ্রাফ ছবিগুলি ছাপা হয় রবি বর্মার ওলিওগ্রাফ ছবিগুলির প্রচারেরও কয়েক বছর আগে (১৮৯০খ্রি)।

প্রতিকৃতি ও পৌরাণিক ছবি ছাড়া, পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থচিত্রণের ক্ষেত্রেও আর্ট স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীরা ইয়োরোপীয় চিত্ররীতিকে সম্প্রসারিত করে এ দেশের সাধারণ মানুষের রুচির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হেন্‌রি লক ও উইলিয়ামজবিন্সের অধ্যক্ষতাকালে যে সব ছাত্র আর্ট স্কুল থেকে বেরিয়েছিলেন তাঁরা আপন আপন প্রতিভা ও দক্ষতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের শেখা চিত্রকলাকে বহন করে নিয়ে গিয়ে ইয়োরোপীয় চিত্রাদর্শকে সর্বত্রগামী করে তুলতে পেরেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের রচনার মান উত্তম ছিল এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু সাধারণভাবে ইয়োরোপীয় রীতির চিত্রকলার চাহিদা যে বেড়েছিল তা জানা যায় আর্ট স্কুলের ১৮৯১-৯২-এর প্রতিবেদন থেকে[৬০]: "ছাত্রপাঠ্য বইয়ের ক্ষেত্রেও শিল্পরুচিবোধ তৈরি হয়েছে। ইয়োরোপীয় রীতিতে চিত্রিত বই এখন একটা কেতা হয়ে উঠছে; আর এনগ্রেভিং, লিথোগ্রাফি, ফোটোগ্রাফি, এচিং-এর চাহিদা সর্ব সময়েই রয়েছে"। চৌরঙ্গির আর্ট স্কুলের পাড়া থেকে এই সব ছবি ছাপাই পদ্ধতিগুলো পৌঁছে গিয়েছিল চিৎপুর-বটতলার বাংলা বই প্রকাশনের জগতেও। আর বটতলার বইয়ের সূত্রে ইয়োরোপীয় চিত্ররীতির এক অপকৃষ্ট সংস্করণ ছড়িয়ে পড়েছিল শহর থেকে বাংলার দূর দূর গ্রামে ও গঞ্জে। চিত্রকলার আদর্শ হিসাবে ইয়োরোপীয় রীতিপদ্ধতি এইভাবেই সকল স্তরের মানুষের ভেতর তার আসন তৈরি করে নিয়েছিল।

২৪ আরনেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেল : চিত্রকলা শিক্ষায় দিকবদল

কলকাতায় ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে 'স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট'-এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৮৯৬-এর ৬ জুলাই আরনেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেল এসে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষপদে যোগদান কবা পর্যন্ত দীর্ঘ চার দশক ধরে বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক শিল্প শিক্ষা একই আদর্শ সামনে রেখে অগ্রসর হয়েছে—আর সে আদর্শ হল ইয়োরোপীয় শিল্প-রীতিপদ্ধতিতে এ দেশের শিল্প-শিক্ষার্থী তরুণদের শিক্ষিত করে তোলা। প্রধানত আর্ট স্কুলের পরিশ্রমী শিক্ষক ও কৃতী ছাত্রদের মাধ্যমেই বাংলা দেশের প্রায় সকল স্তরের মানুষের মধ্যেই ইয়োরোপীয় অ্যাকাডেমিক ধারার বাস্তবধর্মী চিত্রের প্রসার ঘটেছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে। সে সময় ইয়োরোপীয় জীবনচর্যার প্রতি আগ্রহী, ইংরেজি সাহিত্য পাঠে বিমুগ্ধ আর ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় চিন্তার মানবিকতায় অভিভূত বাংলার প্রায় সকল শিক্ষিত মানুষই ইয়োরোপীয় চিত্রকলার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ছিলেন নিঃসন্দেহ। স্বদেশে চিত্রকলার বিকাশ যে ইয়োরোপীয় চিত্রকলার অনুবর্তনের মধ্য দিয়েই হবে—এটাই ছিল সকলের বিশ্বাস। এমন এক পরিস্থিতি ও পরিবেশে আর্ট স্কুলের কর্ণধার হয়ে হ্যাভেল তার এতদিনের প্রচলিত ও পরীক্ষিত শিক্ষাধারা সম্পর্কে প্রশ্ন তুললেন এবং তার মুখ পাশ্চাত্য শিল্পরীতির অনুবর্তনের পরিবর্তে ভারতীয় শিল্প-পরম্পরার দিকে ফেবাতে সচেষ্ট হলেন। হ্যাভেলের এই যুগান্তকারী পদক্ষেপের পিছনে ছিল তাঁর নিজস্ব শিল্পভাবনার ভিত্তিভূমি ও ভারতীয় শিল্পকলার মহৎ ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস।

ভারতীয় শিল্পকলার প্রতি হ্যাভেলের শ্রদ্ধা অর্জিত হয়েছিল কলকাতায় আসার আগেই। ১৮৮৪ থেকে প্রায় এক দশক তিনি ছিলেন মাদ্রাজের গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ। সে সময় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের হয়ে তিনি দক্ষিণের কয়েকটি প্রদেশের পরম্পরাগত শিল্প, বিশেষ করে কারুশিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধানের কাজ করেছিলেন। সেই সূত্রেই ভাবতীয় চারু ও কারুকলার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছিল। তিনি তাঁর নিজস্ব প্রতিভায় ভারতীয় কলাশিল্পের বৈশিষ্ট্য—তার আত্মার দিকটি সম্পর্কে সংবেদনশীল হয়ে উঠেছিলেন। তিনি যেভাবে ভারতীয় কলাশিল্পের নিজস্ব চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তা তাঁর আগে আর কোনো বিদেশী কলারসিক পারেননি। তারও সম্ভবত একটা কারণ আছে। হ্যাভেল নিজে সাউথ কেনসিংটন স্কুলে অ্যাকাডেমিক রীতিতে চিত্রশিক্ষা গ্রহণ করে এবং সেই শিক্ষা অনুযায়ী বেশ কিছু তেলরঙের নিসর্গচিত্র এঁকেও মনে হয় তার মধ্যে কোনো আত্মতৃপ্তি খুঁজে পাননি। তাই তাঁর নিজস্ব অন্বেষণাতেই তিনি অ্যাকাডেমিক প্রকৃতি অনুকারী বাস্তবতার অতিরিক্ত ভাব ও ভাবনার জগতের কলাশিল্পের দিকে ঝুঁকেছিলেন। উনিশ শতকের শেষ দশকগুলিতে ব্রিটিশ রয়াল অ্যাকাডেমি-র নির্ধারিত শিল্পাদর্শের প্রতি যে অনাস্থা রাস্কিনের অনুগামীরা, বিশেষ করে গ্যাব্রিয়েল ডান্টে রোসেটি ও এডওয়ার্ড বার্ন-জোন্সের মতো চিত্রকরেরা এবং উইলিয়াম মরিশের মতো পরম্পরাজাত ব্রিটিশ কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবনপন্থীরা ব্যক্ত করেছিলেন, তার দ্বাবাও বোধ হয় তিনি প্রভাবিত হন। ভিক্টোরীয় অ্যাকাডেমিক চিত্ররীতিতে তৃপ্ত না হয়ে, বরং তার আত্মিক দৈন্য লক্ষ করে তিনি শিল্পবিপ্লবপূর্ব কলাশিল্পের আধ্যাত্মিকতার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর এই মনোভাবই সমর্থন খুঁজে পেয়েছিল ভারতীয় মূর্তিকলা ও কারুশিল্পে। তাই



৪২ অন্তিমশয্যায় শাহজাহান, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯০২ খ্রি

দেখা যায় আর্ট স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করার এক বছরের মধ্যেই স্কুলের পঞ্চবার্ষিক রিপোর্টে (১৮৯২-৯৩ থেকে ১৮৯৬-৯৭) তিনি লিখছেন[৬১] : "সকল শিল্পের ভিত্তিস্বরূপ যে ডিজাইন তার শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত হয়েছে; এবং ড্রয়িং ও পেইন্‌টিং-এর সাধারণ শ্রেণীগুলোতে আগাগোড়া চল্লিশ বছরের পুরনো ইংরেজি প্রাদেশিক শিল্পরীতিই অনুসৃত হয়েছে। ব্যাবহারিক জ্যামিতি, কারিগরি রেখাঙ্কন ও পরিপ্রেক্ষিত শেখানোর সাধারণ ক্লাসেরও ব্যবস্থা ছিল না। প্রাচ্য কলাশিল্প হয়েছে অবহেলিত ; আর তার ফলে ভারতীয় ছাত্ররা ভুল পথে পরিচালিত হয়েছে"।

এই সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই হ্যাভেল নতুন রেগুলেশনের সাহায্যে আর্ট স্কুলের পাঠ্যক্রমকে ঢেলে সাজালেন। তিনি সমস্ত শিল্প শিক্ষাকে দু'ভাগে ভাগ করলেন—১ কারুশিল্প বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট এবং ২ চারুশিল্প বা ফাইন আর্ট। প্রথম বিভাগে নকশা বা ডিজাইনের অনুশীলনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হল। আর তার সঙ্গে এই বিভাগেই প্রাচ্যশিল্প বা ওরিয়েন্টাল আর্ট শেখানোর ব্যবস্থা করা হল। ফাইন আর্ট বিভাগে ইয়োরোপীয় চিত্রকলার শিক্ষাক্রমকেও হ্যাভেল আধুনিকীকরণের মধ্য দিয়ে উন্নত করতে প্রয়াসী হলেন।

হ্যাভেলের মধ্যস্থতায় আর্ট স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাচ্যদেশীয় কলাশিল্পের ওপর গুরুত্ব ক্রমশ নানাভাবে বাড়তে থাকলে স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। বিশেষত তিনি যখন কারু ও প্রাচ্যদেশীয় শিল্প শিক্ষার বিভাগে স্বল্প বেতনহার চালু করলেন তখন বৈষম্যের কারণে এই অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠল। তার ওপর হ্যাভেল যখন আর্ট স্কুলের সংলগ্ন আর্ট গ্যালারিটির সংস্কারসাধনে ব্রতী হয়ে তার ইয়োরোপীয় ভাস্কর্যের প্লাস্টার কাস্ট কপি ও চিত্রের অনুলিপি-প্রধান নিদর্শনগুলিকে বেচে দিয়ে তার জায়গায় ভারতীয় পরম্পরাগত কারু ও চারুশিল্পের নিদর্শন রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন ছাত্রদের এই অসন্তোষ কলকাতার পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। দেশী পত্র-পত্রিকাগুলিতে এই মর্মে সমালোচনা হল যে হ্যাভেল ভারতীয় শিল্প-শিক্ষার্থী ছাত্রদের ইয়োরোপীয় কলাশিল্পের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে তাদের এবং এ দেশের শিল্পকলা চর্চার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে পরে হ্যাভেল স্বয়ং লিখেছিলেন[৬২]: "আমি অ্যান্টিক ক্লাস তুলে দিয়ে ভারতীয় শিল্পকে শিক্ষার ভিত করে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যস্ত করেছিলাম। এই পরিবর্তনের ফল হয়েছিল সাংঘাতিক। বাঙালিরা চরিত্রগত ভাবে রক্ষণশীল···দলে দলে ছাত্ররা স্কুল থেকে বেরিয়ে যায়, ময়দানে জনসভা করে ও সরকারের কাছে আমার বিরুদ্ধে গণ-স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ পত্র দেয়; এইসঙ্গে "প্রগতিশীল" সংবাদপত্রগুলি আমার বিরুদ্ধে অগ্ন্যুদগার করতে থাকে"। সরকারি কর্তৃপক্ষ যে হ্যাভেলেব নতুন পদক্ষেপগুলিকে সমর্থন করছিলেন এমন নয়। কিন্তু আর্ট স্কুলের শিক্ষাক্রমের বিষয়ে ইতিপূর্বে যেমন এ সময়েও তেমনি স্কুলের অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তকে তাঁরা মেনে চলেছিলেন। কিন্তু ছাত্রদের ব্যাপার স্বতন্ত্র। হ্যাভেলের কার্যকলাপ বন্ধ করতে না পেরে অনেকেই স্কুল ছেড়ে দিয়ে স্কুলের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রণদাপ্রসাদ গুপ্তের নেতৃত্বে, মহারানী ভিক্টোরিয়ার শাসনকালের হীরকজয়ন্তী বছরে প্রতিষ্ঠিত (১৮৯৭), জুবিলি আর্ট আকাডেমি-তে ভর্তি হলেন। রণদা গুপ্তের পরিচালনায় জুবিলি আর্ট আকাডেমি পরবর্তী তিন দশক ধরে কলকাতার বুকে ইয়োরোপীয় রীতির চিত্র ও ভাস্কর্য অনুশীলন অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে অনেক শিল্পীই পরবর্তীকালে যশোমান হন। শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে ইয়োরোপীয় চিত্রকলার সমাদর সেসময় এমনই ছিল যে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কলকাতার বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি জুবিলি আর্ট আকাডেমির প্রতিষ্ঠায় অর্থদান করে সহায়তা করেন।

কিন্তু প্রতিবাদ অথবা বিরুদ্ধতা কিছুই হ্যাভেলকে দমিত করতে পারেনি। তিনি সরকারি আর্ট স্কুলের চত্বরে ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের ভিত্তি স্থাপনে প্রয়াসী হলেন। আর তাঁর এই ব্রতে সহযোগীর ভূমিকা নেওয়ার জন্যে তিনি আহ্বান জানালেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির উদীয়মান শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। তাঁর ডাকেই গিলার্ডি অবসর নিলে তাঁর জায়গায় আর্ট স্কুলের উপাধ্যক্ষের পদে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট যোগদান করলেন অবনীন্দ্রনাথ।

২৫ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের অবদান যে কতখানি তা সকলেরই জানা। দ্বারকানাথের আমল থেকেই প্রায় সমস্ত উনিশ শতক জুড়ে, এই পরিবারের কর্তাব্যক্তিরা সাহিত্য ও সংগীতের সঙ্গে নানাভাবে কলাশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা বা চর্চা করেছিলেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এ দেশে পাশ্চাত্য চিত্র যাঁরা সর্বপ্রথম সংগ্রহ করেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন দ্বারকানাথ। তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথও দেশী ও বিদেশী শিল্পীদের দিয়ে পারিবারিক প্রতিকৃতি আঁকিয়ে নিয়েছেন থেকে থেকেই। অবনীন্দ্রনাথের পিতা গুণেন্দ্রনাথ ও অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথ ছবি আঁকা শিখেছিলেন নিয়মমতো, তাঁর জ্যেষ্ঠতাত এবং রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁর পেন্‌সিল ড্রয়িং-এ প্রতিকৃতি আঁকার জন্য সুপরিচিত। অবনীন্দ্রনাথ নিজেও উনিশ শতকের শেষ দশকের প্রথম দিকে রীতিমতো ড্রয়িং. প্যাস্টেল, অয়েল পেইন্‌টিং ও জলরঙের কাজ শিখেছিলেন প্রথমে গিলার্ডি ও পরে চার্লস পামার নামক এক ব্রিটিশ চিত্রকরের কাছে। তিনি বাড়িতে স্টুডিয়ো গড়ে নিয়ে নর্থ লাইট বা উত্তরের আলোয় ইয়োরোপীয় কেতায় ছবি আঁকা শুরুও করেছিলেন। কিন্তু কিছুকাল অ্যাকাডেমিক রীতিতে ঘষে ঘষে ক্যানভাসে তেলরঙে ছবি করার পর তাঁর উৎসাহে ভাটা পড়েছিল। এইভাবে কাজ করায় হাতের দক্ষতা যতই বাড়ুক মন তাঁর কিছুমাত্র তৃপ্তি পাচ্ছিল না। তিনি একটা নতুন পথ খুঁজছিলেন—যেটা তাঁর নিজের মতো হবে। ঘটনাচক্রে সেই সময়েই তাঁর হাতে আসে আইরিশ ইল্যুমিনেশান আর মুঘল মিনিয়েচারের কিছু নিদর্শন। অবনীন্দ্রনাথ অনুভব করলেন, তাঁর প্রকৃত আত্মপ্রকাশ ঘটতে পারে এই ক্ষুদ্রায়তন মিনিয়েচার ছবিতেই। কী নিয়ে ছবি আঁকবেন—এই যখন তাঁর চিন্তা তখন তাঁর কাকা রবীন্দ্রনাথ উপদেশ দিলেন বৈষ্ণব পদাবলীকে অবলম্বন করতে। এই নতুন ভাবনায় জলরঙে প্রথম যে ছবিটি তিনি আঁকলেন তা হল গোবিন্দদাসের পদ "পৌখলী রজনী পবন বহে মন্দ।/চৌদ্দিশে হিমকর, হিম কক বন্দ।।"-বর্ণিত 'অভিসারিকা'—যা তাঁর পরবর্তীকালের অধিক পরিচিত 'অভিসারিকা' ছবিটি থেকে আলাদা করার জন্যে 'শ্বেত অভিসারিকা' নামে খ্যাত। যেন নতুন এক পথ খুঁজে পেয়েই অশেষ যত্নে, স্বল্পায়তনের পটে, ভঙ্গুর ভঙ্গিমায় বছর দুয়েক ধরে পদাবলী অবলম্বনে তিনি আঁকলেন তাঁর 'কৃষ্ণলীলা' সিরিজ। এই সিরিজেই এক অর্থে শুরু আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার জয়যাত্রা। আর এই ঘটনাটি ঘটে হ্যাভেল কলকাতায় আসার আগেই—১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে[৬৩]।

এই কৃষ্ণলীলা সিরিজ দেখার সূত্রেই হ্যাভেলের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে। এই দুই মানুষ কয়েক হাজার মাইল দূরের দুই দেশে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে জন্মে ও বড় হয়েও একই উদ্দেশ্যে মিলিত হয়েছিলেন এবং পরস্পরের সহযোগিতায় সেই উদ্দেশ্যে অভাবনীয় সফলতা অর্জন করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যটা অবশ্যই পাশ্চাত্য রূপকলার বন্ধন থেকে মুক্ত করে আধুনিককালের ভারতীয় রূপকলার চর্চাকে প্রাচ্যধারায় সমৃদ্ধ করে তোলা। হ্যাভেল তাঁর সকল শক্তি নিয়োগ করেছিলেন ভারতীয় কলাশিল্পের স্বরূপকে সকলের কাছে, বিশেষ করে ইয়োরোপের কলা-রসিকদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে বিশ্বের কলাশিল্পে তার বিশিষ্ট অবদানের গুরুত্ব প্রমাণ করতে। অবনীন্দ্রনাথের প্রয়াস ছিল আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে নতুন যুগের ভারতীয়

কলাশিল্পকে প্রাচ্যমুখী করে তোলা এবং তার ভিত্তিতে, স্বকীয় চরিত্রে সেই চিত্রকলার নানামুখী
বিকাশ ঘটানো। ১৮৯৭ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ একযোগে নতুন দৃষ্টি নিয়ে
ভারতীয় কলাশিল্পের অনুশীলন করেছিলেন। হ্যাভেলের কাছেই অবনীন্দ্রনাথ পাঠ নিয়েছিলেন
মুঘলচিত্রকলার—যে চিত্রকলার কাঠামো আর আদলে তিনি তাঁর নিজস্ব চিত্ররীতি গড়ে তোলার
সিদ্ধান্ত নেন। তাই হ্যাভেলকে অবনীন্দ্রনাথ গুরু বলে মেনেছিলেন; হ্যাভেল তাঁকে গ্রহণ
করেছিলেন সহযোগী হিসাবে; কখনও সস্নেহে বলেছেন 'চেলা'।

হ্যাভেলের উদ্যোগে আয়োজিত গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের
চিত্র-প্রদর্শনীতেই অবনীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিত্র বিশেষ সম্মানে প্রথম জনসমক্ষে তুলে ধরা
হয়েছিল। এই ছবিগুলির মধ্যে ছিল 'পদ্মাবতী'-নামক ও 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' সিরিজের কিছু
ছবি। এরপর তাঁরই মাধ্যমে 'দিল্লি দরবার' উপলক্ষে আয়োজিত দিল্লির ১৯০২-০৩-এর
রাজকীয় প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথের তিনটি ছবি প্রেরিত ও প্রদর্শিত হয়। এই দরবার-
প্রদর্শনীতে তাঁর কাঠের পাটার ওপর তেলরঙে আঁকা মুঘল বিষয় ও মুঘল আদর্শ অনুগামী
'অন্তিমশয্যায় শাহজাহান' ছবিটি পুরস্কৃত হলে অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতি সরকারি ও বেসরকারি ৪১
মহলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এক বছরের ছুটি নিয়ে হ্যাভেল ইংল্যান্ডে গিয়ে লন্ডনের বিখ্যাত 'দি
স্টুডিয়ো' পত্রিকায় ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় চিত্রকলা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন যার
প্রধান আলোচ্য ছিল অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকৃতি[৬৪]। এই প্রবন্ধের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের যে ছটি ছবি
মুদ্রিত হয় তার মধ্যে ছিল 'বুদ্ধ ও সুজাতা' এবং 'অভিসারিকা'র মতো গুরুত্বপূর্ণ ছবি।
কলকাতায় ফিরে পূর্ণোদ্যমে বছর তিনেক কাজ করার পর হ্যাভেল মানসিক অসুস্থতার কারণে
ছুটি নিয়ে ইংল্যান্ডে চলে যেতে বাধ্য হন এবং তারপর তিনি আর কোনোদিনই এ দেশে
আসেননি। কিন্তু ইংল্যান্ডে থেকে তিনি তাঁর রচনার মাধ্যমে ভারতীয় কলাশিল্পের শ্রেষ্ঠ
ইতিবাচক ব্যাখ্যাতার ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সবসময়েই তিনি প্রচার করেছেন
অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নব্য-ভারতীয় চিত্রকলার।

'অভিসারিকা' ও 'বুদ্ধ ও সুজাতা'র মতো ছবিগুলি অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন জলরঙে—বলা ১৮
বাহুল্য, যেমন করণকৌশল তিনি শিখেছিলেন তাঁর ইংরেজ শিক্ষক চার্লস পামারের কাছে, তার
মাধ্যমেই। কিন্তু রূপ-নির্মিতিতে তিনি দুটি ছবিতেই ভারতীয়ত্ব অর্জন করতে পেরেছিলেন। কী
ভাব, কী ভঙ্গিমায়, যেমন অভিসারিকা রাধা, তেমনই সুজাতা ও বুদ্ধ এ দেশের চিত্রকলায় বর্ণিত
রূপাদর্শের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। তা ছাড়া যদি সে সময় বহুল প্রচলিত নিম্নমানের কালকাটা আর্ট
স্টুডিয়ো-তে ছাপা, অথবা এমন-কি তার চেয়ে অনেক উন্নতমানের বোম্বাই থেকে ওলিওগ্রাফ
পদ্ধতিতে ছেপে-আসা রাজা রবি বর্মার রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীভিত্তিক ছবিগুলির সঙ্গে
তুলনা করা যায়, তা হলে অবনীন্দ্রনাথের ছবির বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়বে। আর্ট স্টুডিয়ো
বা রবি বর্মা ভারতীয় মহাকাব্যের ঘটনা-দৃশ্য এঁকেছিলেন ইয়োরোপীয় চিত্ররীতি
অনুসরণে—সবকিছুকে চর্মচক্ষুতে দেখা বস্তুজগতের বিশ্বস্ততায়। ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের
আদর্শে, মঞ্চাভিনয়ের নাটকীয়তায় তারা পরিকল্পিত। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছেন অন্য
একভাবে—চর্মচক্ষু অপেক্ষা ভারতীয় সাধনায় যাকে বলে ধ্যানচক্ষু তাকেই নির্ভর করতে সচেষ্ট
হয়েছেন তিনি।

হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের 'ধর্মযুদ্ধ'ই ছিল রাজা রবি বর্মা অনুসৃত ইয়োরোপীয় করণকৌশল
ও বাস্তবধর্মিতায় ভারতীয় মানসলোককে সমৃদ্ধ করে রেখেছে যে সব পুরাণকথা ও
কাব্য-কাহিনী তাদের দৃশ্যাবলি আঁকার বিরুদ্ধে। উনিশ শতকের শেষ কয়েক বছর এই ধারায়

ছবি এঁকে আর সেই ছবি উন্নত ওলিওগ্রাফ পদ্ধতিতে ছাপিয়ে সারা দেশ জুড়ে অল্পদামে ছড়িয়ে দিয়ে রবি বর্মা যে খ্যাতি ও মর্যাদা সকল স্তরের মানুষের মধ্যে লাভ করেছিলেন, তা ছিল তুলনাহীন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রতিভাবান সাহিত্য ও শিল্প সমালোচক বলেন্দ্রনাথ, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ওলিওগ্রাফে ছাপা ছবির মাধ্যমে বহুল প্রচারিত হওয়ার আগেই, 'সাধনা' (আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০০) পত্রিকায় 'রবি বর্মা' নামে যে নিবন্ধটি লিখেছিলেন তা থেকে বোঝা যায় সুদূর দক্ষিণভারতের এই শিল্পী তখনকার রুচিশীল বাঙালি সমাজে কতখানি সমাদর লাভ করেছিলেন। এই নিবন্ধে বলেন্দ্রনাথ শরীরের গঠনপারিপাট্য, বর্ণবিন্যাসে সৌন্দর্যবোধ ও ভাবহীন কলকাতার আর্ট স্টুডিয়োর পৌবাণিক ছবিগুলির তুলনায় রবি বর্মার আঁকা পৌরাণিকী ছবির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন[৬৫]: "একটি যথার্থ চিত্রকরী প্রতিভা, যে কেবল কপি না করিয়া সৌন্দর্য্য অনুভব ও প্রকাশ করিতে পারে, যে মধুপের মত পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া গিয়া সৌন্দর্য্য চয়ন করিয়া আনে এবং সেই সৌন্দর্য্যের চাক বাঁধিয়া চিত্ত হরণ করিতে জানে। এই প্রতিভা রবি বর্মা। ···পৌরাণিক চিত্র এমন সুন্দরভাবে এদেশে ইতিপূর্বে কখনও অঙ্কিত হয় নাই। এবং খুঁটিনাটি ত্রুটি থাকিলেও রবি বর্মাই এদেশের প্রথম প্রতিভাশালী শিল্পী"। কিন্তু রবি বর্মার এই সব ছবি দেখেই বিরূপ হয়েছিলেন হ্যাভেল, মন্তব্য করেছিলেন[৬৬]: "ভারতের সব থেকে ভাবকল্পনাশ্রয়ী কাব্য ও রূপকের চিত্ররূপায়ণে কবিত্ব শক্তির এমন অভাব বেদনাদায়ক; এবং এই মৌলিক দোষ বচনাকর্মের কোনো করণকৌশলগত দক্ষতা দিয়েই পূরণ হয় না"। হ্যাভেলের মতো অবনীন্দ্রনাথও রবি বর্মার মডেলের সাহায্য নিয়ে আঁকা অতিনাটকীয় বর্ণাঢ্য ছবিগুলির আতিশয্য ভারতীয় রূপাদর্শ বিরোধী বলেই মনে কবেছেন। সেই কারণেই ভাবকল্পনা সমৃদ্ধ তাঁর প্রথম পর্যায়ের ছবিগুলিতে অবনীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত শৈলীর বিকাশ এবং তাঁর প্রবর্তিত নব্য-ভারতীয় চিত্ররীতির বিবর্তনে বিশ শতকের সূচনাকালের দুটি ঘটনা বিশেষভাবে ছাপ ফেলেছিল। একটি হল বাংলার স্বদেশী আন্দোলন; দ্বিতীয়টি জাপানি পরম্পরাগত চিত্রকলার মহান প্রবক্তা ওকাকুরা কাকুজো-র সংস্পর্শ লাভ। ঠাকুরবাড়ির সন্তান হিসাবে অবনীন্দ্রনাথ আবাল্য স্বদেশী ভাবনার মধ্যেই মানুষ হয়েছিলেন। বিশেষত উনিশ শতকের শেষ কয়েক দশকে যে দুই বাঙালি মনীষী নবগোপাল মিত্র ও রাজনারায়ণ বসু এই স্বাদেশিকতার ভাব প্রচার করেছিলেন তাঁরা ছিলেন ঠাকুরবাড়ির সুহৃদ এবং তাঁদের এই প্রচেষ্টায় ঠাকুরবাড়ির অনেকেরই ছিল সক্রিয় সমর্থন। কার্জনের শাসনকালে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব ও সেই প্রস্তাবকে কার্যকর করার ফলে যে জাতীয়তাবোধ সে সময় আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং যার অন্যতম প্রধান প্রবক্তাই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁব বিশিষ্ট সহযোগী ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। ফলে তিনিও স্বদেশী আন্দোলনের সর্বব্যাপী প্রভাবে ব্রতী হয়েছিলেন স্বদেশী ভাব-ভাবনা ও রীতিতে এক নতুন চিত্রশৈলী উদ্ভাবন করতে। এই ভাবনা থেকেই জন্ম নিয়েছিল 'বঙ্গীয় কলা সংসদ' (১০ জুন, ১৯০৫)—যার সভাপতি হন অন্নদাপ্রসাদ বাগচী এবং সম্পাদক অবনীন্দ্রনাথ।

এর কয়েক বছর আগেই, ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ভগিনী নিবেদিতার মাধ্যমে জাপানি দার্শনিক-শিল্পী ওকাকুরা কাকুজোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন ঠাকুর পরিবারের সৃজনশীল ব্যক্তিরা। ওকাকুরা তাঁদের উদ্দীপ্ত করলেন এক নতুন ভাবনায়—এশিয়া এক, এশিয়ার আত্মিক স্বরূপ অভিন্ন। এই ভাবনারই সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথের ব্যবস্থায় ওকাকুরা দেশে ফিরে পাঠিয়ে দিলেন তিনজন জাপানি শিল্পীকে—ইওকোয়ামা টাইকান, যোশিও কাৎসুতা ও হিসিদা সুনসো। এঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন পরম্পরাগত জাপানি চিত্রকলা ও নবঘোষিত ভারতীয় চিত্রকলার মধ্যে সেতু

রচনা করতে। অসুস্থতার জন্য কাৎসুতাকে দেশে ফিরে যেতে হয়। টাইকান ও হিসিদা বেশ কিছুকাল জোড়াসাঁকোয় থেকে একদিকে যেমন চিত্রকলা অনুশীলন করলেন অবনীন্দ্রনাথের কাছে, অন্যদিকে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথ তাঁদের কাছ থেকে শিখলেন জাপানি কালি-তুলি আর ওয়াশের কাজ। এইভাবে প্রাচ্য চিত্ররীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিত হলেন অবনীন্দ্রনাথ। ব্রিটিশ রীতির স্বচ্ছ জলরঙের শিক্ষা, জাপানি ওয়াশ পদ্ধতি আর নিজস্ব অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে তিনি তাঁর 'ওয়াশ টেক্‌নিক' বা 'ধৌত চিত্ররীতি' প্রবর্তন করেন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের আগেই।

২৬ নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার সূচনা : প্রথম পর্বের শিল্পীবৃন্দ

অবনীন্দ্রনাথ সরকারি আর্ট স্কুলের উপাধ্যক্ষের পদে যোগ দেন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে আর সেই পদে ইস্তফা দেন ১৯১৫-তে। এই দশ বছর বাংলার চিত্রকলা জগতে প্রধান পুরুষ ছিলেন তিনি। বিশেষত ১৯০৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে মানসিক অসুস্থতার কারণে হ্যাভেল কলকাতা ত্যাগ করার পর মূলত তাঁর নেতৃত্বেই নব্য-ভারতীয় তথা প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা দেশে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই দশ বছরে নব্য-ভারতীয় চিত্ররীতি যা পরবর্তীকালে পশ্চিম ভারতের শিল্পীদের অস্বীকৃতির কারণে এখন নব্য-বঙ্গীয় বা নিও-বেঙ্গল শৈলী নামে পরিচিত, একদিকে তার ভিত্তিকে যেমন দৃঢ়মূল করেছে—অন্যদিকে তেমনই তার পরিকাঠামোকে করেছে সম্প্রসারিত। আর তা সম্ভব হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের নিষ্ঠা, শ্রম ও সাধনার মধ্য দিয়ে। তিনি এই দশ বছর তাঁর কর্মধারাকে তিন দিকে প্রবাহিত করেছিলেন। প্রথমত, এই সময়ের মধ্যেই তাঁর যে নিজস্ব চিত্ররীতি তাকে তিনি এক নির্দিষ্ট চরিত্রদানে সক্ষম হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, এই দশ বছরেই তিনি তাঁর প্রথম সারির ছাত্রদের তাঁর যোগ্য উত্তরসাধক হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। তৃতীয়ত, সংগঠকের ভূমিকা নিয়ে তাঁর নব-প্রবর্তিত শিল্পধারাকে তিনি দেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে সে সময়ের সবথেকে প্রতিনিধিমূলক ভারতীয় শৈলীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন।

১৯০৫ নাগাদই অবনীন্দ্রনাথ জয়পুররীতিতে আর্ট স্কুলের দেয়ালে ভিত্তিচিত্র আঁকলেন—'কচ ও দেবযানী'। এটি তাঁর প্রথম দিককার একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। কিন্তু সম্ভবত কী সামাজিক তাৎপর্য কী তাঁর নিজস্ব শৈলীর বিকাশে আরও গুরুত্বপূর্ণ হল 'ভারতমাতা' (১৯০৫ খ্রি) ছবিটি। এই ছবিতে তিনি তাঁর ওয়াশ পদ্ধতিতে তখনকার স্বদেশী আন্দোলনের ভাবপ্রবণতায় দেশমাতৃকার 'প্রতিমা' রূপ দিয়েছেন। ছবিতে এক এক বার রঙের কাজ করে, সেই রং শুকিয়ে নিয়ে, জল দিয়ে ধুয়ে, যে পেলব কোমল সুষমা সৃষ্টি করা যায় তার এক বিশিষ্ট উদাহরণ এই 'ভারতমাতা'। এই ধৌত বা ওয়াশ পদ্ধতিতেই অবনীন্দ্রনাথ পারস্যের কবি ওমর খৈয়ামের রুবায়ৎ অবলম্বনে আঁকলেন এক সিরিজ ছবি (১৯০৬-১১)। ওমর খৈয়াম চিত্রমালাতেই তাঁর স্বকীয় চিত্ররীতি ও শৈলী প্রথম এক সুস্পষ্ট চেহারা নিল। অবনীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল মুঘল মিনিয়েচারের কাঠামো আর রূপসজ্জার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে নির্দেশিত 'ভাব' যুক্ত করে রসসমৃদ্ধ ছবি করা। কেননা তিনি দেখেছিলেন মুঘলচিত্রকলায় মানবমানবী যতখানি বাস্তবসম্মত ও রূপোজ্জ্বল ততখানি ভাববিশিষ্ট নয়। তাই তিনি তাঁর নিজস্ব অভীষ্টে আঁকলেন 'অন্তিমশয্যায় শাহজাহান' (১৯০২) আর 'শেষের বোঝা'র (১৯১২) মতো ছবি। প্রথম ছবিটি, যেমন বন্দী ও অসহায় বৃদ্ধ সম্রাটের দূরের তাজের দিকে চেয়ে থাকার দৃশ্যে দর্শকের মন বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তেমনই দিনান্তবেলায় ঊষর মরুভূমির বুকে বোঝা পিঠে ক্লান্ত উট হাঁটু গেড়ে শেষবারের মতো বিশ্রাম নিতে চলেছে—এমন দৃশ্যও তাঁকে অভিভূত না করে পারে না। ওমর খৈয়াম সিরিজের ছবিগুলিতে এই ভাব সৃষ্টি করেছেন তিনি নানা মাত্রায় তাঁর নিজস্ব পরিশীলিত নিম্নস্বরে। আলোছায়ার দ্বন্দ্বকে প্রকট না করে রেখা ও বর্ণকে সংযত রেখে তিনি পেলব কোমল পরিবেশে রুবায়তের পাত্রপাত্রীদের সামান্যতম ভাবক্রিয়ায় রূপ দিয়েছেন।



৪৩ সতী, নন্দলাল বসু, ১৯০৭ খ্রি

অবনীন্দ্রনাথ ১৯১১-তে ওড়িশ্যা ভ্রমণে যান। পুরী ও কোনারকের স্থাপত্য ও মূর্তিকলার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের ফলেই যেন মনে হয় তখন থেকে তাঁর ছবি রূপমণ্ডনগুণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। 'অশোকের রানী', 'দেবদাসী', 'কাজরী নৃত্য'-তে ওমর খৈয়াম সিরিজের ধূসর অস্পষ্টতার বদলে সুস্পষ্ট রূপ-নির্মিতির একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে বঙ্গ রঙ্গালয়ের নটনটীদের ছবিগুলিতে সুডৌল মূর্তিসুলভ দেহরূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এইভাবেই, ১৯০০ থেকে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আঁকা ছবির মাধ্যমে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শৈলীর চরিত্র নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের আর্ট স্কুলে যোগদানের বছর থেকে প্রথম কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর প্রথম সারির ছাত্ররা আর্ট স্কুলে ভরতি হন। তাঁর এই ছাত্ররা হলেন সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, দুর্গেশচন্দ্র সিংহ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, কে ভেঙ্কটাপ্পা, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শৈলেন্দ্রনাথ দে, হাকিম মহম্মদ খান প্রমুখ। এঁদেরই হাতে তাঁর চিত্রশৈলী একদিকে যেমন দৃঢ় ভিত্তিভূমি লাভ করেছে, অন্যদিকে নানা পথে সম্প্রসারিত হতে পেরেছে। এই প্রথম পর্বের ছাত্রদের ওপর তাঁর ব্যক্তিত্বের ও শিক্ষার প্রভাব যতখানি গভীর ও স্থায়ী তেমন তাঁর পরবর্তী পর্বের ছাত্রদের ওপর নয়। এঁদের চিত্রকলাকে বুঝতে হলে এবং অবনীন্দ্রনাথের শৈলীর বৈশিষ্ট্যকে অনুধাবন করতে হলে অবনীন্দ্রনাথ এঁদের কীভাবে ছবি আঁকা শিখিয়েছিলেন তা জানা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে নন্দলাল বলছেন[৬৭]: "ছবি আঁকার বিশেষ কোনো পদ্ধতি না শেখালেও আমরা তাঁর ছবি আঁকা দেখে নূতন নূতন ছবি আঁকা শুরু করেছিলাম। তখন জানতেও পারি নি, কি করে ছবি আঁকতে শিখলাম। তাঁর ছবি শেখানোর এমনই সহজ পদ্ধতি ছিল"। অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য চিত্রবিদ্যা শিক্ষার নিয়মে ড্রয়িং, নেচার স্টাডি, লাইফ স্টাডি ইত্যাদি একে একে না শিখিয়ে ছাত্রদের তাঁর নিজের ছবি আঁকা দেখে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছেন। অসিতকুমারের সাক্ষ্য থেকেও জানা যায় অবনীন্দ্রনাথ ছাত্রদের সামনে বসে কাজ করার মধ্যে দিয়ে তাঁদের নিজের নিজের কল্পনাশক্তি ও রুচিকে উন্নত করে তুলতে অনুপ্রাণিত করতেন[৬৮]। তিনি কোনো সময়েই তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা তাঁদের আচ্ছন্ন করতে চাইতেন না। নন্দলাল ও অসিতকুমারের লেখা থেকে বোঝা যায় তাঁদের গুরুর লক্ষ্য ছিল তাঁদের শিল্পীব্যক্তিত্বকেই তৈরি করে দেওয়া। এই কারণে শিল্প রচনার একটা উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিই ছিল তাঁর এবং হ্যাভেলের উদ্দেশ্য। আর্ট স্কুলের ঘরের দেয়ালে দেয়ালে তখন ভালো ভালো মুঘল, পারসিক, রাজপুত, তিব্বতি ছবি টাঙানো থাকত। তা ছাড়া তিনি ছাত্রদের বলতেন সংলগ্ন মিউজিয়মে গিয়ে সেখানকার মূর্তি ও সেই সঙ্গে কর্মরত মানুষগুলিকে ভালো করে লক্ষ করতে—যাতে কেবল আদর্শ রূপই নয়, মানুষের প্রতিদিনের বাস্তব চেহারাটার সঙ্গেও তাঁদের পরিচয় ঘটে। এরও অতিরিক্ত ছিল ভারতীয় চিরায়ত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করে তোলার ব্যবস্থা। পণ্ডিত রেখে ছাত্রদের শোনানো হত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কাব্য, এমন-কি অলংকারশাস্ত্রের মূল কথাগুলি। অবনীন্দ্রনাথ নিজেও মুখে মুখে গল্পের ছলে ছাত্রদের দেশী ছবি ও মূর্তির সঙ্গে বিদেশী ছবি ও মূর্তির তফাত কোন্‌খানে তা বুঝিয়ে দিতেন। মনে হয়, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের গুরু-শিষ্য পরম্পরার আদর্শ সামনে রেখেই তিনি তাঁর ছাত্রদের চিত্রবিদ্যা শিখিয়েছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের তুলনায় তাঁর ছাত্রদের পক্ষে ভারতীয় রীতিতে ছবি আঁকা ছিল অনেক সহজ কাজ। কেননা, অবনীন্দ্রনাথের চিত্রশিক্ষা ছিল পাশ্চাত্যরীতিতে; সেই রীতির শিক্ষাকে সম্বল করে অথচ তার কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে, এক নতুন রীতি ও আদর্শে ছবি আঁকার কঠিন সাধনা তাঁকে করতে হয়েছে। অন্যদিকে তাঁর ছাত্ররা গোড়া থেকেই তাঁর কাছে ভারতীয় শিল্পাদর্শের শিক্ষা ও পরিচয় লাভ করেছেন। তা ছাড়া অবনীন্দ্রনাথের উদ্যোগেই আর্ট স্কুলের
শিক্ষক হয়ে এসেছিলেন মুঘল পরম্পরার পাটনা কলমের শিল্পী লালা ঈশ্বরীপ্রসাদ (১৯০৬)। ৪৪
ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে পেলেন ভারতীয় মিনিয়েচার-চিত্রের করণকৌশল শিক্ষা। অনতিবিলম্বেই এর ফলে সুরেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার প্রমুখ শিল্পীদের হাতে ভারতীয় মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারত, পুরাণ, কালিদাসের কাব্য ইত্যাদি নির্ভরচিত্র রচিত হতে থাকল। ভগিনী নিবেদিতার ব্যবস্থায় এবং অবনীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় লেডি হ্যারিংহামের সহযোগী হিসাবে নন্দলাল, অসিতকুমার, ভেঙ্কটাপ্পা ও সমরেন্দ্রনাথ অজন্তা-চিত্রের অনুলিপি



৪৪ গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর (হাতির দাঁতের ওপর আঁকা ছবি), ঈশ্বরীপ্রসাদ, ১৯১০ খ্রি

করার মধ্য দিয়ে (১৯০৯) ভারতীয় চিত্রের রূপাদর্শকে প্রত্যক্ষভাবে অনুশীলনের সুযোগ পেলেন। এর ফলে এঁদের ছবিতে—স্পষ্টতরভাবে নন্দলালের ছবিতে—অজন্তার ভিত্তিচিত্রের রূপবিন্যাস ও নরনারীর রূপসৌষ্ঠব আদর্শ হিসাবে গৃহীত হল।

প্রথম থেকেই সুরেন্দ্রনাথ ও নন্দলাল ছবি আঁকার ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। স্বল্পায়ু সুরেন্দ্রের জীবনাবসান হয় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে। মাত্র চার বছরের মধ্যে তিনি এমন কয়েকটি ছবি এঁকেছিলেন যা প্রদর্শিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্ররসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর বখতিয়ার খলজির আক্রমণে 'লক্ষ্মণসেনের পলায়ন' ছবিটি চিত্র হিসাবে প্রশংসিত হয়, কিন্তু চিত্রিত ঘটনটির ঐতিহাসিক সত্যতা সন্দেহাতীত নয় বলে শিল্পী সমালোচকদের লক্ষ্য হয়ে ওঠেন। তাঁর 'মহাভারত লিখন', 'রাজা নহুষের পতন', 'কার্তিকেয়', 'রামের সমুদ্রশাসন' প্রমুখ ছবি খ্যাতি লাভ করে।

নন্দলাল ও তাঁর সহপাঠীরা পাঁচ বছর আর্ট স্কুলে শিক্ষা নিয়ে ১৯১১ নাগাদ বেরিয়ে আসেন। ওই পাঁচ বছরের মধ্যেই তাঁরা শিল্পী হিসাবে কতখানি কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তা অনুমান করা যাবে তাঁদের সে সময়ে আঁকা ছবি থেকে। ১৯০৬ থেকে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নন্দলাল আঁকেন 'সতীর দেহত্যাগ', 'গরুড়স্তম্ভের পাদমূলে চৈতন্য', "সতী" , 'আহত মরাল হাতে ৪০
সিদ্ধার্থ'-এর মতো স্মরণীয় ছবি। এরপর ১৯০৯-এ অজন্তা ঘুরে এসে তিনি আঁকলেন 'শিব ও সতী', 'জতুগৃহদাহ', 'অহল্যার শাপমুক্তি', 'জগাই-মাধাই' ও অন্যান্য ছবি। তারপর ১৯১৫-এর মধ্যে আরও যুক্ত হল 'পার্থসারথি', 'শিব মুখমণ্ডল', 'শিবের বিষপান', 'যম ও নচিকেতা', 'মহাপ্রস্থানের পথে যুধিষ্ঠির' প্রমুখ চিরায়ত চিত্রাবলি। এই সব ছবিতে, বিশেষ করে পার্থসারথি, জতুগৃহদাহ এবং শিবের বিষপান-এ নন্দলাল অজন্তার ছবির মানবরূপকে তার ক্লাসিক বৈশিষ্ট্যে গ্রহণ করেছেন। নব্য-ভারতীয় চিত্রকলার চরিত্র নির্ধারণে তাঁর এই ছবিগুলি যে গুরু অবনীন্দ্রনাথের ছবির মতোই গুরুত্বপূর্ণ সে কথা সবাই স্বীকার করেন।

নন্দলালের ছবির বাঁধুনি এবং রূপ-নির্মিতির গড়ন প্রধানত ক্লাসিক চরিত্রের। তুলনায় অসিতকুমারের ছবিতে দেখা যায় এক গীতিধর্মী রোমান্টিক মনের প্রকাশ। সূক্ষ্ম, ভঙ্গুর অথচ সুনির্দিষ্ট রেখার বন্ধনে আলোচ্য সময়ের মধ্যে আঁকা তাঁর 'জাগ্রত ভারতমাতা', 'পূজারিণী', 'পদ্মফুল' ও অন্যান্য ছবিতে এই গীতিধর্মিতা সুস্পষ্ট। ভেঙ্কটাপ্পা তাঁর 'রামচন্দ্রের সেতুবন্ধ', 'সীতার বিবাহ', 'দময়ন্তী' প্রমুখ ছবিতে এক লৌকিক মেজাজ আনলেন। তিনি ছিলেন সংগীতজ্ঞ শিল্পী। নিসর্গচিত্র ও মূর্তিকলায় তিনি পরবর্তী কালে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তবে সম্ভবত নন্দলালের পর এই শিল্পীগোষ্ঠীর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ চিত্রকর হলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রজীবনেই স্বকীয় বাক্‌রীতি আবিষ্কার করে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। এই পর্বে আঁকা 'পর্বতকন্যা পার্বতী', 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা', 'অর্জুন ও উর্বশী', 'শ্রীরাধার অভিসার' ও অন্যান্য কয়েকটি ছবির সাহায্যে তিনি কলারসিকদের মন জয় করে নেন। প্রথমদিকে তিনি প্রধানত কালিদাসের শকুন্তলা এবং পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের জীবন ও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' অবলম্বনে আঁকা ছবির মধ্য দিয়ে অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত শৈলীর এক শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধির স্বীকৃতি লাভ করেন। একজন প্রকৃত মিনিয়েচার শিল্পীর মন ও দক্ষতা নিয়ে তিনি তাঁর ছবিতে গাছ, লতা, পাতা, পশু, পাখি, নারী, পুরুষ এঁকেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। তাঁর মনুষ্যরূপে যে সুষমা ও লালিত্য সহজেই চোখে পড়ে তা বত্তিচেলির ছবির নরনারীর তনুশ্রীকে ২০
মনে পড়িয়ে দেয়। এই রূপ ও রচনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর নিজস্ব রসবোধ—একজন ভক্ত বৈষ্ণব কীর্তনিয়া হিসাবে · যা তিনি সহজেই লাভ করেছিলেন। বিশেষত, গুরুর ওয়াশ পদ্ধতিকে সারা জীবন ধরে পরিশীলিত করে চিত্রে পরিবেশন ও ভাব সৃষ্টিতে তিনি এক



৪৫ বাধা, সুনয়নী দেবী, ১৯৩৭ খ্রি

অনন্যসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর ছন্দোময় সূক্ষ্মরেখা, তন্বাঙ্গী দেহরূপ এবং বর্ণের সুমিত প্রয়োগ পরিণত রুচি ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দেয়। বিশেষত তাঁর চৈতন্যজীবন বিষয়ক ছবিগুলি যে বাংলার চিত্রকলার বিশিষ্ট সম্পদ তাতে সন্দেহ নেই। অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রায়ই বলতেন[৬৯]: "আমাদের ভেতর তিন জন তিন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিযাছি। নন্দলাল শিব সিদ্ধ, আমি নিজে মোগল বিষয়ে সিদ্ধ আর ক্ষিতীন চৈতন্য সিদ্ধ"।

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের শিল্পীদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও একটা সাধারণ ঐক্যবন্ধন লক্ষ করা যায়। এই ঐক্যবন্ধনের প্রধান অবলম্বন দুটি—একটি আঙ্গিকগত, অপরটি বিষয়গত। আঙ্গিকের দিক থেকে এই পর্বের অবনীন্দ্র-শিষ্যরা তাঁদের অধিকাংশ ছবিই করেছেন গুরুর ওয়াশ পদ্ধতিতে। আর তাঁদের ছবির বিষয় নির্বাচিত হযেছে মূলত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণকথা, কাব্য ও ইতিহাস থেকে।

এই প্রথম পর্বে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের পাশাপাশি অপর যে শিল্পী-ব্যক্তিত্ব নব্যরীতির চিত্রকলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হন, তিনি হলেন অবনীন্দ্রনাথের অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথ। গগনেন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ছবি এঁকে পুরস্কার পেয়েছিলেন। পরে বাড়িতে আর্ট স্কুলের শিক্ষক হরিচরণ বসুর কাছে কিছুকাল ছবি আঁকার পাঠও নেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ছবি আঁকার চর্চা তাঁর পরিণত বয়সে, অনুজ অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর। ওকাকুরা প্রেরিত জাপানি শিল্পী টাইকান আর হিসিদার কাছে তিনি যে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপানি কালি-তুলি আর ওয়াশের কাজ শিখেছিলেন, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতেই তিনি প্রথম কিছু কাকের ছবি করেন। সেই ছবিগুলিতে তাঁর নতুন চিত্ররীতির ওপর আধিকার এবং তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণক্ষমতা স্পষ্ট। কাকের আচার-আচরণ-প্রকৃতি এই ছবিগুলিতে স্বচ্ছন্দভাবে ধরে রাখতে সক্ষম হলেন গগনেন্দ্রনাথ। কাকের বারোটি ছবি নিয়ে 'টুয়েলভ ইঙ্ক স্কেচেস' নামে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে একটা অ্যালবামও প্রকাশিত হয়েছিল[৭০]। এই কালি-তুলির কাজগুলির পর গগনেন্দ্রনাথের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে তাঁর 'জীবনস্মৃতি'র জন্য চব্বিশটি ছবি আঁকা। একই জাপানি কলা-কৌশলে কালি-তুলিতে আঁকা হলেও এই ছবিগুলিতে কী প্রতিকৃতি রচনায়, কী পরিবেশ সৃষ্টিতে গগনেন্দ্রনাথ সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই সময় তিনি পার্শ্বাগত বা প্রোফাইল-ভঙ্গিতে অনেকগুলি প্রতিকৃতি রচনাও করেছিলেন। সেই প্রতিকৃতিতে পাশ থেকে কালো করে সিল্যুটে মুখচ্ছবি ধরে রাখার মধ্য দিয়ে আলোছায়ার রহস্য বিষয়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে এই আলোছায়ার বিচিত্র বিচ্ছুরণ বর্ণে ও সাদা-কালোয় নানারূপে ধরে তিনি তাঁর নিজস্ব এক চিত্র-বাক্‌রীতি সৃষ্টি করেন। গগনেন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহেই নব্য-ভারতীয় বা বঙ্গীয় চিত্রকলার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে প্রশস্ততর করেছিলেন।



৪৬ নিবেদিতা সকাশে নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু-কৃত রেখাচিত্র, আঃ ১৯০৭ খ্রি

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর প্রথম পর্বের ছাত্ররা মিলে যে নব্য-ভারতীয় চিত্ররীতির সূচনা করেছিলেন, তা কেবল তাঁদের চিত্রপটেই সীমাবদ্ধ থাকেনি—ববং তা একটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পান্দোলনে পরিণত হয়েছিল। এই আন্দোলনেব কেন্দ্রে ছিলেন অবশ্যই অবনীন্দ্রনাথ—বিশেষত হ্যাভেল এ দেশ ছেড়ে চলে যাবার পর থেকে। কিন্তু কোনোদিনই তাঁকে এই আন্দোলন পরিচালনা একক দায় হিসাবে ভাবতে হয়নি। কারণ তখনকার কলকাতার দেশী ও বিদেশী সুধীজনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাঁর আন্দোলনের প্রতি কেবল সহানুভূতিই জানাননি, তাকে সমৃদ্ধ করতে, প্রসারিত করতে তাঁর সহযোগীর দায়িত্ব পালনেও কুণ্ঠিত হননি। এমন-কি এই আন্দোলনকে প্রকৃত অর্থে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা নিতেও এগিয়ে এসেছেন কোনো কোনো যোগ্য ব্যক্তি। প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ, তারপর হ্যাভেল এবং হ্যাভেল কলকাতা ছাড়ার পর ভগিনী নিবেদিতা নেন অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছাত্রদের সঠিক পথে অনুপ্রাণিত করার গুরুদায়িত্ব।

নিবেদিতা আশৈশব ছিলেন কলাশিল্পের প্রতি আগ্রহী। ভারতীয় কলাশিল্পের সঙ্গে তাঁর পরিচয় গুরু স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে। সেই পরিচয়ের ভিত্তিতে এবং তাঁর ছেড়ে-আসা ইংল্যান্ডের প্রি-রাফেলাইট আন্দোলনের অনুপ্রেরণায়, তিনি হ্যাভেলের মতোই এ দেশে এক ভাবসমৃদ্ধ কলাশিল্পের বিকাশ ও সর্বজনস্বীকৃত কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবন কামনা করতেন। জাপানের পরম্পরাগত চিত্রকলা ও কারুশিল্প ওকাকুরার নেতৃত্বে সংরক্ষিত ও পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। তাই ওকাকুরা এ দেশে এলে তিনি তাঁর সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের সংযোগ ঘটান। ওকাকুরাই ভারতীয় কলাশিল্পকে প্রাচ্যকলার প্রশস্ততর প্রেক্ষাপটে দেখতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহযোগীদের। আবার নিবেদিতার মধ্যস্থতাতেই অবনীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম সারির ছাত্রদের অজন্তার ভিত্তিচিত্র অনুশীলনের জন্য পাঠান—যাতে তাঁরা ভারতীয় চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন থেকে সরাসরি শিক্ষা নিতে পারেন। কেবল তাই নয়। তখনকার সেই বঙ্গভঙ্গ বদের প্রবল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে গিয়ে এই সব তরুণ শিল্পীরা যাতে তুলি ছেড়ে পিস্তল-বোমার বিপ্লবী পন্থা অবলম্বন না করেন সে বিষয়েও ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। কেননা, স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি তাঁর সক্রিয় সহানুভূতি থাকলেও রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও মনে করতেন[১১], "যে-জাতি কলাবিদ্যায় আপন চিত্তের পরিচয় দেয়নি, সে-জাতি মহাপ্রাণ জাতি নয়"। নিবেদিতা চাইতেন অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রদের হাতে 'দেশের অবলুপ্ত আর্টের নবজাগরণ' ঘটুক। আর সেই ব্রতেই তিনি তাঁদের কাছে ডেকে নিয়ে অনুপ্রাণিত করতেন। এঁদের কাছে তাঁর প্রত্যাশা কী ছিল তিনি সে কথা সে সময় তাঁর একটি নিবন্ধে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে গেছেন[১২] : "একটি ভারতীয় চিত্র, যদি তা সত্যিই ভারতীয় ও মহৎ হয়, তবে তা নিশ্চয়ই ভারতীয় ধারায় ভারতীয় অন্তরকে স্পর্শ করবে, নিশ্চয়ই এমন কোনো অনুভূতি ও ভাবনাকে প্রকাশ করবে যা হবে সুপরিচিত অথচ সহজবোধ্য ; এবং তার পরও, যদি সে চিত্র সমুচ্চমানের হয়, তবে তা দর্শকের মনে এমন এক দিব্যভাব জাগ্রত করবে যার দ্বারা সে হয়ে উঠবে উন্নততর এক মানুষ"।

নিবেদিতার প্রচেষ্টাতেই বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু ও সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো মানুষ এই নব্য-ভারতীয় শৈলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্র নন্দলাল প্রমুখ

শিল্পীদের দিয়ে অলংকৃত করেছেন তাঁর 'বসু বিজ্ঞান-মন্দির'। কিন্তু রামানন্দের অবদান এ ক্ষেত্রে অনেক বড। তাঁর উদ্যোগেই 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় ছাপা হতে থাকে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের রঙিন চিত্র। তার ফলেই তাঁদের ছবি পৌঁছে গিয়েছিল নাতিশিক্ষিত, শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত বাঙালির ঘরে ঘরে—এমন-কি ভারত বিষয়ে উৎসাহী বিদেশীদের কাছেও। এই পত্রিকাতেই এই নতুন চিত্রশৈলীর পক্ষে কলম ধরেন নিবেদিতা, আনন্দ কুমারস্বামী, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, এবং সি.এফ. এন্ড্রুজ । অথচ এই রামানন্দই এক সময় ছিলেন তখনকার অন্যান্য ইংরেজি শিক্ষিতজনের মতোই ইয়োরোপীয় রীতিতে ভারতীয় পুরাণকথার চিত্রকর রবি বর্মার এক উৎসাহী প্রচারক—রবি বর্মার ওপর লেখা প্রথম একটি সচিত্র ইংরেজি গ্রন্থের রচয়িতাও ছিলেন তিনি। নিবেদিতাই তাঁকে ইয়োরোপীয় চিত্রকলা থেকে মুখ ফিরিয়ে ভারতীয় আদর্শের নব্য-বঙ্গীয় চিত্রশৈলীর পরিপোষক করে তোলেন। রামানন্দ কেবল সাময়িকপত্রে নয়, তাঁর প্রকাশিত বাংলা রামায়ণ ও মহাভারতেও এই নতুন ধারার শিল্পীদের আঁকা ছবি ছেপে সেগুলিকে বাংলার অন্তঃপুরিকাদের মধ্যেও প্রচারিত করেন। তাঁর ছাপা রঙিন অ্যালবামগুলির সাহায্যেই এই নব্য-বঙ্গীয় শৈলীর শিল্পীদের ছবি চিত্ররসিকদের কাছে সহজলভ্য হয়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর এই বিপুল প্রয়াসকে স্মরণ করে লিখেছেন[৭৩]: "রামানন্দবাবুর কল্যাণে আমাদের ছবি আজ দেশের ঘরে ঘরে। এই যে ইণ্ডিয়ান আর্টের বহুল প্রচার—এ এক তিনি ছাড়া আর কারুর দ্বারা সম্ভব হতো না"।

সেসময় সকল বাঙালি বিদগ্ধজনই যে এই নতুন শৈলীর পক্ষপাতী ছিলেন এমন নয়। বরং দেখা যায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও রমাপ্রসাদ চন্দের মতো প্রত্নতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক, সুরেশ সমাজপতির মতো রক্ষণশীল 'সাহিত্য' পত্র সম্পাদক, এমন-কি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও তাঁর পুত্র তরুণ সুকুমার রায়ের মতো নব্যতন্ত্রী মানুষ এই নব্য-বঙ্গীয় শৈলীর আদর্শকে নানা দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় আক্রমণ করেছেন। এঁদের সকলের কাছেই চিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি ছিল সাদৃশ্যধর্ম—যার চরম প্রকাশ পাশ্চাত্যের অ্যাকাডেমিক চিত্রে। তাই নতুন শৈলীর আদর্শায়িত রূপ তাঁদের কাছে কখনই সমর্থনযোগ্য মনে হয়নি—তাঁদের কারো কারো কাছে বরং তা মনে হয়েছে হাস্যোদ্দীপক। চিত্রে ভাব ও ভাবনার জগতকে ফুটিয়ে তোলা অপেক্ষা এঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন চর্মচক্ষুর দৃশ্যমান জগতকে ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে রূপদানের ওপর। এ ছাড়াও ছিল শিল্পে জাতীয়তার প্রশ্ন। এক দেশের শিল্পী অন্য দেশের রীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে সার্থক চিত্র রচনা করতে পারেন কি না-পারেন—সেই প্রশ্ন। এই সব প্রশ্ন নিয়ে সে সময় বাংলা দেশের পত্র-পত্রিকায় যে ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্ক প্রকাশিত হয়েছিল সে সম্পর্কে বীরবল ছদ্মনামে প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন[৭৪]: "যেদিন থেকে বাংলাদেশে চিত্রকলা আবার নব কলেবর ধারণ করেছে, তার পরদিন থেকেই তার অনুকূল এবং প্রতিকূল সমালোচনা শুরু হয়েছে এবং এই মতদ্বৈত থেকে সাহিত্য সমাজে একটা দলাদলি সৃষ্টি হবার উপক্রম হয়েছে"।

সে সময় নব্য শিল্পাদর্শের প্রেরণায় উদবেলিত অবনীন্দ্রনাথ তাঁর একটি নিবন্ধে প্রকৃত অর্থে ইয়োরোপীয় শিল্পে দক্ষতা অর্জন ভারতীয় শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয়—এই মত ব্যক্ত করে লেখেন[৭৫], "যদি কেউ শিল্পের অধ্যাত্মচেতনার রূপকে অনুভব করতে চান তাহলে তিনি যেন আশ্বিন মাসে বাংলার কোনো একটি মন্দিরে উপস্থিত হন—যেখানে সন্ধ্যায় পবিত্র ধূপধুনা পুড়ছে, শাঁখ ঘণ্টা বাজছে, ধূপের ধোঁয়ার মধ্যে আরতির দীপ তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন পুরোহিত, সামনে জ্যোতির্ময়ী মহিমময়ী দুর্গামূর্তি। যদি কেউ সেই মূর্তির দিকে ভক্তির চোখে তাকান, তাহলে আধুনিক ইয়োরোপীয় শিল্পের মোহমায়া দূর হয়ে যাবে দেবী কৃপায়—তিনি বুঝবেন, সৌন্দর্যের অধ্যাত্মচেতনার রূপকে, যার দ্বারা ভারতীয় শিল্পী মাটিতে গড়েছেন অপরূপ

দেবীমূর্তি"। অবনীন্দ্রনাথের এই ভাবাবেগময় বক্তব্যের প্রতিবাদে উপেন্দ্রকিশোর উল্লেখ করেন যে আর্ট স্কুলের শিক্ষার ত্রুটি থাকলেও সেখান থেকে যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শশী হেশ ও রোহিণীকান্ত নাগের মতো ইয়োরোপীয় রীতিতে দক্ষ শিল্পী বেরিয়েছেন। এবং সেই সঙ্গে লেখেন[৭৬], "আমি অবশ্য ভারতীয় শিল্পকে ইয়োরোপীয় শিল্পের সমকক্ষ মনে করি না, এবং এ কথাও মনে করি না যে ভারতীয় শিল্প আমাদের প্রতিভা ও মেজাজের অধিক উপযোগী"। তিনি শিল্পে স্বাদেশিকতার গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করলেন[৭৭] "শিল্পে স্বাদেশিকতার গুরুত্ব যথাসম্ভব স্বীকার করেও দৃঢ়তার সঙ্গে বলব, স্বাদেশিকতাকে শিল্প চরিত্র নির্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি করা যায় না। নিজ অনুভূতি ও আদর্শই শিল্পীর সর্বাধিক গ্রাহ্য বস্তু, এর সঙ্গে অনেক সময় স্বাদেশিকতার কোনো যোগ থাকে না, অথচ তা মহত্তম শৈল্পিক বিকাশের হেতু হতে পারে। তা ছাড়া এমন হওয়া খুবই সম্ভব যে, শিল্পীর আদর্শ তার দেশের আদর্শ থেকে পৃথক। সে ক্ষেত্রে শিল্পী যদি স্বীয় আদর্শকে প্রতারণা করে দেশীয় আদর্শকে ধরতে যান তা হলে তিনি শিল্পীরূপে নিজ জন্মগত অধিকারকেই লঙ্ঘন করবেন"। এ বিষয়ে অবনীন্দ্র অনুগামী অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় লিখলেন যে[৭৮] "পাশ্চাত্য শিল্প তো কেবল কিছু শৈলীজ্ঞান নয়, তা আঙ্গিকের অতিরিক্ত কিছু, তা জাতীয় মনোরূপের অভিব্যক্তি—ধর্ম বা সাহিত্যের মতোই। সকল উত্তম শিল্পই জনগণের সত্তার উচ্চারণ—সে ভাষা তার একেবারে নিজস্ব। তার অনুকরণ হয়তো কেউ করতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা কি আত্মার উদ্ঘাটন সম্ভব?" শিল্পে এই জাতীয়তার প্রশ্নের উত্তর দিতেই তিনি ফরাসি সমালোচক আর্নেস্ট চেসনু-র কথা উদ্ধৃত করেছেন[৭৯] "উপজীব্য শিল্পবস্তুর সঙ্গে হাজার সামাজিক সম্পর্ক জড়িয়ে থাকে, যা তার নিজ চরিত্র, নিজ যুগ, নিজ জাতি ও নিজ প্রতিভা থেকে উদ্ভূত। শিল্পীর সৃষ্টিতে ব্যক্তিগত, জাতিগত প্রতিভাই ব্যক্ত হয়—তার রূপ দেখা যায় লেখক হলে বিশেষ বাগবন্ধে, চিত্রকর হলে তুলির টানে, ভাস্কর হলে বাটালির আঘাতে"। অর্ধেন্দ্রকুমার মন্তব্য করলেন এরপর—যামিনী গঙ্গোপাধ্যায় শশী হেশের ছবি "শিল্পজগতে ঔপনিবেশিক সৃষ্টি এবং প্রকৃতির বিশ্বস্ত অনুশীলন 'তোতাপাখির বুলি' ছাড়া কিছু নয়। এরও উত্তর এসেছিল—তবে উপেন্দ্রকিশোর নয় তাঁর পুত্র সুকুমার রায়ের কলম থেকে। অর্ধেন্দ্রকুমারের ১৩১৭ সালের আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ প্রসঙ্গে সুকুমার কিছুটা ব্যঙ্গচ্ছলে লিখলেন[৮০]: "বোঝা গেল, ভারত-শিল্পক্ষেত্রে বাস্তবিকতার কোনো সমাদর নাই। মক্ষিকাঘ্ন মসীজীবিবৎ দৃষ্টবস্তুর হুবহু অনুকরণ করিয়া যাওয়া ভারতীয় শিল্পের (শুধু ভারতীয় কেন, কোনো শিল্পেরই) উদ্দেশ্য নহে। ভারতীয় চিত্রশিল্পী প্রাকৃত ব্যাপারের কোনো ধার ধারেন না। তিনি 'এনাটমি, পার্সপেকটিভ' প্রভৃতি গ্রীকশিল্পের ঠুলি চোখে দিয়া শিল্পসাধনা করেন না। চিত্রাঙ্কনকালে, চিত্রের উপাখ্যানবস্তুর বাস্তবিক আকৃতি কিরূপ, তাহার বর্ণ লাল, নীল কি সবুজ, এ সকল বিষয়ে বিন্দুমাত্রও মনোযোগ দেওয়া তিনি আবশ্যক বোধ করেন না। তিনি চিত্রবর্ণিত বিষয়ের চিন্তায় ধ্যানস্থ হইয়া মনশ্চক্ষে তাহার যেরূপ চেহারা দেখেন ঠিক তেমনটি করিয়া তাহাকে চিত্রিত করেন। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেটা তাঁহার কাছে যেরূপ বোধ হয় অথবা তাহার যে লোকপ্রসিদ্ধ আকৃতি তাঁহার চর্মচক্ষে প্রতিভাত হয় সে সকল বাস্তব ব্যাপার—ফ্যাক্টস্ অব নেচার—সুতরাং সেগুলির সহিত তাঁহার কোনো সম্পর্ক নাই। মনোময় পুষ্পকরথে চড়িয়া কল্পনার মুক্ত আকাশে বিচরণ করাই তাঁহার বিশেষত্ব।··· শিল্পক্ষেত্রে নেচারকে লইয়া টানা হ্যাঁচড়া করা ওই বিজ্ঞানসর্বস্ব জড়বুদ্ধি-প্রধান পাশ্চাত্য জগতেই সাজে-ইত্যাদি।" এ ছাড়া নব্য-বঙ্গীয় শৈলীর 'আধ্যাত্মিকতা' প্রসঙ্গেও তিনি মন্তব্য করলেন[৮১]- "শুনিতে পাই 'আধ্যাত্মিকতাই' ভারতশিল্পের প্রাণ ও তাহার শ্রেষ্ঠতার কারণ। এই তথাকথিত 'আধ্যাত্মিকতা' কিরূপ বস্তু? চিত্রের নায়ক-নায়িকার চোখেমুখে যদি একটু তন্দ্রার ভাব দেখা গেল অথবা চারদিকে কুহেলিকার সৃষ্টি করিয়া শিল্পী যদি তন্মধ্যে একটু আলোকের আভাস দিলেন তবেই কি

আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত হইল? তদুপরি যদি চিত্রে ভাবের অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, এবং নায়ক বা নায়িকা যদি এনাটমি শাস্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া তাঁহাদের অস্থিহীন অঙ্গভঙ্গীর কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি করিয়া বসেন তবে তো সোনায় সোহাগা!" সুকুমার তাঁর এই সমালোচনার মধ্য দিয়ে নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার তখনকাব যে স্বীকৃত রূপ তার এক সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। বিশেষত, পরবর্তী সময়ে এই শৈলীর বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই চরিত্রলক্ষণগুলি। কিন্তু সে সময় এই আধ্যাত্মিকতাবাদই অভিনন্দিত হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের মতো সাধকপুরুষের দ্বারাও। তিনি লিখেছিলেন[৮২]: "সম্প্রতি কয়েকজন রসজ্ঞ ব্যক্তির উদ্যমে ভারতবাসীর চোখ খুলিতেছে, নিজের ক্ষমতা, নিজের ঐশ্বর্য বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধাবণ প্রতিভার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত কয়েকজন যুবক লুপ্ত ভারতীয় চিত্রবিদ্যার পুনরুদ্ধার করিতেছেন। তাঁহাদেব প্রতিভার গুণে বঙ্গদেশে আবার নূতন যুগের সূচনা হইতেছে"। কেবল শ্রীঅরবিন্দ নন, ভারতবন্ধু সি. এফ. এন্ড্রুজও অভিনন্দিত করলেন এই নব্যরীতির শিল্পীদের। তিনি লিখলেন[৮৩]: "আর পাশ্চাত্যের নিছক চতুর নকলনবিশি নয়, তার পরিবর্তে অবনীন্দ্রের সুকুমার লাবণ্যকোমল প্রাচ্য চিত্রশিল্প—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা ও সংগীত—রেনেসাঁসের বাংলার অনেক বিখ্যাত স্রষ্টার মধ্যে এই দু'জনের নামই শুধু করলাম। বাংলা ভাষা জানি না বলে বাংলা সাহিত্যের বিচার কবতে আমি সমর্থ নই, কিন্তু চিত্রশিল্পের নমুনা কিছু কিছু দেখেছি এবং গান শুনেছি—তাই স্বাদেশিকতার ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার হয়েছে, এই যে জাগরণ ঘটছে তা মোটেই কৃত্রিম নয়, জনসম্পর্কহীন উৎসাহীদের তাগিদের নড়াচড়া নয়—এ হল খাঁটি উত্থান, যাকে জনসাধারণ বুঝতে পারে এবং হাজার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে"।

এইভাবেই জয়তিলক পেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ তাঁব প্রবর্তিত শৈলীর আবম্ভকালেই। কিন্তু সেদিন থেকে তাব পরবর্তী অর্ধশতাব্দীকাল বাংলা দেশেব চিত্রকলার বিকাশে মূল দ্বন্দ্ব হয়ে থাকল এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতির আদর্শ। অন্যভাবে বলতে গেলে জাতীয় ধাবাব চিত্রকলার সঙ্গে আধুনিক চিত্রকলার বিবোধ।

কিন্তু সব মিলিয়ে অবনীন্দ্রনাথেব শিল্পান্দোলনেব ধাবা যাব কর্মে ও সাধনায় একই সঙ্গে গভীবতা ও বিস্তৃতি লাভ করে তিনি হলেন নন্দলাল। নন্দলাল যে অবনীন্দ্রনাথের প্রধান ও প্রিয়তম শিষ্য তা সকলেবই জানা। তাঁকে অবনীন্দ্রনাথ সহজে কাছ-ছাড়া কবতে চাইতেন না। কিন্তু সেই নন্দলালকেই তাঁকে ছেড়ে দিতে হল যখন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনেব ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়কে রূপান্তবিত কবলেন বিশ্বভাবতীতে। ববীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, বিশ্বভাবতীব কলাভবনেব অধ্যক্ষ হিসাবে নন্দলাল পাবেন কাজেব অব্যাহত অবকাশ ও আনন্দ -- তাঁব প্রতিভাব বিকাশ ঘটবে শান্তিনিকেতনেব উন্মুক্ত পরিবেশে। ববীন্দ্রনাথেব আশ্বাস নন্দলালেব জীবনে ফলপ্রসূ হয়েছিল , নন্দলাল তাঁব শান্তিনিকেতনবাসেব প্রায় অর্ধশতাব্দীকালে কেবল যে নিজেই সারা ভাবতে অবনীন্দ্রনাথেব পব আচার্য শিল্পীব মর্যাদা অর্জন করেছিলেন তাই নয়, আধুনিক ভাবতীয় কলাশিল্পকে সত্যিকারের ভারতীয়ত্ব দান কবে স্বমহিমায় বিকশিত হয়ে উঠবাব প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত করে যেতে পেরেছিলেন।

২৮ ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট

অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নব্য-ভারতীয় চিত্রকলার আন্দোলনকে এক সুসংহত রূপদানের পিছনে ছিল একটি মহৎ প্রতিষ্ঠানের তিন দশক ব্যাপী বহুমুখী প্রয়াস। এই প্রতিষ্ঠানটি হল ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট। হ্যাভেল যখন কলকাতায় ছিলেন তখন তাঁকে ঘিরে কলকাতার ইংরেজ কলারসিকদের একটি ক্লাব ছিল—আর্ট সোসাইটি। অন্যদিকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ মিলে প্রতিষ্ঠা করেন বঙ্গীয় কলা সংসদ। হ্যাভেল কলকাতা ছেড়ে গেলে যেমন বন্ধ হয়ে যায় আর্ট সোসাইটি, তেমনই অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুলে চাকরি নিলে উঠে যায় কলা সংসদ।। অথচ সে সময়, বিশেষ করে ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল-এর হলে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর আয়োজিত অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজনের ছবি ও ওকাকুরার আনা কিছু জাপানি উডপ্রিন্টের এক প্রদর্শনীর সাফল্যে নতুন একটি আর্ট সোসাইটি গড়ার প্রয়োজন অনুভব করলেন কলকাতার দেশী ও বিদেশী কলারসিকরা। এই প্রয়োজনের তাগিদেই ৬ এপ্রিল ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তখনকার কার্যনির্বাহী অধ্যক্ষ অবনীন্দ্রনাথের আহ্বানে আর্ট স্কুলে মিলিত হন কলকাতার গণ্যমান্য কয়েকজন শিল্পরসিক—যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজ এবং মাত্র কয়েকজন বাঙালি। এই সভাতেই লর্ড কিচেনারকে সভাপতি, বিচারপতি রাম্পিনিকে সহ-সভাপতি এবং নর্মান ব্লান্ট ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত করে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট। ভারতের ইতিহাসে এতগুলি মনস্বী শিল্পকলার চর্চার উদ্দেশ্য নিয়ে এর আগে আর কখনও একত্রিত হননি। যাঁদের বিশেষ উদ্যমে সোসাইটি তার প্রথম পর্বে কৃতকর্ম হয়েছিল তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় নর্মান ব্লান্ট, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, বিচারপতি উডরফ, দুই সুইডিস ব্যক্তি করেনসন ও মোলার, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং জনৈক ইংরেজ ইনর্জিনিয়ার এডওয়ার্ড থর্নটন-এর নাম। সোসাইটির ঘোষিত উদ্দেশ্য হল : সদস্যদের সংগৃহীত প্রাচীন ও আধুনিককালের প্রাচ্যদেশীয় কলাশিল্পের নিদর্শনগুলির সাহায্যে সোসাইটির সদস্য ও সাধারণের মধ্যে প্রাচ্য কলাশিল্প বিষয়ে জ্ঞানসঞ্চার ও আগ্রহ সৃষ্টি। তার জন্য শিল্প বিষয়ে আলোচনা, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও চিত্র-প্রদর্শনীর কর্মসূচি গ্রহণ করা হল। সোসাইটি আয়োজিত বাৎসরিক প্রদর্শনীতে প্রধানত প্রদর্শিত হতে থাকল সশিষ্য অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাবলি। এই বাৎসরিক প্রদর্শনীগুলির যে সংবাদ ও সমালোচনা সেসময়ে দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হত, তাই-ই অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত চিত্রশৈলীর কথা সকল স্তরের মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিয়েছিল। তা ছাড়া, সোসাইটি এই নবারীতির শিল্পীদের উৎসাহিত করার জন্য বৃত্তিদানের ব্যবস্থাও করেছিল। সোসাইটির সদস্যরা অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর কৃতী ছাত্রদের ছবি কিনেও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করলেন।

সোসাইটি আয়োজিত নব্য-ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনী কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই সীমাবদ্ধ থাকল না, ক্রমে ক্রমে তা এলাহাবাদে, মাদ্রাজে, এমন-কি বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ল। ভারতপ্রেমী ফরাসি শিল্পী আঁদ্রে কার্পেলের উদ্যোগে এই চিত্রকলার প্রথম পূর্ণাঙ্গ এক প্রদর্শনী ইয়োরোপ ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত হল প্যারিস শহরে, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে। প্যারিসের সমস্ত দৈনিক

পত্রিকায় এবং বিশেষ করে কলা-বিষয়ক বিখ্যাত পত্রিকাগুলিতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসামূলক সমালোচনা বেরোল নব্য-ভারতীয় চিত্রকলার—যা সেখানে অভিনন্দিত হল কলকাতার শৈলী নামে। সে বিজয় এমনই চমকপ্রদ হয়েছিল যে প্যারিসে অবস্থিত রয়টারের প্রতিনিধি তার খবর পাঠালেন কলকাতায় তারযোগে—'দি স্টেটসম্যান' সেই খবর ছাপল এই শিরোনামে—'একজিবিশান অব ইন্ডিয়ান পেইনটিংস ইন প্যারিস—দি ট্রায়ামফ অব অবনীন্দ্রনাথ[৮৮] !!!' অথচ সেই প্রদর্শনীই যখন পৌঁছল লন্ডনে এবং প্রদর্শিত হল সেখানকার ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মে, তার প্রতিক্রিয়া হল মিশ্র। ওই ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে জাভাতেও এই চিত্রকলার একটি প্রদর্শনী হয়েছিল।

কেবল প্রদর্শনীর মাধ্যমেই নয়, সেই সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখের ছবির প্রামাণ্য মুদ্রণের সাহায্যেও তাঁদের চিত্রকলাকে প্রচার করতে সচেষ্ট হয় সোসাইটি। প্রথমে জাপানের বিখ্যাত কলা-বিষয়ক পত্রিকা 'কোক্কা'র সহযোগিতায় এবং পরে লন্ডনের কার্ল হেনশচেল ও এমেরি ওয়াকারের মুদ্রণযন্ত্রে সোসাইটি যে কয়েকটি ছবি ছাপায় তা মূল ছবিগুলির চরিত্ররক্ষায় সফল হয়েছিল। এ ছাড়া কলকাতার বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার জনসন অ্যান্ড হফম্যান-কে দিয়েও অনেকগুলি ছবির ফোটোকপি করিয়ে নিয়ে সদস্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা নেয় সোসাইটি।

প্রতি বছর নিয়মমতো বাৎসরিক প্রদর্শনীর আয়োজন হতে থাকলেও ১৯১৭ নাগাদ সোসাইটির জীবনধারায় কিছুটা শৈথিল্য এসেছিল। তার কাজে কমে দেখা দিয়েছিল স্ফূর্তির চেয়ে নিয়মতন্ত্রতা। তাই তখনকার কথা বলতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখছেন[৮৯] : "ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটিকে সম্বল করে চলতে চলতে একটা দিন এমন এল যে, দেখলেম আমি যে-ভয়ে আর্ট স্কুল ছেড়ে বার হলেম সেই ভয়ই গভর্নমেন্টের অনুগ্রহ হয়ে এককালের স্বাধীন আর্ট সোসাইটিকে আর্টিস্ট-পাখি পোষার একটা খাঁচা রূপে পরিণত করে দিয়ে গেলেন। ···ঠিক এই অবস্থায় পৌঁছবার পূর্বে রবিকাকার অভয় এল আর্টিস্টদের জন্য বিচিত্রা-ভবন সৃষ্টি হল কলকাতায়"। এই বিচিত্রা-ভবন বা ক্লাবের জন্ম হয় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে—রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে শিল্প-সাহিত্য-সংগীত আর নাট্যকলার এক দুর্লভ মিলনক্ষেত্র হিসাবে। রবীন্দ্রপুত্র রথীন্দ্রনাথের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় বছর তিনেক কাল এই বিচিত্রা ক্লাব হয়ে ওঠে নব্য-ভারতীয় চিত্রকলার এক সৃজনশীল কেন্দ্র। এখানে নন্দলাল, অসিতকুমার এবং অবনীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বের দুই ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ কর ও মুকুলচন্দ্র দে পাশাপাশি ছবি আঁকার সুযোগ পেলেন। ক্লাবের পরিচালিত আর্ট স্কুলে তাঁরা শেখাতে থাকলেন অঙ্কনবিদ্যা। এই বিচিত্রা ক্লাবের আমলেই, সেখানকার মেশিনে গগনেন্দ্রনাথ তাঁর পরবর্তীকালে বিখ্যাত সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রগুলিকে রূপ দিয়েছিলেন লিথো পদ্ধতিতে ছেপে। জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ক্লাবের কাজকর্ম চলেছিল ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। আর ওই বছর বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হলে রবীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথ স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনবাসী হলেন। অসিতকুমার, নন্দলাল, সুরেন কর এঁরাও একে একে গিয়ে মিলিত হলেন সেখানকার শিল্পবিদ্যালয়, কলাভবনে। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে, নন্দলালের পরিচালনায় পরবর্তী দুই দশক শান্তিনিকেতনের কলাভবনই হয়ে উঠল নব্য-ভারতীয় বা বাংলার আধুনিককালের চিত্রকলার সব থেকে সৃজনশীল কেন্দ্র।

আবার এই ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দেই নবায়ন ঘটল ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর। গগনেন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে, তখনকার বাংলার গভর্নর লড রোনাল্ডসের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সরকারি অর্থানুকূল্যে সোসাইটির কাজকর্ম আরও ব্যাপক আকারে শুরু



৭ নিত্যানন্দ ও জগাই-মাধাই, অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত ফ্রেস্কো, ১৯২৯ খ্রি

হল। সোসাইটির শিল্প-বিদ্যালয় চালু হল ধর্মতলার সমবায় ম্যানসনস-এর বাড়িতে—প্রথম দুজন শিক্ষক হলেন নন্দলাল ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার। রবীন্দ্রনাথেব আহ্বানে নন্দলাল স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনবাসী হলে প্রধানশিক্ষক হয়ে থাকলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ---পরবর্তী আঠারো বছর ধবে। এই আঠারো বছর নব্য-ভারতীয় চিত্রকলাব ছাত্রবা প্রধানত শিক্ষা লাভ করেছেন ক্ষিতীন্দ্রনাথেব কাছ থেকেই। অবশ্য সব সময়েই অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথেব প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। এই সোসাইটির শিল্প-বিদ্যালয থেকেই বিশ আব তিরিশেব দশকে শিল্পী হয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন অবনীন্দ্ররীতির দ্বিতীয় পর্বের ছাত্রবা; যেমন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, মুকুলচন্দ্র দে, বীরেশ্বর সেন, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায, চঞ্চলকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, চিন্তামণি কব ও প্রাণকৃষ্ণ পাল। এঁরা নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলাকে আপন আপন প্রবণতা ও দক্ষতায বিচিত্রমুখী কবে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন পরবর্তী সময়ে।

সোসাইটির বাৎসরিক প্রদর্শনী আগের মতোই সাডম্বরে অনুষ্ঠিত হতে থাকল। এই প্রদর্শনীগুলিতে কেবল সোসাইটির সদস্য ও বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ছবিই প্রদর্শিত হত তা নয়, সেই সঙ্গে নিয়মিতভাবে শান্তিনিকেতনের কলাভবনেব শিল্পীদের এবং বাংলার বাইরের নানা জায়গার শিল্পীদের ছবিও দেখানো হত। ইতিমধ্যে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম সারির ছাত্ররা ভারতেব নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন চিত্রকলার শিক্ষকতার কাজ নিয়ে। অসিতকুমার প্রথমে যান জয়পুবের মহারাজের আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হয়ে, সেখানে দু-বছব থাকার পর লখনউ-এর সবকাবি আর্ট স্কুলে প্রিন্সিপাল হন ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে এবং সেই দাযিত্ব পালন করেন ১৯৪৫ পর্যন্ত। শৈলেন্দ্রনাথ দে সোসাইটিব বিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষকতার পব যান বারাণসীতে, তারপর সেখান থেকে জয়পুর আর্ট স্কুলে। দেবীপ্রসাদ রাযচৌধুবী মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে মাদ্রাজের সরকারি আর্ট স্কুলে ভাইস-প্রিন্সিপাল পদে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে যোগ দেন এবং পরের বছরই প্রিন্সিপাল পদে উন্নীত হন। সমবেন্দ্রনাথ গুপ্ত লাহোরের মেয়ো স্কুল অব আর্টসে প্রথম ৫৮
কিছুকাল শিক্ষকতার পর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ইয়োবোপ থেকে ফিবে প্রিন্সিপাল পদ লাভ কবেন। প্রমোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যান দক্ষিণভারতের মশলিপত্তনম শহবের অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার অধ্যাপক হয়ে। এইভাবে অবনীন্দ্র-চিত্ররীতি পশ্চিমভাবত বাদে উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তার লাভ কবে তাঁর শিষ্য ও প্রশিষ্যদের কলাসাধনার মধ্য দিযে এক সর্বভারতীয চিত্ররীতিব গৌরব অর্জন করল।

সোসাইটি যে কেবল ভারতীয বা প্রাচ্যদেশীয কলাশিল্পের প্রতি তার আগ্রহ সীমাবদ্ধ রেখেছিল তা নয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে চতুর্দশ বাৎসরিক প্রদর্শনীর সঙ্গে সোসাইটি একটি আধুনিক জার্মান চিত্রকলার প্রতিনিধিমূলক চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। এই প্রদর্শনীতে জার্মানির বউহাউস স্কুলের শিল্পী ভাসিলি কান্দিনিস্কি, পল ক্লি, লিওনেল ফেনিংগার প্রমুখের ছাপাই ছবি স্থান পেয়েছিল। সারাভারতে এ ধরনের আধুনিক ইয়োরোপীয় চিত্রকলাব প্রদর্শনী তার আগে কোথাও অনুষ্ঠিত হয়নি। কলকাতার কলারসিকদের মধ্যে এই প্রদর্শনী কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। কিন্তু গগনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের নবতর চিত্ররচনার প্রয়াসে প্রদর্শনীটি যে অনুপ্রেরণাব কারণ হয়েছিল সে কথা অনুমান করা অসংগত হবে না। এখানে এ কথাও উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথই তাঁর জার্মানি ভ্রমণের সূত্রে এই প্রদর্শনীব ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর এই প্রদর্শনীর এক বছব আগেই তিনি দ্ব্যর্থশূন্য ভাষায় দেশের শিল্পীদের আহ্বান জানান ভাবতীয় শিল্পের স্বীকৃত পরম্পরাব নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে সদাপরিবর্তমান জীবনলীলায় সাড়া দিতে[৮৬]। এই বিশের দশকেই বাংলার চিত্রকলা নতুন মোড় নিয়েছিল। একদিকে যেমন অ্যাকাডেমিক-সিদ্ধ ধারাব চিত্রকলা থেকে মুক্ত হচ্ছিলেন কোনো কোনো শিল্পী, অন্যদিকে তেমনই অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত চিত্রকলার পুরাণকথা-নির্ভব বিষয় আর কুহেলিকাময়

পরিবেশে ক্ষীণ আলোকদ্যুতিতে অভিব্যক্ত তার চিত্ররূপের রীতিবদ্ধতা থেকেও বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন কেউ কেউ। বাংলার চিত্রকলা নতুন এক অর্থে আধুনিক ইয়োরোপীয় চিত্রকলার নিরিখে, নব্যতন্ত্রী হয়ে উঠছিল সেই সময়েই।

সোসাইটির নবায়নের কালে তার কর্মতালিকায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছিল 'রূপম্' পত্রিকার প্রকাশ। ১৯১৯ সালে অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (ও সি গাঙ্গুলি) সম্পাদিত 'রূপম্' পত্রিকাটি সোসাইটির মুখপত্র হিসাবে এমন এক মহত্ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল যার তুলনা তার আগে বা পরে প্রকাশিত কোনো ভারতীয় শিল্প-বিষয়ক পত্রিকার সঙ্গেই করা যায় না। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও পরম রসবোধের সঙ্গে অর্ধেন্দ্রকুমার এই ত্রৈমাসিক অভিজাত সচিত্র পত্রিকাটিতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাচ্যকলাবিৎ লেখকদের একত্রিত করে ভারতীয় ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশীয় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কলাশিল্পের গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। সেই সঙ্গে উত্তম মুদ্রণে নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের ছবি ও তাঁদের ওপর আলোচনা ছেপে এই কলাশৈলীকে তিনি দ্রুত পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। এই পত্রিকার সূত্রেই, অর্ধেন্দ্রকুমারের ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাহান্নটি শহরে ও কানাডার টোরেন্টোতে নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার এক নির্বাচিত প্রদর্শনী ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে। তার দু-বছর আগে জার্মানিতে ঘুরে এসেছিল এই শৈলীর এক চিত্র-প্রদর্শনী। কী আমেরিকা কী জার্মানি উভয় দেশেই নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলা তার স্বাতন্ত্র্যের কারণে সমাদর লাভ করেছিল[৮৭]।

এই 'রূপম্' পত্রিকার পাতাতেই, বিশ-এর দশকের সেই নতুন পথে বাংলার চিত্রকলার বিকাশলাভের কালে, এক তাৎপর্যপূর্ণ বিতর্ক উচ্চারিত হয়েছিল। বিতর্কের একপক্ষে ছিলেন বিশিষ্ট বাঙালি বুদ্ধিজীবী বিনয়কুমার সরকার ও অন্যপক্ষে 'অগস্ত্য' ছদ্মনামে 'রূপম্'-এরই সম্পাদক এবং নব্য-বঙ্গীয় চিত্রশৈলীর একনিষ্ঠ ও নিরলস প্রবক্তা অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। বিনয়কুমার ছিলেন সমকালীন ইয়োরোপীয় আধুনিক কলাশিল্পের যুগান্তকারী আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। সেই সঙ্গে চিত্রকলাকে তার নিজস্ব নান্দনিক মূল্যে বিচার-বিশ্লেষণ করার আধুনিকতম পদ্ধতিতেও ছিল তাঁর বিস্ময়কর অধিকার। তিনি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি সংখ্যা 'রূপম্'-এ একটি প্রবন্ধ লিখে নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার মূল প্রতিপাদ্যকেই বিতর্কের বিষয় করে তুললেন। হ্যাভেল-নিবেদিতার শিক্ষায় নব্য-বঙ্গীয় কলাশিল্পের বিষয় হয়ে উঠেছিল মহাকাব্য-পুরাণকথার ঘটনা ও চরিত্রাবলি এবং আদর্শ হিসাবে তার আরব্ধ ছিল চিত্রের মাধ্যমে উপনিষদের ব্রহ্ম এবং ভক্তিবাদের আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধি। আর এইভাবেই আধুনিক ভারতীয় কলাশিল্পে ভারতীয়ত্ব অর্জনের শিক্ষা দিয়েছিলেন দুই ভারতহিতৈষী মনস্বী। বিনয়কুমার এই বিশেষ ভারতীয় ভাবে পৃথক হয়ে থাকার মনোবৃত্তির বিরোধিতা করে বললেন[৮৮], "আজকের নবীন ভারতের পক্ষে ব্যাবহারিক বিজ্ঞানের মতোই মানবজাতির নান্দনিক কীর্তিগুলিকেও অঙ্গীভূত করে নেওয়ার অর্থ বিজাতীয়তাকে বরণ করা নয়"। তিনি আধুনিক শিল্পবোধে শিল্পের নিজস্ব মূল্য, তার স্বরাজের কথা উল্লেখ করে তাকে সাহিত্যিক সমালোচনা, ঐতিহাসিক বা দার্শনিক বিশ্লেষণ, নৈতিক বা ধর্মীয় শিক্ষা এবং গণতান্ত্রিক, বলশেভিক অথবা জাতীয়তাবাদী প্রচারের হাত থেকে মুক্ত করতে চাইলেন। তিনি রূপশিল্পের বিচারে রূপবিশ্লেষণের ওপর জোর দিয়ে বললেন যে শিল্পীর ভাষা হল রেখা, বিন্দু, ত্রিকোণ, শঙ্কু, বক্ররেখা, বর্গ, ঘনত্ব ও ভর; আর তার শব্দাবলিই হল অবস্থান ও বিস্তৃতি। ছবির বিষয় অপেক্ষা তার রূপনির্মিতির বিন্যাসের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি কলাশিল্প আলোচনায় আধুনিক রীতির পরিচয় দিলেন। তাঁর এই বক্তব্য এক অর্থে ছিল আগের বছর ইংরেজি 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'দি মিনিং অব আর্ট' নিবন্ধের বক্তব্যেরই এক সুনির্দিষ্ট রূপ।

অর্ধেন্দ্রকুমার 'অগস্ত্য' ছদ্মনামে বিনয়কুমারেব প্রবন্ধের সঙ্গে নিজের বক্তব্যও প্রকাশ করেছিলেন 'রূপম্'-এ। তিনি শিল্পে জাতীয় ভাবনা ও বাচনভঙ্গির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বললেন : "পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়েব আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমি উদাসীন নই। এই বিনিময়ের সমস্যাই এ যুগের প্রধান সমস্যা। কলাশিল্পের ক্ষেত্রে এই সমস্যা এমন রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যার সঙ্গে আমাদেব অন্য কোনো সাংস্কৃতিক সমস্যার (যেমন সাহিত্যের) তুলনা হয় না। . অন্য লোকের সঙ্গে ব্যবসা বিনিময় করতে হলে নিজের কিছু মূলধন আবশ্যক। একজন দেউলিয়া বা কপর্দকহীন ব্যক্তি কারোর সঙ্গে বেসাতি করতে পারেন না। তাই আজ ভাবতীয় শিল্পীরা তাঁদেব প্রাচীন উত্তরাধিকারের সম্পত্তি থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। এতদিন একাজটিকে তাঁরা উপেক্ষাই করেছিলেন। আগামীকাল তাঁরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিনিময়ের সংস্থায় পদাপণ করবেন এবং সেখানে সারা পৃথিবীর সঙ্গে চলবে তাঁদের লেনদেন"[৮৯]।

বিনয়কুমার ও অর্ধেন্দ্রকুমারেব বিতর্ক বাংলার আধুনিক চিত্রকলাব বিকাশে ও বিবর্তনে তাৎপর্যপূর্ণ; এবং এখনকার সাম্প্রতিক চিত্রকলায় বিনয়কুমারের চিত্রবোধ ও ভাবনাই যে কার্যকব হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে অর্ধেন্দ্রকুমারের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে মহত্ত্বপূর্ণ চিত্ররচনা করার মতো শিল্পীর অভাব ছিল না।

২৯ পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক রীতির ধারা

হ্যাভেলের ভাবনা আর অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষায় উদ্দীপিত নব্য-ভারতীয় কলাশিল্পের আন্দোলন যত শক্তিশালী আর ব্যাপকই হোক না কেন, তা কখনোই সর্বজনস্বীকৃত হয়নি। গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক রীতির পরিবর্তে ভারতীয় পরম্পরার চিত্ররীতিকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে রণদাপ্রসাদ গুপ্তের নেতৃত্বে আর্ট স্কুলের ছাত্রদের স্কুল ছেড়ে এসে জুবিলি আর্ট আকাডেমি প্রতিষ্ঠার (১৮৯৭) কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে সারা উনিশ শতক ধরে কলকাতার বুকে পাশ্চাত্যরীতির চিত্রকলার চর্চা এমনই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল যে নতুন কোনো ধারায় শিল্পচর্চার চিন্তা ছিল প্রায় অভাবনীয়। তা ছাড়া সে সময় পাশ্চাত্য সভ্যতা যে প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতার চেয়ে উন্নততর এ ধারণা ইংরেজি শিক্ষিত মানুষের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। তাই দেশের উন্নতির জন্য যেমন পাশ্চাত্যের প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের অনুশীলন অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করা হত, তেমনই কলাশিল্পের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য তেলরঙের ছবি আঁকার প্রকরণকে ভাবা হত প্রাচ্যদেশীয় ঘন ও অনচ্ছ জলরঙের মাধ্যম অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী। রণদাপ্রসাদরা তাই মনে করতেন সাতসাগর পার থেকে যদি কোনো ইংরেজ শিল্প-শিক্ষক এ দেশে শিল্পশিক্ষা দিতে আসেন তবে তিনি তাঁদের নিজেদের পরম্পরার শিক্ষাই দিন, এ দেশের শিল্পশিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁর প্রয়োজন নেই। তাঁরা এও মনে করতেন যে প্রাচ্যরীতিতে শিল্পশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে হ্যাভেল তাঁদের আধুনিক শিল্পপ্রকরণ থেকে বঞ্চিত করছেন। এ দেশের শিল্পশিক্ষার উন্নতি যে পাশ্চাত্য রীতির শিল্পশিক্ষার অনুসরণেই হতে পারে, সে বিষয়ে এঁদের কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। তাই দেখা যায় হ্যাভেল কলকাতায় আসার আগে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুল (১৮৯৩)-এর অধ্যক্ষ, খ্যাতিমান আলোকচিত্রশিল্পী মন্মথনাথ চক্রবর্তী তাঁর স্কুলে ইয়োরোপীয় রীতিতে চিত্রবিদ্যা শেখানোর ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তিনিও বলছেন[১০], "কলিকাতা আর্ট স্কুলটি যে মহাত্মা হ্যাভেল সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে দিনদিন অতীব শোচনীয় অবস্থায় পরিণত হইতেছে তাহা সকলে অবগত হইলেও, বেঙ্গলী ও মিরার প্রভৃতি সুযোগ্য সহযোগিগণ মি. হ্যাভেলের বিরুদ্ধে যেরূপ গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহার উল্লেখ করিয়া বসুমতী সম্পাদক কয়েক সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে যে রূপ তীব্র আলোচনা করিতেছেন, তাহাতে বোধহয় কাহারও বুঝিতে বাকি নাই। বসুমতী সম্পাদক মহাশয়ের উক্তি সম্পূর্ণ সত্য ও যুক্তিযুক্ত, আমরা প্রতি অক্ষরে অক্ষরে তাহা সমর্থন করিতেছি"।

এই পরিস্থিতিতে জুবিলি আর্ট আকাডেমিকে কেন্দ্র করে তখনকার আর্ট স্কুলের সমান্তরালে ইয়োরোপীয় রীতির শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা চালু হয়। এই জুবিলি আর্ট আকাডেমি থেকেই পাশ্চাত্য চিত্ররীতিতে দক্ষ অনেক শিল্পী বেরিয়েছিলেন; যেমন নরেন্দ্রনাথ সরকার, হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, যোগেশচন্দ্র শীল, অভয়াচরণ দাস, অতুলচন্দ্র বসু, প্রহ্লাদচন্দ্র কর্মকার ও বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই সব শিল্পীদের হাতেই এই শতাব্দীর সূচনাকাল থেকে পরবর্তী কয়েক দশক ধরে বাংলা দেশে পাশ্চাত্যরীতির চিত্রকলার ধারা প্রবহমান থাকে। এঁদের সঙ্গে অবশ্যই যে নামটি উল্লেখ করা উচিত সেটি হল যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। যামিনীপ্রকাশ সম্পর্কে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, এবং তিনি বাড়িতে প্রাথমিকভাবে গঙ্গাধর দে ও পরে অবনীন্দ্রনাথের



৪৮ নিসর্গ, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায, আঃ ১৯২৫ খ্রি

সঙ্গে একযোগে ব্রিটিশ রয়াল অ্যাকাডেমিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত চিত্রকর চার্লস পামারের কাছে উন্নতমানের তেল ও জলরঙের ছবি আঁকা শেখেন।

যামিনীপ্রকাশ তাঁর শিল্পীজীবনের শুরুতে মহাভারত ও পুরাণকথার কাহিনী নিয়ে বেশ কয়েকটি 'ঐতিহাসিক' চিত্র এঁকেছিলেন। এই ছবিগুলি প্রশংসা লাভ করে, এমন-কি তাঁর 'কাদম্বরী চিত্র' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি নিবন্ধও লেখেন (প্রদীপ : মাঘ ১৩১৬)[৯]। এই পর্বের তাঁর দুটি স্মরণীয় রচনা হল 'শূদ্রকের রাজসভা' ও 'যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান'। 'ঐতিহাসিক' ছবির সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিসর্গচিত্র রচনাতেও পারদর্শিতা দেখান। বিশেষ করে তাঁর বর্ণোজ্জ্বলতায় সুপ্রশস্ত পদ্মার প্রত্যুষ ও সন্ধ্যার ছবিগুলি দর্শককে অভিভূত করে। ঠিক একইভাবে, সমান নৈপুণ্যে ও মানসিকতায় তিনি ধরে রেখেছেন বিশাল ব্যাপ্ত মৌন হিমালয়ের রূপ। প্রতিকৃতি রচনাতেও তাঁর খ্যাতি ছিল বহুবিস্তৃত। তাঁর অসংখ্য প্রতিকৃতিচিত্রের মধ্যে কয়েকটি হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখা রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা কর্পোরেশনে রাখা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রাখা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। রবীন্দ্রভারতী মিউজিয়মে সংগৃহীত তাঁর আত্মপ্রতিকৃতি এবং অবনীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি দুটিও উল্লেখযোগ্য। শিল্পী হিসাবে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী; তাঁর সৃজনশীলতাও ছিল অপরিমেয়। পাশ্চাত্যরীতিতে ছবি এঁকে যে সব বাঙালি শিল্পী খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে যামিনীপ্রকাশের নামই সবথেকে আগে উল্লেখ করতে হয়।

সম্ভবত বাংলা দেশে পাশ্চাত্যরীতির চিত্রকলাকে প্রবাহিত রাখার ক্ষেত্রেও যামিনীপ্রকাশের অবদান অগ্রগণ্য। গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে অবনীন্দ্রনাথ বিদায় নিলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন যামিনীপ্রকাশ (১৯ জুন, ১৯১৬)। ইতিপূর্বে যেমন আর্ট স্কুলের শিক্ষাধারা অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশে পরিচালিত হয়েছে, যামিনীপ্রকাশ উপাধ্যক্ষ হলে সেই একই নিয়মে স্কুলের শিক্ষাধারা তাঁর দ্বারা পরিচালিত হল। উভয়ক্ষেত্রেই অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউন এ বিষয়ে উপাধ্যক্ষের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। যামিনীপ্রকাশ, বলা বাহুল্য, পূর্ণমাত্রায় পাশ্চাত্যরীতিতে শিক্ষাদানের প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করলেন: এবং তাঁর উপাধ্যক্ষ থাকাকালে—১৯১৬ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত—ভারতীয় রীতির চিত্রশিক্ষা অবহেলিত হল। বিশেষত, চারুকলা বা ফাইন আর্ট বিভাগকে ফাইন আর্ট ও ইন্ডিয়ান আর্ট—এই দুই ভাগে ভাগ করে তিনি ইন্ডিয়ান আর্ট বিভাগটিকে দুর্বল করে ফেলেন। সে সময় এই ইন্ডিয়ান আর্ট বিভাগে একমাত্র যোগ্য শিক্ষক ছিলেন পাটনা কলমের শিল্পী লালা ঈশ্বরীপ্রসাদ। যামিনীপ্রকাশ উপাধ্যক্ষ থাকাকালীন সময়ে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে বেশ কয়েকজন পাশ্চাত্য চিত্রবিদ্যায় কৃতী ছাত্র বেরিয়েছিলেন।

জুবিলি আর্ট আকাডেমির যে সব ছাত্রদের সাধনায় পাশ্চাত্যরীতির চিত্রকলা নব্য-ভারতীয় চিত্রকলার বলিষ্ঠ আন্দোলনের পাশাপাশি জনচিত্তে স্থান করে নিতে পেরেছিল তাঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ সরকার ও যোগেশচন্দ্র শীলের নাম উল্লেখ করা উচিত। নরেন্দ্রনাথ জল ও তেল উভয় রঙেই পারদর্শী ছিলেন। পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য ঐতিহাসিক বিষয়ে ছবি এঁকে তিনি খ্যাতি ও সেই সঙ্গে বর্ধমানের মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। এক সময় তাঁর বহুবর্ণ চিত্রশোভিত 'চিত্রে চন্দ্রশেখর', 'চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ' ও 'চিত্রে শ্রীচৈতন্য' বইগুলির বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল। যোগেশচন্দ্র খ্যাত হন পল্লিবাংলার মনোরম দৃশ্যাবলি, বিশেষ করে বাঙালি ললনার ঘনিষ্ঠ চিত্র ফুটিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে।

তবে বাংলার বাইরেও এই পাশ্চাত্যরীতির ছবি এঁকে যাঁরা সুনাম অর্জন করেছিলেন তাঁরা হলেন অতুলচন্দ্র বসু, হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার ও প্রহ্লাদচন্দ্র কর্মকার। অতুলচন্দ্র প্রথমে জুবিলি



৪৯ জনৈক নবীনার প্রতিকৃতি, অতুল বসু, আঃ ১৯৩০ খ্রি

আর্ট আকাডেমিতে শিক্ষা নিলেও পরবর্তীকালে যামিনীপ্রকাশের অধীনে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে তাঁর চিত্রবিদ্যা সম্পূর্ণ করেন। প্রথম থেকেই তিনি প্রতিকৃতি রচনায় এক অনন্যসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি 'বাঙলার বাঘ' আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একটি পেন্সিলে আঁকা প্রতিকৃতির দ্বারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এরপর একটি বৃত্তি নিয়ে তিনি লন্ডনের রয়াল অ্যাকাডেমিতে গিয়ে শিল্পী ওয়াল্টার রিচার্ড সিকার্ট, চার্লস সিমস ও গ্লিন ফিলপটের সান্নিধ্যে অনুশীলনের সুযোগ পান। দেশে ফিরে কিছুকাল গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে শিক্ষকতার পব দিল্লির ভাইসরয় ও কমান্ডার-ইন-চিফের প্রাসাদে স্থাপনের জন্য বাকিংহাম প্যালেস ও উইন্ডসর ক্যাসেলে রক্ষিত সপ্তম এডওয়ার্ড ও কুইন মেরির ছবির প্রতিলিপি আঁকতে তিনি আবার লন্ডন যান। সেই কাজের সুখ্যাতিব ফলেই অতুলচন্দ্র সারা ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতিচিত্রকর হিসাবে পরিচিত হন। এ দেশের অনেক লোকান্তরিত ও জীবিত নেতার ছবি এঁকে, এবং অজুরায় আরও অনেক প্রতিকৃতি রচনা করে তিনি প্রতিকৃতি-শিল্পী হিসাবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত খ্যাতিব চূড়ায় আসীন ছিলেন। প্রধানত অ্যাকাডেমিক রীতির একনিষ্ঠ অনুগামী হলেও বর্ণ প্রয়োগেব ক্ষেত্রে অতুলচন্দ্র তাঁর স্বকীযতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে অত্যুজ্জ্বল আলোর আবেশে, রঙের ক্ষীণতম তারতম্যে এবং সামান্যতম উজ্জ্বলতর বর্ণের ছোঁয়ায় তিনি তাঁর প্রতিকৃতিগুলিতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্বকীয়তাকে যথাযথ ফুটিযে তুলেছেন। তাঁর হাতে সাধারণ মানুষের কিছু আলেখ্য সহানুভূতি ও সমবেদনায় রূপলাভ করেছে। চরিত্রগতভাবে অতুলচন্দ্রের চিত্র হল অ্যাকাডেমিক বাস্তবতার বিশিষ্ট উদাহবণ। শিক্ষক হিসাবেও তাঁর ভূমিকা স্মবণীয়; পরবর্তী প্রজন্মের বেশ কয়েকজন শিল্পী যাঁরা বাস্তবধর্মী চিত্রবচনার পথ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁকে শিক্ষক হিসাবে পেয়ে গৌবব বোধ করেছেন। অতুলচন্দ্রের স্মরণীয় প্রতিকৃতিচিত্র হল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রাখা বামমোহন রায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, ডবলিউ.সি. বোনারজি এবং মহাত্মা গান্ধী, রাজভবনে রাখা রবীন্দ্রনাথ, রাষ্ট্রপতি ভবনেব রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এশিয়াটিক সোসাইটিতে রাখা এড়ুইন এর্জলি প্রভৃতি। তিনি বহু যত্নে একটি অস্পষ্ট আলোকচিত্র থেকে মধুসূদন পত্নী হেনরিয়েটার প্রতিকৃতি আঁকেন।

পাশ্চাত্যরীতির বাস্তবধর্মী চিত্রকলার ধারাকে সুসংহত করার ব্যাপারেও অতুলচন্দ্র বিশেষ সাংগঠনিক ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই ধারার চিত্রকলার প্রচারেব উদ্দেশ্যে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে 'ইন্ডিযান আকাডেমি অব ফাইন আর্টস' নামে একটি শিল্পসংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাব উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, ভবানীচরণ লাহা, যোগেশচন্দ্র শীল, অনাদি সান্যাল, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং অতুলচন্দ্র বসু। নাটোর ও কাশিমবাজারের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় ও মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রতিষ্ঠানটির পৃষ্ঠপোষকতা কবেন এবং প্রতিষ্ঠানের একটি মুখপত্রও প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি স্থায়ী হয়নি। বরং একই উদ্দেশ্যে আরও ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে সংগঠিত 'দি সোসাইটি অব ফাইন আর্টস' নামে যে সংস্থাটি পরের বছর জন্ম নেয় সেটি সাত বছর টিকে থাকে এবং পাশ্চাত্যরীতির চিত্রকলার প্রচারে বাৎসরিক প্রদর্শনীর আয়োজন করে যথেষ্ট সফলকাম হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির সম্পাদক হন ভবানীচরণ লাহা এবং সহকারী সম্পাদক অতুলচন্দ্র বসু। এইভাবেই, বিশেষ করে হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, অতুলচন্দ্র বসু ও ভবানীচরণ লাহা, ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর সমান্তরালে পাশ্চাত্যরীতির চিত্রকলার আন্দোলনকে সুসংগঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এরপর ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশীয় উভয় রীতির চিত্রকলার পরিপোষকতার আদর্শ সামনে রেখে মহারাজা প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে ও অতুলচন্দ্র বসু প্রমুখের সহযোগিতায় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের পত্তন হয়।



সাঁওতাল রমণী, কিশোরী রায়, ১৯৩৭ খ্রি।

পাশ্চাত্যরীতিতে ছবি এঁকে যাঁরা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার। হেমেন্দ্রনাথ জুবিলি আর্ট আকাডেমিতে চার বছর পেইন্‌টিং শিক্ষা করেন এবং ভারতের বিভিন্ন চিত্র-প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে বহুপ্রশংসিত ও পুরস্কৃত হন। তেল, জল, প্যাস্টেল ও চারকোলের সাহায্যে তিনি ইয়োরোপীয় অ্যাকাডেমিক রীতির চিত্ররচনায় ছিলেন অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী। নারীর আবৃত, অনাবৃত ও অর্ধ-আবৃত কমনীয় দেহরূপের চিত্রণে ২৩
তিনি সেই দক্ষতার বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন। সিক্তবসনা নারীরূপ হল তাঁর এক প্রিয় বিষয়। তা ছাড়া প্রতিকৃতি-শিল্পী হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল ভারতজোড়া। তিনি দেশের নানা অঞ্চলের রাজা-মহারাজাদের ছবি এঁকে প্রসিদ্ধ হন। কাশ্মীরের রাজার আমন্ত্রণে তিনি ছবি আঁকতে কাশ্মীর যান এবং পাতিয়ালার রাজশিল্পীর পদ নিয়ে ছ'বছর (১৯৩২-৩৮) পাতিয়ালায় থাকেন। তাঁর জীবৎকালে যেমন, তাঁর জীবনাবসানের পরেও তিনি তেমনই বহুকাঙ্ক্ষিত শিল্পী। হেমেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যরীতির চিত্রকলার প্রচারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। 'ইন্ডিয়ান আকাডেমি অব আর্ট' সংস্থাটির অফিস ছিল তাঁরই ২৪ নম্বর বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে। এই সংস্থা থেকে 'শিল্পী' নামে একটি আর্ট জার্নাল প্রকাশ তাঁর এক বিশিষ্ট কীর্তি।

পাশ্চাত্যরীতির চিত্রকর্ম আর একজন সাধক শিল্পীর হাতে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিল। তিনি হলেন গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের শিক্ষক প্রহ্লাদচন্দ্র কর্মকার। স্বর্ণকার পিতার অলংকারের নকশায় আকৃষ্ট হয়ে বালক বয়স থেকেই প্রহ্লাদচন্দ্র চিত্রকর্মের দিকে ঝোঁকেন এবং গুণগ্রাহীদের আনুকূল্যে ময়মনসিং-এর মুক্তাগাছা থেকে কলকাতায় এসে জুবিলি আর্ট আকাডেমি ও গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্যরীতির চিত্রবিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন। তিনি ছিলেন বাস্তবধর্মী শিল্পী। সাধারণ মানুষের ছবি আঁকায় তাঁর আগ্রহ ছিল; নৈশচিত্র আঁকায় তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। নানা অর্থকষ্টের মধ্যে থেকেও তিনি শুদ্ধ ছবির জগৎ থেকে কখনও সরে যাননি; বরং নিজের হাতে বহুক্লেশে ছবি আঁকার জন্যে একটি স্টুডিও গড়ে নিয়েছিলেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো নগরীতে অনুষ্ঠিত ৩৯টি রাষ্ট্রের সমকালীন চিত্রকলার এক প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে প্রহ্লাদচন্দ্র ব্রোঞ্জপদক পান। এই প্রদর্শনীতে আধুনিক ইয়োরোপীয় চিত্রকলার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর ছবিও ছিল।

পাশ্চাত্যরীতির শিল্পীদের মধ্যে আরও একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি হলেন সতীশচন্দ্র সিংহ। তিনি আর্ট স্কুলে যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন; কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখেই রোজগারের জন্য তাঁকে অন্য পেশায় ব্রতী হতে হয়। পরে আবার শিল্পচর্চায় ফিরে এসে মুকুলচন্দ্র দে-র অধ্যক্ষতাকালে তিনি আর্ট স্কুলের কমার্শিয়াল বিভাগের শিক্ষক হন (১৯২৯)। অ্যাকাডেমিক রীতির ড্রয়িং-এ সুদক্ষ সতীশচন্দ্র পৌরাণিক চিত্র ও প্রতিকৃতিচিত্র রচনাতে প্রসিদ্ধ হন। একজন শিক্ষক হিসাবে তাঁর সুনাম ও ছাত্রপ্রিয়তা এখনও অম্লান।

আর্ট স্কুলের অপর একজন খ্যাতিমান শিক্ষক হলেন বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। প্রথমে জুবিলি আর্ট আকাডেমি ও পরে আর্ট স্কুলে যামিনীপ্রকাশের অধীনে তাঁর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা। চার বছর হোলকার রাজ্যের রাজশিল্পী পদে থেকে তিনি ইয়োরোপে যান। 'প্যারিস আকাদেমি জুলিয়েন'-এ অধ্যাপক বুশারের কাছে পেইনটিং অনুশীলন করে তিনি দেশে ফিরে আসেন। দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর (১৯৩০-৫৬) কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের ফাইন আর্ট বিভাগের শিক্ষক হিসাবে তিনি আজকের অধিকাংশ প্রবীণ শিল্পীসহ বহু কৃতী ছাত্র তৈরি করার গৌরবের অধিকারী। বসন্তকুমার প্রধানত একজন দক্ষ প্রতিকৃতিচিত্রকর রূপে পরিচিত। কিন্তু তিনি জলরঙে কিছু ভারতীয় রীতির ছবিও এঁকেছিলেন এবং কার্টুন আঁকায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর প্রকাশিত 'ইন্ডিয়ান কার্টুন্‌স' পত্রিকায় গগনেন্দ্রনাথের কয়েকটি ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হয়েছিল। বসন্তকুমারের পর আর্ট স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত কিশোরী রায় ও সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ পাশ্চাত্য চিত্রকলার ক্ষেত্রে কী শিক্ষক হিসাবে কী শিল্পী হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। আর্টস্কুলের ২৮
কমার্শিয়াল বিভাগের শিক্ষার্থী কুশলকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ দক্ষতা লক্ষ করা যায় নিসর্গচিত্রে।



৫১ নিসর্গ, ভোলা চট্টোপাধ্যায, আঃ ১৯৩০ খ্রি

৩০ আধুনিকতার প্রবর্তনা : গগনেন্দ্রনাথ-যামিনী রায়-রবীন্দ্রনাথ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভাবনীয় ধ্বংসলীলা আর অমানবিকতা কেবল ইয়োরোপের সভ্যতাকেই বিপর্যস্ত করেনি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও, এমন-কি ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের উপনিবেশগুলির ওপরও, তার ব্যাপক ও গভীর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। এই যুদ্ধ ভারতীয়দের মধ্যে, বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। যুদ্ধশেষে ইয়োরোপে যেমন এ দেশেও তেমনই যুদ্ধপূর্বকালীন জীবন সম্পর্কিত প্রত্যয়গুলিকে আর ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। চিরায়ত আদর্শ আর মূল্যবোধগুলির প্রতিও অবিশ্বাস দেখা দিচ্ছিল। জাগছিল নানা প্রশ্ন। জীবনের ক্ষেত্রে যেমন সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও তেমনই এক পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। সাহিত্য ও শিল্পের আদর্শায়িত রূপের প্রতি আগ্রহ ক্রমশই কমে যাচ্ছিল। এমন-কি যে স্বদেশী ভাবনার অনুপ্রেরণায় জন্ম নিয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলা, তার চরিত্রও বদলে যেতে শুরু করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাদেশিকতার পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণাও বিস্তারলাভ করছিল—ছড়িয়ে পড়ছিল রুশ বিপ্লবের কথা। সাহিত্য ও শিল্পও তাই তার রোমান্টিক পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে আসতে সচেষ্ট হল। নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার পুরাণ-নির্ভর অতীতচারিতা আর কাব্যাশ্রয়ী কল্পনাবিলাস সে সময় বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কাছে প্রায় পলায়নী মনোবৃত্তির সামিল বলে মনে হল। ফলে স্বভাবতই কী বিষয়-ভাবনায় কী আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সৃজনশীল শিল্পীরা নতুনতর পথের সন্ধানী হলেন। তাঁদের কাছে পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক রীতির অনুগামী যে সব শিল্পী তাঁদের কাজও পশ্চাদ্‌মুখী বলেই বিবেচিত হল। তার একটা বড় কারণ এই যে এ সময় বাঙালি শিল্পীরা ইংল্যান্ডের রয়েল অ্যাকাডেমির কিংবা প্রি-রাফেলাইট শিল্পীদের কাজের বাইরে ইয়োরোপের মূল ভূখণ্ডের, বিশেষ করে ফ্রান্স ও জার্মানির শিল্পীদের আধুনিক ভাস্কর্য ও চিত্রকলার সঙ্গে সরাসরি পরিচয়ের সুযোগ পেতে শুরু করেছিলেন।

বিশের দশকে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে, এই পরিবর্তিত পরিবেশেই বাংলার চিত্রকলার বহুমুখী বিকাশ সূচিত হল। এই বিকাশে দুটি ধারা স্পষ্ট। একটি ধারায় দেখা গেল কয়েকজন বরেণ্য শিল্পী তাঁদের নিজ নিজ আদর্শ ও অভিরুচি অনুযায়ী চিত্ররচনা করে আধুনিক চিত্রকলার ভাষাকে সমৃদ্ধ ও বিচিত্রগামী করে তুলছেন, অন্যদিকে কোনো কোনো শিল্পী চিত্রকলাকে সচেতনভাবেই কল্পনার মণিকোঠা থেকে নামিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনের কাছাকাছি এনে হাজির করতে প্রয়াসী হচ্ছেন। এই দুই ধারাই দুইভাবে, একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে, অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার প্রাচ্য শিল্পাদর্শ আশ্রিত ছাঁচের বাইরে বাংলার চিত্রকলাকে সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হল।

আশ্চর্যজনকভাবেই ব্যক্তিগত অনুসন্ধিৎসা আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যে শিল্পী প্রথম নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি হলেন অবনীন্দ্রনাথ-অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথ—নব্য-বঙ্গীয় শৈলীর আন্দোলনকে সুসংগঠিত করেছিল যে 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট' তার কর্ণধার। গগনেন্দ্রনাথ যে-কেবল বাংলার চিত্রকলাতেই প্রকৃত অর্থে 'আধুনিকতা'র সচেতন সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন, তা নয়। সারা ভারতের চিত্রকলার ইতিহাসেও



৫২ সংস্কারমুক্ত হিন্দু, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯২১ খ্রি



৫৩ আলোছায়া, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আঃ ১৯২২ খ্রি

তাঁকে বলা যায় আধুনিকতার পথিকৃৎ। গগনেন্দ্রনাথ বেশি বয়সে চিত্রকলা চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন এবং তিনি প্রথম দিকে অবনীন্দ্রনাথের পাশাপাশি জাপানি কালি-তুলির কলাকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন ওকাকুরা প্রেরিত জাপানি শিল্পীদের কাছ থেকে। এই পদ্ধতিতে এবং তারপর অবনীন্দ্রনাথের ওয়াশরীতিতে তিনি প্রতিকৃতি, নিসর্গ, ঐতিহাসিক (যেমন চৈতন্য-জীবনাশ্রিত) চিত্র এঁকে প্রভূত খ্যাতির অধিকারী হন। তা ছাড়া লিথোগ্রাফ পদ্ধতিতে ৫২
সমাজসচেতন 'ব্যঙ্গচিত্র' এঁকেও তাঁর স্বকীয় শৈলীর বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হন তিনি। এইভাবে নানা ধরনের ছবি আঁকার পর তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে 'কিউবিস্ট'ধর্মী ছবিতে—আর এই নতুন ধারার ছবির মধ্য দিয়েই তাঁর শিল্পপ্রতিভা স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে ওঠে।

গগনেন্দ্রনাথের এই নতুন ধারার ছবিগুলি · যাকে স্টেলা ক্রামরিশ আখ্যা দিয়েছেন কিউবিস্টধর্মী—সৃজনকালে বাংলা দেশে প্রচলিত চিত্ররীতিগুলি থেকে এতই স্বতন্ত্র, এতই ভিন্ন-গোত্রীয় ছিল যে তাদের যথাযথ মূল্যায়ন সে সময় ঘটে ওঠেনি। এমন-কি এই ছবিগুলির মধ্য দিয়ে বাংলার চিত্রকলা যে বিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় আধুনিক চিত্রকলার দিকে পা বাড়িয়েছে সে কথাও কেউ স্পষ্ট করে বলেননি। তবে তাদের মধ্যে যে আধুনিক রূপরীতির লক্ষণ রয়েছে সে কথা কোনো কোনো আলোচক উল্লেখ করেছেন।

গগনেন্দ্রনাথের এই নতুন ধারার ছবিগুলিতে এমন এক দৃশ্যজগৎ রূপলাভ করল যা প্রধানত কল্পলোকের এবং সেই কারণেই বলা যেতে পারে বিষয়ের বিচারে সুররিয়ালিস্ট বা পরাবাস্তববাদী চরিত্রের। কিন্তু এদের রচনারীতিতে, বিশেষ করে চিত্রপটকে বিভিন্ন মাত্রিকতায় বিভাজিত করে উপস্থাপন করার কারণে, কিউবিস্ট বা ঘনত্ববাদী ছবির আদল লক্ষ করা যায়। আর তাই সাধারণভাবে গগনেন্দ্রনাথের এই ছবিগুলি কিউবিস্টিক বা ঘনত্ববাদী ধরনের ছবি বলে পরিচিত। ফলে প্রশ্ন উঠেছে এই আধুনিক চরিত্রের ছবি আঁকার অনুপ্রেরণা তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন? তাঁর নানা ধরনের চিত্রাবলির ক্রম বা সময়তালিকা এখনও সুনির্দিষ্ট হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা সুনিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে তিনি এই ধারার ছবি আঁকতে শুরু করেন ১৯২০-২১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। কেননা ১৯২২-এর জুলাই মাসের 'রূপম্' পত্রিকায় গগনেন্দ্রনাথের এই নতুন ধারার কয়েকটি চিত্রের প্রতিলিপি স্টেলা ক্রামরিশের 'অ্যান ইন্ডিয়ান কিউবিস্ট' নামক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। গগনেন্দ্রনাথ যে আধুনিক ইয়োরোপীয় কলাশিল্পের সঙ্গে পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থের মাধ্যমে পরিচিত ছিলেন তা একাধিক সূত্র থেকে জানা যায়[৫২]। তাঁর এই পরিচয়ই মনে হয় তাঁকে 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এর সম্পাদক হিসাবে ১৯২২-এর ডিসেম্বরে জার্মান বাউহাউস-গোষ্ঠীর চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করতে আগ্রহী করে তুলেছিল। এই বাউহাউস গোষ্ঠীর শিল্পীরা—বিশেষ করে লিওনেল ফেনিংগার—সম্ভবত গগনেন্দ্রনাথের ছবির ওপর কিছু প্রভাব ফেলেছিলেন। কিন্তু তাঁর ছবির প্রকৃত প্রেরণা যে তাঁর নিজস্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য থেকেই এসেছিল—এ কথা তথ্য-প্রমাণের সাক্ষ্যে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

কিউবিস্টদের ছবির সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের কল্পলোক-বিষয়ক ছবিগুলির আপাতসাদৃশ্য থাকলেও তাদের মধ্যে একটা বড় রীতিগত পার্থক্য আছে। কিউবিস্টরীতির ছবির জন্ম হয়েছিল ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের হাতে ছবির রূপ-নির্মিতিক্ষেত্রে তরলতা প্রশ্রয় পাওয়ার প্রতিবাদে। আর তাই এই রীতি বিশেষ গুরুত্ব দেয় চিত্রে রূপায়িত বস্তুর গড়নের ওপর। এই গড়নকে বিশ্লেষণ-ধর্মিতায় একই সঙ্গে নানা দিক থেকে চিত্রপটের নিজস্ব রূপশৃঙ্খলায় তুলে ধরাই ছিল তার প্রাথমিক লক্ষ্য। গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের মূলে রয়েছে গড়নের পরিবর্তে আলো এবং তার বিপরীতে ছায়ার গতি-প্রকৃতির বিশ্লেষণ। গগনেন্দ্রনাথ যুবাবয়স থেকেই ফোটোগ্রাফিতে আগ্রহী

ছিলেন—এবং তাঁর বহু সময় কেটেছে তাঁর বাড়ির ডার্করুমে। তাই ফোটোচিত্রের মূলে যে আলোছায়ার দ্বন্দ্ব তারই ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতায় জন্ম নেয় তাঁর কালো-সাদায় আঁকা কিউবিস্টধর্মী ছবিগুলি। ডার্করুমের বাইরে, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের আলো-আঁধারি জগৎও তাঁকে অনুপ্রাণিত করে এই রীতিতে স্থাপত্যরূপ-নির্ভর ছবিগুলি আঁকতে। এ ছাড়া তাঁর অভ্যাস ছিল 'প্রিজম'-এর ওপর সূর্যকিরণের প্রতিফলনে জাত সাতরঙের ইন্দ্রজাল লক্ষ করা। রঙিন যে সব ছবি তিনি তাঁর এই নতুন রীতিতে এঁকেছিলেন তার অনেকগুলিই—যেমন 'সাত ভাই চম্পা' কিংবা 'আলাদিনের গুহা'—তাঁর এই 'প্রিজম' পর্যবেক্ষণেরই ফলশ্রুতি। তিনি যে বেশ কিছুকাল থেকেই চিত্রপটে আলোর বিচ্ছুরণকে বিশেষভাবে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন তা বোঝা যায় ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে আঁকা কলকাতার জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে কবিতা পাঠরত দীর্ঘকায় রবীন্দ্রনাথের ছবিটিতে। তাঁর আঁকা সিল্যুট প্রতিকৃতিচিত্রগুলি—যাঁর অন্যতম তাঁর শেষ ছবি বলে পরিচিত পাশ থেকে দেখানো আত্মপ্রতিকৃতিটি—এই আলো-ছায়ার খেলাকেই তার সবথেকে সরল বিন্যাসে প্রকাশ করেছে।



৫৪ কলকাতার গলি, যামিনী রায়, আঃ ১৯৪০ খ্রি

গগনেন্দ্রনাথের কল্পলোকাশ্রিত আশ্চর্যজনক ছবিগুলির আর এক অনুপ্রেরণা মনে হয়
আধুনিক মঞ্চসজ্জা এবং তাতে আলোর প্রয়োগ। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' ইত্যাদি নাটকের
মঞ্চসজ্জার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকার কথা সকলেরই জানা। মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে ইয়োরোপের
আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে তিনি পত্র-পত্রিকা মারফত পরিচিত ছিলেন। তাঁর ছবিতে তাই
গর্ডন ক্রেগ, ভলাদিমির তাৎলিন, এমিল পিরচান, ভাল্টার রাইমার প্রমুখ আধুনিক
মঞ্চ-নির্দেশকদের কাজেব খসড়া ছবিগুলি অনুপ্রেরণার কারণ হয়েছিল। বিশেষ করে চিত্রপটে
আলোছায়ার প্রক্ষেপণের সাহায্যে বিস্তৃত স্পেস বা অবকাশ সৃষ্টির যে অনবদ্য দক্ষতা তাঁর
কোনো কোনো ছবিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা এই মঞ্চ রচনার আধুনিক প্রয়োগরীতিরই
অভিজ্ঞতাজাত।

আলোছায়ার খেলাকে যে কত বিচিত্রভাবে কত ব্যাপ্তি আব গভীরতায় চিত্রপটে প্রয়োগ করা
যায় তা গগনেন্দ্রনাথের এই কিউবিস্টধর্মী ছবিগুলি দেখলে বোঝা যাবে। এই নানামুখী
আলোছায়া-নির্ভর ছবির প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর 'রাজকন্যা' (১৯২৫), 'হিমালয়ের সংগীত' ২৬
(১৯২৫), 'মানবাত্মার বৈতরণী অতিক্রম' (১৯২৯), 'আত্মার সোপানারোহণ' (১৯২৯),
'উচ্চহাস' (১৯৩০) প্রমুখ ছবিগুলি উল্লেখ্য। আলোছায়ার দ্বন্দ্ব-মিলনে রচিত এই ছবিগুলির
মধ্যে বতন পাবিমু[৯৩] ইয়োরোপের 'ফিউচারিস্ট' বা ভবিষ্যদ্‌বাদী শিল্পীদের কাজের চরিত্রলক্ষণ
দেখতে পেয়েছেন। এ ধরনের সাদৃশ্য মূলগত না আপাত সে প্রশ্ন অবশ্যই থাকতে পারে। কিন্তু
এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে গগনেন্দ্রনাথের এই পর্বের ছবিগুলি একদিকে আধুনিক মনোবিদ্যার
পরিচয় বহন করে এবং অন্যদিকে দর্শকের মনে জাগিয়ে তোলে এক বিস্ময়কর বিষণ্ণ
অনুভূতিবোধ।

গগনেন্দ্রনাথ তাঁর নতুন ধারার ছবি যখন আঁকতে শুরু করেন, তাব পরপরই, বিশের দশকের
গোড়াতে, যামিনী রায় তাঁর চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বাংলার পটচিত্রের আদলে আধুনিক
চিত্রকলায় এক নতুন মাত্রা যোগ করলেন। যামিনী রায় জন্মেছিলেন বাঁকুড়া জেলাব
বেলিয়াতোড় গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে (১৮৮৭ খ্রি)। তাঁর বাবা ছিলেন সৌখিন শিল্পী,
তাই তাঁর প্রভাব ছেলের ওপব পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু মনে হয় তার চেয়েও বেশি প্রভাব
ফেলেছিল বেলিয়াতোড়ের নিসর্গ আর জীবন। বেলিয়াতোড়ের অবস্থান সেই অঞ্চলে যেখানে
পশ্চিমের উঁচুনিচু প্রান্তর আর দক্ষিণেব সমভূমি এসে মিলেছে—সেই সঙ্গে মিলেছে দুই ভিন্ন
সংস্কৃতি—বন্ধুর বনাঞ্চলের সাঁওতাল উপজাতির আর সমতলের বাঙালির। এই গ্রামের কুমোর-
পাড়ার পরম্পরাগত পুতুল গড়ার সঙ্গে যামিনী পরিচিত হন শৈশবেই! বলা যেতে পারে, এই
কুমোরপাড়াতেই সরল সৌষ্ঠবের রূপ-নির্মিতিতে তাঁর হাতেখড়ি।

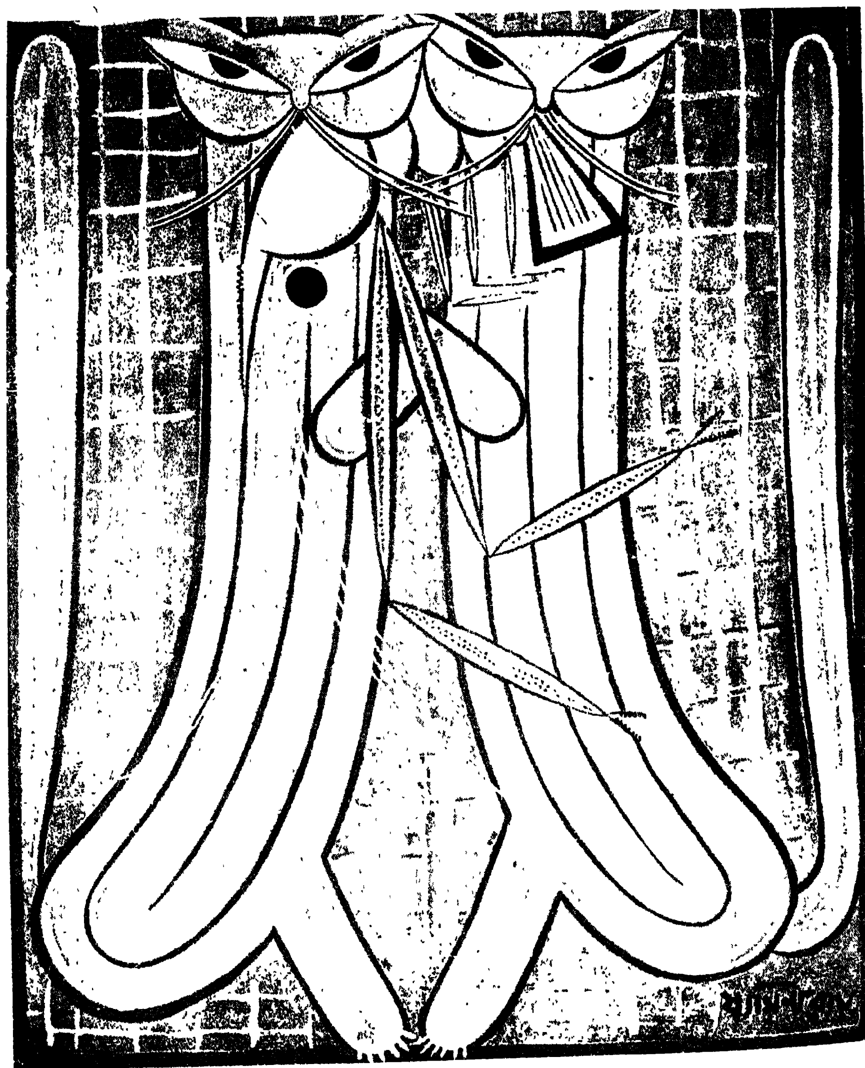
পিতার আগ্রহে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে যামিনী শিক্ষা নেন আট বছর—১৯০৬ থেকে
১৯১৪। সে সময় অবনীন্দ্রনাথ উপাধ্যক্ষ পদে থাকলেও তিনি ফাইন আর্ট বিভাগে ইয়োরোপীয়
অ্যাকাডেমিক রীতির চিত্রবিদ্যা গ্রহণ করেছিলেন। এই রীতির করণকৌশলে তিনি বিশেষ দক্ষতা
অর্জন করে পেশাদার শিল্পীর জীবন শুরু করেন। কিছু কিছু প্রতিকৃতিচিত্র এঁকে, কখনও বা
পুরনো তেলরঙের ছবির জীর্ণোদ্ধার করে, কখনও বা থিয়েটারের স্ক্রিন এঁকে কেটেছিল তাঁর
প্রথম জীবন। কিন্তু শিল্পী হিসাবে তাঁর অনুসন্ধিৎসার অভাব ছিল না—বিশেষ করে যেহেতু তাঁর
মন অ্যাকাডেমিক রীতির প্রাণহীন কাজে তৃপ্তি পেত না। তাই দেখা গেল তিনি ইয়োরোপের
আধুনিক চিত্রকলার দিকে ঝুঁকছেন—তাঁকে আকৃষ্ট করছেন পোস্ট-ইম্‌প্রেশনিস্ট ৫১
শিল্পীরা—সেজান,ভ্যান গগ আর গগ্যাঁ। তেলরঙে আর টেম্পেরাতে করা তাঁর কয়েকটি
নিসর্গচিত্র আর ভ্যান গগের আত্মপ্রতিকৃতির একটি অনুলিপিতে তাঁর এই সময়কার পরীক্ষা-
নিরীক্ষার পরিচয় মেলে। পাশাপাশি নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার ভাব ও ভাবনায় তেলরঙে তিনি

কয়েকটি গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনের ঘনিষ্ঠ দৃশ্যও এঁকেছিলেন। এই দুই ধারার ছবিতেই তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে—তা হল চিত্রপটে বস্তুবিন্যাসের সারল্য। প্রধানত এই বিন্যাস আনুভূমিক ও লম্বমান বস্তুর সহজ সমন্বয়ে রচিত। তা ছাড়া দেখা যায়, একদা অ্যাকাডেমিক রীতিতে পারদর্শী হলেও তিনি চিত্রপটে মূল বিষয়কেই প্রাধান্য দিচ্ছেন এবং অনুপুঙ্খকে পরিহার করছেন পুরোপুরিভাবে। কিন্তু এই সব ছবিতে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়লেও, তিনি তা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। শেষজীবনে তিনি যেমন নিজেই বলেছেন, তাঁর লক্ষ্য ছিল একটাই—তাঁর ছবি যেন অন্য সকলের ছবির থেকে আলাদা হয়—তা সে ভালোই হোক বা মন্দই হোক।

যামিনী রায়ের শিল্পীজীবনের সাফল্যের মূলে রয়েছে তাঁর এক বিশেষ উপলব্ধি। তা হল তিনি একজন শিল্পী হিসাবে ইয়োরোপীয়দের মতো, কিংবা চীনা বা তিব্বতীয়দের মতো ছবি আঁকতে পারেন না, যেমন পারেন না পারসিক বা মুঘল চিত্রকরদের মতো আঁকতে—কেননা তিনি এঁদের পরিবেশের মানুষ নন। এই উপলব্ধিই একজন প্রকৃত বাঙালির মতো, বাংলার নিজস্ব পরম্পরায় ছবি আঁকতে উদ্‌বুদ্ধ করল তাঁকে। তিনি ফিরে গেলেন শহর কলকাতা ছেড়ে বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় গ্রামে—নতুন করে অনুশীলন করলেন বাংলার পরম্পরার পটচিত্রের করণকৌশল, দেশজপদ্ধতিতে রং করার প্রকরণ, আর পটুয়াশিল্পীর পটে কাহিনী বর্ণনার ধরনধারণ। তিনি তাঁর ইয়োরোপীয় রীতির চিত্রশিক্ষার আড়ম্বর আর জটিলতাকে পরিহার করে ব্রতী হলেন দেশজ রীতির আলেখ্য রচনায়। তিনি চিত্রকলার আদিতম ও শুদ্ধতর রূপের দিকে ঝুঁকলেন—শিক্ষা নিতে থাকলেন যেমন পটুয়াদের ছবি থেকে তেমনই শিশুদের আঁকা থেকেও। তাঁর কাছে ক্রমে ক্রমে চিত্রের গড়ন হল পরিত্যক্ত—চিত্রকে তার দ্বিমাত্রিকতায় পরিপূর্ণতাদানই তাঁর শৈলীর চরিত্রলক্ষণ হয়ে উঠল।

বিষয় নির্বাচনেও প্রাধান্য পেল গ্রামজীবন আর গ্রামের মানুষের প্রিয় ধর্মকাহিনী। তাঁর অনেক ছবিই রচিত হল সাঁওতালদের নিয়ে—তাদের মিলিত নৃত্যগীত, মাদলবাদন, সাঁওতালি রমণীর প্রসাধন আর সাঁওতাল জননী ও শিশু। অন্যপক্ষে, তাঁর ছবি আশ্রয় করেছে রামায়ণের কাহিনী, চৈতন্যজীবন, কৃষ্ণ-রাধা-বলরামের লীলা, এমন-কি যীশুর জীবনকথাও। কিন্তু সবই ২৭
পটচিত্রের বাক্‌ভঙ্গিতে—রঙ ও রেখায় এই সব কাহিনী বাস্তবধর্মিতাকে প্রতিফলিত না করে হয়ে উঠেছে প্রতীকধর্মী। এ সব ছবিতে কোনো চরিত্রই ভাবে ও ভঙ্গিতে বিশেষ হয়ে ওঠে না—সকলেই রূপায়িত হয় সাধারণ ধর্মে। যেমন দেখা যায় লোকচিত্রকলায়, রেনেসাঁস-পূর্ব বাইজেন্টাইন চিত্ররীতি, এবং পশ্চিমভারতের জৈন-পুথিচিত্রে। এই সব সূত্র থেকেও মনোযোগী অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা নিয়েছেন তিনি। এইভাবেই তাঁর চিত্রশৈলী কেবলমাত্র বাংলার পটচিত্রনির্ভর না থেকে হয়ে উঠেছে সর্বদেশের চিত্রকলার আদিম রীতির উত্তরসূরি। তাঁর শৈলীর অনুপ্রেরণা যাই হোক না কেন, তাঁর নিজস্ব পরিমিতিবোধ আর রেখা ও রঙের ছন্দোময় বিন্যাসের পারদর্শিতাই তাঁর ছবির প্রকৃতিকে নির্দিষ্ট করেছে। চিত্রপটের রূপবিন্যাসে তিনি পটচিত্র অপেক্ষা বাংলার মন্দিরগাত্রের মাটির ফলকের রূপনির্মিতির ভারসাম্য থেকে শিক্ষা নিয়েছেন বেশি। আবার রঙের ব্যবহারেও পটুয়াদের মতো বিষম বর্ণের প্রয়োগ না করে তিনি সুষম বর্ণের পারস্পরিক ঐক্যের মধ্য দিয়ে চিত্রকে করে তুলেছেন মনোরম। তাঁর চিত্র তাই বহু ক্ষেত্রেই আলংকারিক রূপ লাভ করেছে।

যামিনী রায় তাঁর এই নিজস্ব চিত্র-ভাষায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে ছবি এঁকেছেন। তিনি একজন জাতপটুয়ার মতোই গুণগত উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে ছবির সংখ্যাগত আধিক্যের ওপরও জোর দিয়েছেন। তিনি চেয়েছেন তাঁর ছবি যাতে সহজলভ্য হয়—কেবল ধনীর প্রাসাদে নয়,

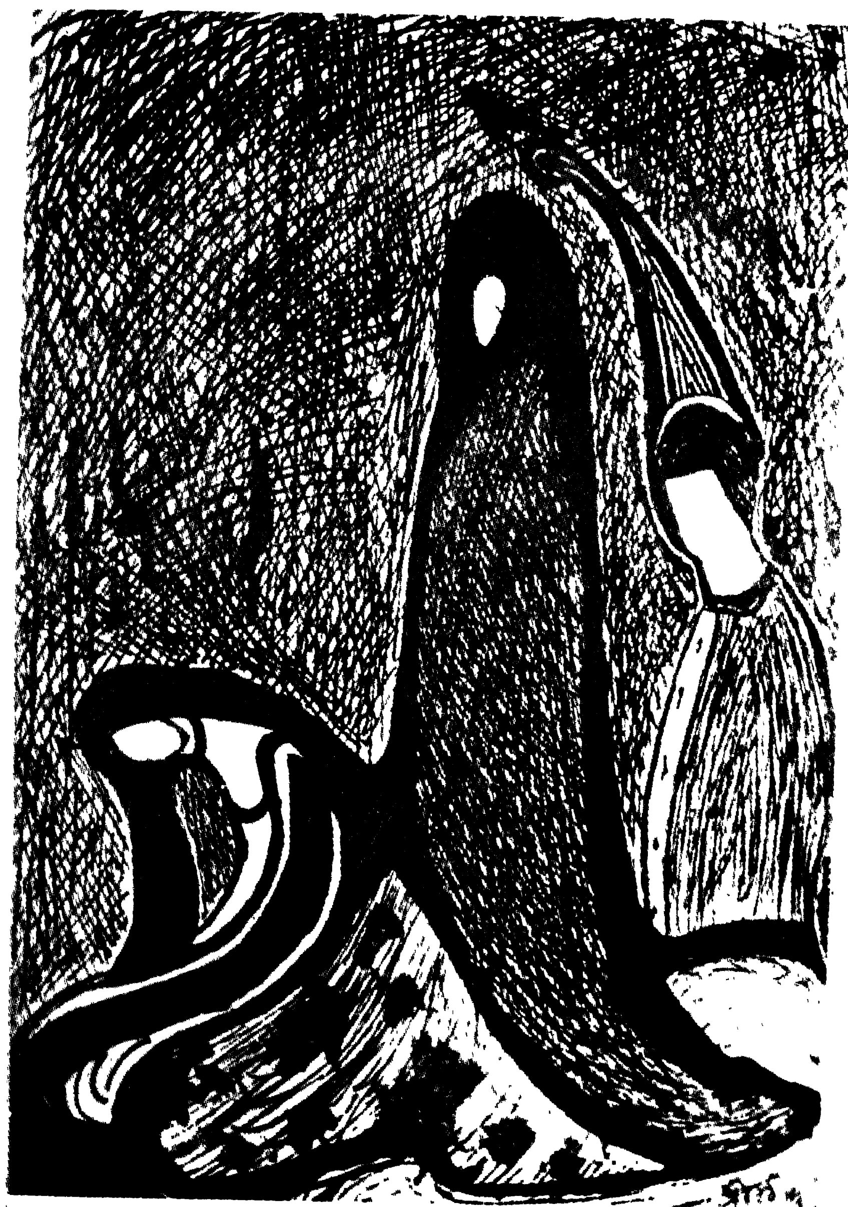


৫৫ চিংড়ি মুখে জোড়া বেড়াল, যামিনী রায়, আঃ ১৯৫০ খ্রি

মধ্যবিত্তের ঘরেও ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এ কথা ভাবলে ভুল হবে যে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি চিত্ররচনায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। বরং তাঁর ছবির নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাতার আলোচনা থেকে জানা যায় অন্ততপক্ষে এগারোটি পর্বে তাঁর চিত্র-ভাষা বিবর্তিত হয়েছে[১৪]। প্রথম পর্বে তাঁর ছবি যতখানি গ্রামবাংলার পটুয়াদের কাজের সমগোত্রীয়, দ্বিতীয় পর্বে তা ততখানিই কালীঘাটের পটের কাছাকাছি। এ পর্বে তাঁর রেখা ও রং গড়নধর্মী হয়ে উঠেছে। অথচ দেখা যায় এর পর থেকে ক্রমশই তিনি ভাস্কর্যস্বরূপ গড়নধর্মিতাকে ছেড়ে দ্বিমাত্রিকতায় চিত্রপটের সমতলতাতেই রূপ দিয়েছেন তাঁর বিষয়কে। চিত্রপটে পরিপ্রেক্ষিত বা অবকাশ সৃষ্টি না করে কাহিনীর কুশীলবদের ওপর-নিচে বিন্যস্ত করে পটচিত্রের আদর্শেই বর্ণনা করেছেন ঘটনাবলি। শেষের দিকে কাহিনী ছেড়ে তিনি রাধা, কৃষ্ণ, যিশু, জননী ও শিশু ও অন্যান্য বিষয় এঁকেছেন স্বাবলম্বীভাবে—একক গুরুত্বে। বাইজেন্টাইন মোজেইকের মতো করে রঙের স্তবক দিয়েও রচনা করেছেন কোনো কোনো ছবি। যামিনী রায় এইভাবেই একই সঙ্গে ইয়োরোপীয় অ্যাকাডেমিক রীতির প্রাণহীনতা আর নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার ভঙ্গুরতা, পেলবতা ও পাণ্ডুরতা থেকে বাংলার আধুনিক চিত্রকলাকে সরিয়ে এনে তার নিজস্ব পরম্পরার পটচিত্রের আদলে, বিশেষ বর্ণাঢ্যতায় আর ছন্দোময়তায়, প্রাণস্পন্দিত করে তোলেন। তাঁর উদাহরণেই পরবর্তী শিল্পীদের অনেকেই আপন আপন চিত্রভাষা গড়ে তুলতে লোকশিল্পের ঐশ্বর্যের দিকে ঝুঁকেছেন। বিষয়ের সর্বজনীন আবেদনে, শৈলীর নয়নাভিরাম প্রসাদগুণে তাঁর ছবি চিত্রবিমুখ মানুষেরও চিত্ত জয় করে নেয়। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার চাপের মধ্যে, সামাজিক অস্থিরতা আর অনিশ্চয়তার মধ্যে তাঁর ছবি আশীর্বাদের মতো, স্নেহস্পর্শের মতো কাজ করে।

যামিনী রায়ের পর যাঁর হাতে আধুনিক বাংলার চিত্রকলা একেবারে সাম্প্রতিক হয়ে ওঠে তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। ছবির জগতে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ এক আকস্মিক বিস্ফোরণের মতোই। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও গীতিকারের সম্মানে যখন তিনি বিশ্বময় বন্দিত, সেই সময়, তাঁর সত্তর বছর বয়স নাগাদ রবীন্দ্রনাথ আবেগের সঙ্গে ছবি আঁকায় মন দিয়েছিলেন। তার আগে প্রথম যৌবন থেকেই, তিনি ছিলেন চিত্রকলার প্রতি আগ্রহী—অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও নন্দলালের মতো প্রতিভার পরিপোষক : কিন্তু নিজে তিনি কখনও যে ছবির মাধ্যমে তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার অভিব্যক্তি ঘটাবেন সে চিন্তা তাঁর ছিল না। এমন-কি, তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে বিদেশে ও দেশে তাঁর ছবি কয়েকটি প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ও উচ্চপ্রশংসিত হলেও ছবির ক্ষেত্রে তাঁর সংশয় কাটেনি। ১ জানুয়ারি ১৯৩৫-এর এক চিঠিতে অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি তাই লিখেছেন[১৫] : "তোমরা লণ্ডনে আমার ছবি দেখাতে চাও, আমি কিন্তু মনে উৎসাহ পাই নে—আমার ছবি এতই যূথভ্রষ্ট শ্রেণীহারা এতই অশিক্ষিত আঙুলের খেলামাত্র যে ওগুলোকে সমজদারের দৃষ্টির কাছে ধরতে আমি কুণ্ঠিত"।

বাস্তবিকই ছবির জগতে তাঁর প্রবেশ একরকম 'আঙুলের খেলা'র মধ্য দিয়েই। এই খেলা তিনি খেলেছেন তাঁর অসংখ্য পাণ্ডুলিপির সংশোধনের প্রয়োজনে—পাণ্ডুলিপির কাটাকুটিও যেন কুৎসিত আর সামঞ্জস্যহীন হয়ে না পড়ে সেদিকে ছিল তাঁর শিল্পীজনোচিত উৎকণ্ঠা। এইভাবেই পাণ্ডুলিপির পরিত্যাজ্য অংশ কাটাকুটি করতে করতেই তাঁর লেখার পাতায় নানা রূপ ফুটে উঠতে শুরু করেছিল—আর সেই রূপকেই দিনে দিনে স্পষ্টতর করে তোলার মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল তাঁর ছবি। এটা ঘটেছিল ১৯২৪-এ, যখন তিনি আর্জেন্টিনার বুয়েনস এয়ারস শহরে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর অতিথি হয়ে রয়েছেন আর লিখছেন 'পূরবী'র নানান কবিতা। এই সময় এই কবিতার সংশোধনীর সময়েই তাঁর কাটাকুটি ছবি হয়ে উঠেছিল। তারপর সম্ভবত কিছুদিন স্তিমিত থেকে ১৯২৮ নাগাদ তিনি বিশেষভাবেই ছবির দিকে ঝুঁকতে শুরু



৫৬ নারী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আঃ ১৯২৫-৩০ খ্রি



১৭ অজ্ঞাতনামা শিল্পী (কালীঘাট পটশৈলী অনুসরণে কাচের ওপর আঁকা), বারাঙ্গনা, উনিশ শতকের শেষপাদ



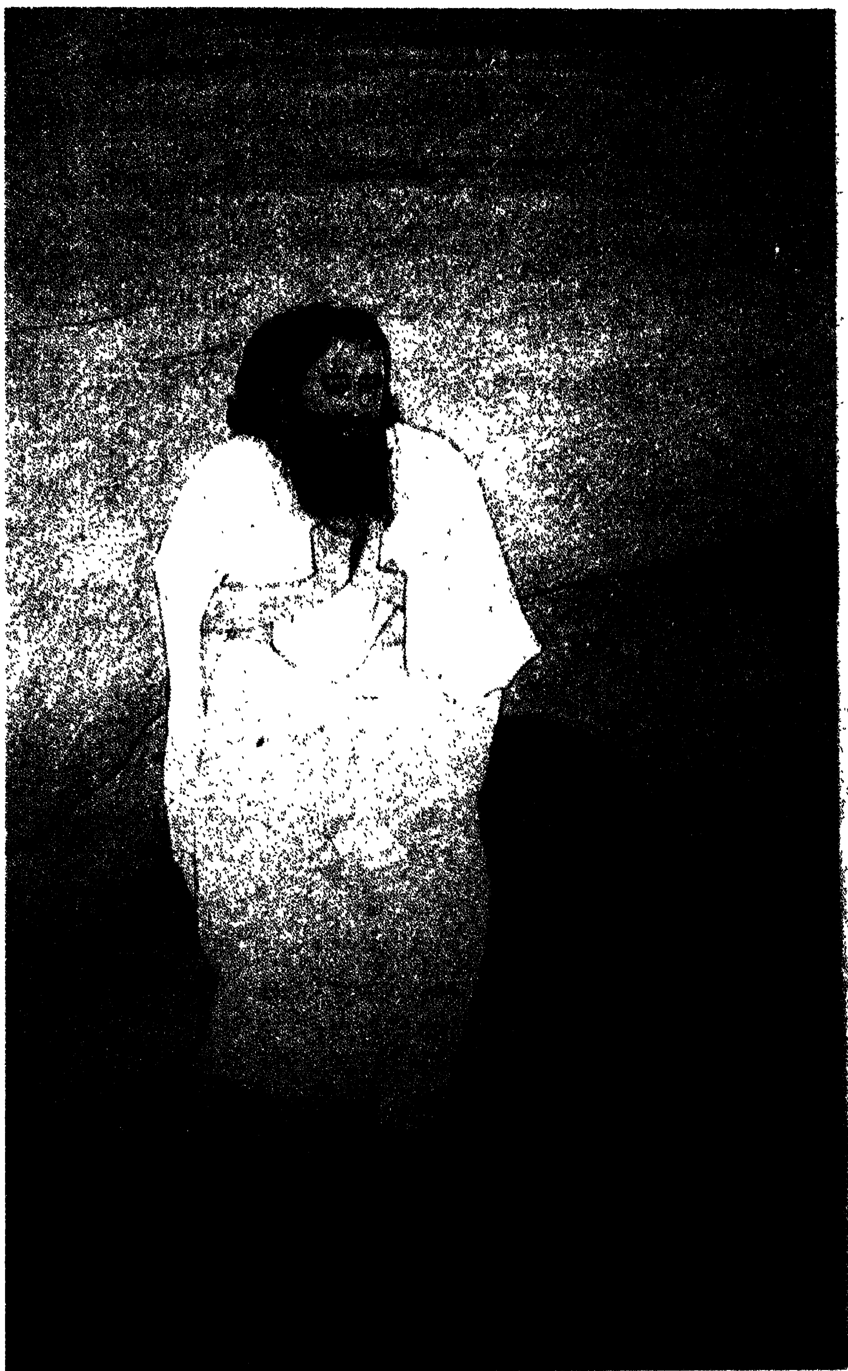
১৮ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধ ও সুজাতা, ১৯০০ খ্রি



১৯ শৈলেন্দ্রনাথ দে, নির্বাসিত যক্ষ, ১৯১৮ খ্রি



২০ ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, গণেশ-জনকজননী, আঃ ১৯৩৫ খ্রি



২১ নন্দলাল বসু, হজরত দরাব খান, আঃ ১৯২৮ খ্রি



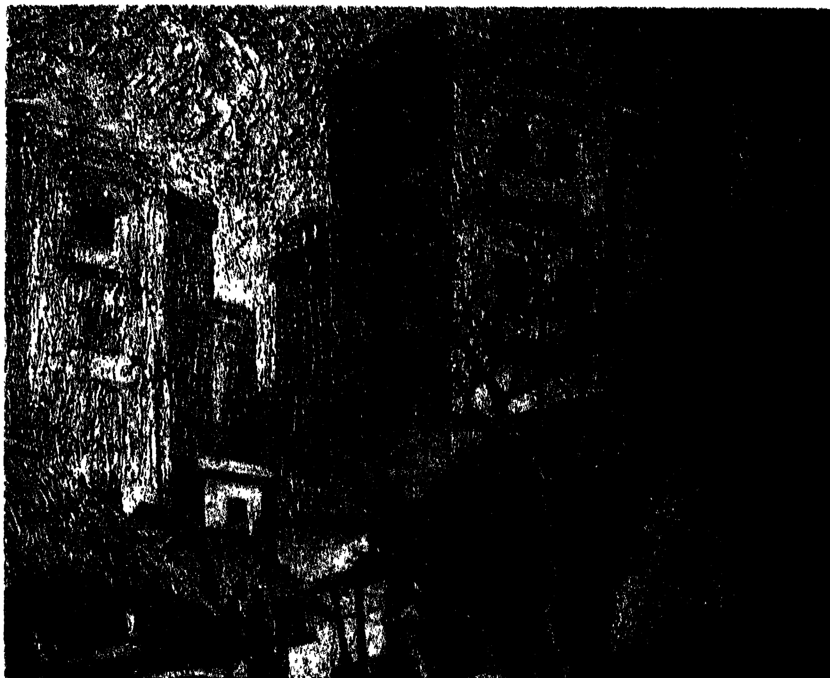
২২ যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, নমাজ, আঃ ১৯১৫ খ্রি



২৩ হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, পরিত্যক্তা, আঃ ১৯১৮ খ্রি



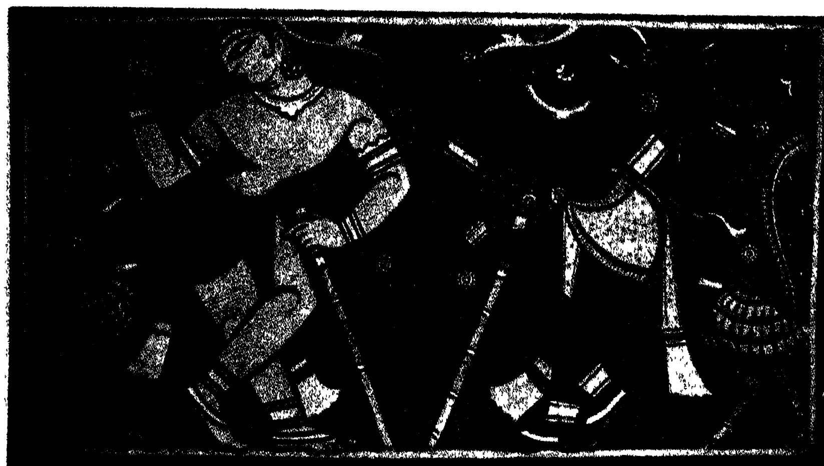
২৪ কুশলকুমার মুখোপাধ্যায়, পিছোলা হ্রদে সূর্যাস্ত, আঃ ১৯৩০ খ্রি



২৫ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, বস্তি, আঃ ১৯৭০ খ্রি



২৬ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজকন্যা, আঃ ১৯২৩ খ্রি



২৭ যামিনী রায়, কৃষ্ণ-বলরাম, আঃ ১৯৩২ খ্রি



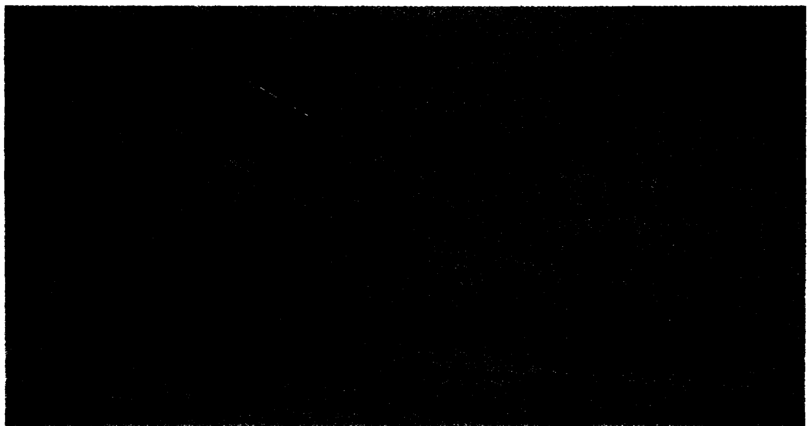
২৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নিসর্গ, ১৯৩৫ খ্রি



২৯ মনীষী দে, রবীন্দ্রনাথ, আঃ ১৯৫০ খ্রি







৩১ ইন্দ্র দুগার, নিসর্গ, ১৯৫০ খ্রী



৩২ রামকিঙ্কর বেইজ, নিসর্গ, ১৯৪৪ খ্রি

করেন। আর এই ছবি-আঁকা তখন থেকে নানা ব্যস্ততা সত্ত্বেও প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত। গান আর কবিতার মতোই তাঁর ছবির ঝুড়িও ভরে ওঠে দু-তিন হাজার সৃষ্টি নিয়ে।

ঘনিষ্ঠভাবে দেখলে রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে পড়ে তৃতীয় দশকের প্রাথমিক প্রচেষ্টাগুলি, যার সূচনা পাণ্ডুলিপি সংশোধনের মধ্য দিয়ে আর পরিণতি ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে প্রদর্শিত ছবিগুলিতে। প্রথম পর্যায়ের ছবিগুলিকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম ভাগে পড়বে পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলি আর দ্বিতীয় ভাগে ১৯২৮ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে আঁকা প্রধানত রেখামাত্রিক ছবিগুলি। লক্ষণীয় এই যে প্রথম পর্যায়ের ৩৬
অধিকাংশ ছবিই কাগজকে লম্বভাবে রেখে তার ওপর সরাসরি আঁকা হয়েছে—যেভাবে লেখক লেখেন তাঁর লেখার কাগজে। অর্থাৎ তখনও সারা জীবনের সাহিত্যিক অভ্যাসই তাঁকে চালনা করছিল। রঙের ব্যবহারও এই পর্যায়ের ছবিগুলিতে যৎসামান্য—কালিই প্রধান অবলম্বন, তা ছাড়া কিছু কিছু তরল জলরঙ। কিন্তু ১৯৩০-এ যে তিনি পুরোপুরি শিল্পী হয়ে উঠেছেন তা তাঁর প্রদর্শনী ছাড়াও এল. কে. এল্‌মহার্স্টের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়। ওই বছর লন্ডনে থাকাকালীন সময় তিনি এল্‌মহার্স্টকে বলে কয়েক বোতল কালি ও কয়েকটি তুলি কিনিয়েছিলেন এবং লন্ডনে বসেও ছবি এঁকেছিলেন।

চতুর্থ দশকের প্রথম দিকে রচিত হয়েছে তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের ছবি। এই সময় তিনি শুরু করেছিলেন ঘষে ঘষে গাঢ় জলরঙের ব্যবহার—তাঁর ছবিতে দেখা দিয়েছিল টেক্সচার বা বুনট আর সেই সঙ্গে হাইলাইট বা উজ্জ্বলতার ব্যবহার। তৃতীয় বা চূড়ান্ত পর্যায় হল ১৯৩৫ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত—যে পর্যায়ে তাঁর ছবি ঘন জলরঙের ব্যবহারে গাঢ় বুনট ও দৃঢ়বদ্ধরূপ লাভ করেছে। এই শেষ পর্যায়ে তিনি যে ছবির আঙ্গিকেও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন তা বোঝা যায়। এ সময় ত্রিমাত্রিক গড়নে রচিত হয়েছে নানা মানবিক ও অ-মানবিক মুখমণ্ডল। মানবিক মুখগুলিতে বিভিন্ন ভাব—বিশেষ করে বিষণ্ণতা -মাখানো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে প্রকাশমান হয়েছে। তা ছাড়া এই শেষ পর্যায়ে তিনি এমন কিছু নিসর্গচিত্র এঁকেছেন যেগুলিতে পরিপ্রেক্ষিতবোধ সুস্পষ্ট। এই নিসর্গচিত্রগুলি তাদের আবেগপ্রসূত উষ্ণবর্ণের প্রয়োগে ২৮
ইয়োরোপের এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের ছবির কথা মনে আনে। যে সব নিসর্গচিত্রে প্রদোষকালের রক্তাভ দিগন্ত আর বনানীর গাঢ় অন্ধকারকে শিল্পী ধরে রেখেছেন সেগুলি দর্শকের মনে গভীর ছাপ ফেলে। এই শেষ পর্যায়ে তিনি যেসব পুষ্পগুচ্ছ স্টিল-লাইফ হিসাবে এঁকেছেন তাদের রূপ-নির্মিতিতেও তাঁর বাস্তবানুগ ছবি আঁকার দক্ষতা ফুটে উঠেছে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে ভারতীয় মার্গসাহিত্য ও লোকসাহিত্যের ধারায় পরিপুষ্ট: সংগীতের ক্ষেত্রেও যে রবীন্দ্রনাথ একইভাবে মার্গ ও লোকসংগীতের প্রবহমানতায় সঞ্জীবিত সেই রবীন্দ্রনাথই ছবির ক্ষেত্রে কী মার্গ কী লৌকিক পরম্পরা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে এক ব্যক্তিগত শৈলীর প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আসলে ছবির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সেই মানসিকতাই অভিব্যক্ত হয়েছে যা সামাজিক দায়িত্ববোধে তাঁর সাহিত্যে কিংবা কথা-প্রধান গানে উদ্‌ঘাটিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁর ছবিতে বিষয় হিসাবে দেখা দিয়েছে নামগোত্রহীন সব আদিম প্রকৃতির জন্তু-পাখি-সরিসৃপ। এই সব জীবজন্তুর রূপে ও ভঙ্গিতে প্রচলিত সৌন্দর্যবোধের পরিবর্তে বরং ফুটে উঠেছে ভয়ানক আর বীভৎস ভাব ও রস। তাঁর সারা জীবনের পরিশীলিত সুকুমারবোধের সঙ্গে এই সব ছবি এমনই বিসদৃশ যে অনেকেই এগুলিকে তাঁর অবদমিত মনের গভীর থেকে উঠে আসা রূপকল্প বলে মনে করেছেন। ছবিগুলি যে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর অবচেতন মনের বার্তা বহন করছে,তাতে সন্দেহ নেই।



৫৭ আত্ম-প্রতিকৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৩৫ খ্রি

কিন্তু বিষয় যতই কিম্ভূত বা ভয়ানক হোক্ না কেন, তাতে যতই 'প্রিমিটিভ' বা আদিমমানবের শিল্পের প্রভাব চোখে পড়ুক না কেন, তাঁর প্রতিটি ছবিই রূপ-নির্মিতিতে অনবদ্য ; রং ও রেখা চিত্রপটে এমন এক সম্পূর্ণতা সৃষ্টি করে যা চোখকে পূর্ণ পরিতৃপ্তি দিতে সক্ষম হয়। আসলে অনুভবের যে জগৎটাকে কথায় বা সুরে ধরা যায় না, যে জগৎ কেবলমাত্র দৃশ্যমানই হতে পারে—সেই জগৎটাকেই রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন কাগজের ওপর—রঙে ও রেখায়। এক্ষেত্রে তিনি পুরোপুরিভাবেই চিত্রকর—তাঁর আবেদন চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের কাছে। তাই তিনি তাঁর ছবির নামকরণ করেননি কখনও—তাঁকে দেননি কোনো সাহিত্যিক অনুষঙ্গ। যামিনী রায়কে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবির মর্মকথা বলেছেন এইভাবে[১৬], "যখন ছবি আঁকতুম না, তখন বিশ্বদৃশ্যে গানের সুর লাগতো কানে, ভাবের রস আসতো মনে। কিন্তু যখন ছবি আঁকায় আমার মনকে টানলো, তখন দৃষ্টির মহাযাত্রার মধ্যে মন স্থান পেল। গাছপালা, জীবজন্তু সকলই আপন আপন রূপ নিয়ে চারদিকে প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠতে লাগলো। তখন রেখায় রঙে সৃষ্টি করতে লাগলো যা প্রকাশ হয়ে উঠছে। এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যার দরকার নেই"...। তিনি আরও বললেন[১৭]: "পৃথিবীর অধিকাংশ লোক ভালো করে দেখে না—দেখতে পারে না। তারা অন্যমনস্ক হয়ে আপনার নানা কাজে ঘোরাফেরা করে। তাদের প্রত্যক্ষ দেখবার আনন্দ দেবার জন্যই জগতে এই চিত্রকরদের আহ্বান। চিত্রকর গান করে না ; ধর্মকথা বলে না ; চিত্রকরের চিত্র বলে 'অয়ম্ অহম্ ভো'—এই যে আমি এই"।

ছবির এই স্বরাটে বিশ্বাসই রবীন্দ্রনাথকে প্রতিষ্ঠিত করেছে আধুনিক চিত্রকরদের মধ্যে।



৫৮ কামাক্ষ্যানপুরা, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, আঃ ১৯৩০ খ্রি

গগনেন্দ্রনাথ, যামিনী রায় ও রবীন্দ্রনাথের হাতে আধুনিককালের বাংলার চিত্রকলা নতুন নতুন পথে বিকশিত হয়ে উঠতে থাকলেও অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতি সেই বিশের দশকে যথেষ্ট প্রাণবন্ত ছিল। এই সময় বাংলার গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসের পৃষ্ঠপোষকতায় ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট নবোদ্যমে শিল্পকলাচর্চার নানান কাজে ব্রতী ছিল। প্রতি বছর প্রদর্শনীর আয়োজন, 'রূপম' পত্রিকার প্রকাশ ও বিদেশে নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার প্রচার ছাড়াও তখনকার কর্পোরেশন স্ট্রিটের সমবায় ম্যানসন-এ ছিল সোসাইটির শিল্পশিক্ষার বিদ্যালয় বা স্টুডিয়ো। এই স্টুডিয়োতে প্রথমে নন্দলাল, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার ও শৈলেন্দ্রনাথ দে, অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে শিক্ষকতা করতেন। নন্দলাল ও শৈলেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ও বারাণসীতে চলে গেলে শিক্ষকতার পূর্ণ দায়িত্ব পড়ে ক্ষিতীন্দ্রনাথের ওপর —এবং সে দায়িত্ব তিনি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে পরবর্তী দুই দশককাল একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ অনুগামী এবং তিনি অবনীন্দ্রনাথের আদর্শেই খোলাখুলিভাবে, ছাত্রদের পাশাপাশি বসে ছবি আঁকতে আঁকতে শিক্ষাদানের রীতি মেনে চলতেন। ছাত্ররা প্রধানত প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস-নির্ভর ছবি আঁকতেন অবনীন্দ্রনাথেরই 'ওয়াশ' পদ্ধতিতে—যে পদ্ধতির সম্ভবত এক শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ স্বয়ং।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ওরিয়েন্টাল সোসাইটির স্টুডিয়োতে বহু ছাত্রকে শিক্ষাদান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা উদ্ভাবনশীল তাঁরা—যেমন চিন্তামণি কর, প্রাণকৃষ্ণ পাল ও নীরদ মজুমদার—পরবর্তীকালে আধুনিক ইয়োরোপীয় কলাশিল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নব্য বঙ্গীয় শৈলী থেকে দূরে সরে যান। অন্যপক্ষে যাঁরা আরও পুরনো ছাত্র—বরদাচরণ উকিল বা সুধাংশুশেখর চৌধুরী—তাঁরা নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতিকে অবলম্বন করেই আপন আপন শৈলী গড়ে তোলেন। কিন্তু নব্য-বঙ্গীয় শৈলীর দুর্বলতর অনুগামীদের হাতে অবনীন্দ্র-চিত্ররীতি ক্রমশই ক্ষীণ, দীর্ঘাঙ্গী, ভঙ্গুর ও মেরুদণ্ডহীন মানব-মানবীর রূপ নিয়ে এক ভঙ্গিসর্বস্ব চিত্ররীতিতে পরিণত হতে থাকে। আর তার ফলেই যাঁরা চিত্রে প্রথাবদ্ধতার বিরোধী, যাঁরা চিত্রে জীবনের প্রতিফলন দেখতে চান তাঁদের কাছে অনিবার্যভাবেই এই চিত্ররীতি নিন্দনীয় হয়ে ওঠে।

অথচ অবনীন্দ্রনাথ আর তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্যরা বিশের দশকে তো বটেই, এমন-কি তিরিশের দশকেও নব্য-বঙ্গীয় শৈলীকে নানাভাবে বিভিন্নমুখী ও সুসমৃদ্ধ করে গেছেন। অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং শিল্পী হিসাবে কোনো এক রীতি বা আঙ্গিকে বেশি দিন বাঁধা থাকেননি। 'ওয়াশ টেকনিক' তাঁর চিত্রভাষার প্রধান অবলম্বন হলেও, বিশের দশকে দেখা যাচ্ছে তিনি গাঢ়তর রং ব্যবহার করে ছবি আঁকছেন—অসংখ্য প্রতিকৃতি আঁকছেন প্যাস্টেলে। বিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে আঁকা তাঁর প্যাস্টেলের প্রতিকৃতি-চিত্রগুলির মধ্য দিয়ে তিনি যে তাঁর অতীতচারী সাহিত্যাশ্রয়ী কল্পলোক থেকে তাঁর চারপাশের মানুষজনের ভেতর ফিরে এসেছেন তাতে সন্দেহ নেই। এই দশকের শেষদিকে করা 'মুখোশ'চিত্রগুলিতে সমাজজীবনের বিভিন্ন মনুষ্যচরিত্রকে তাদের নানান ভাব ও মনোবিকলনে ধরে রেখেছেন তিনি। তবে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীজীবনের মহত্তম ফসল হিসাবে যে ছবিগুলি বিশের দশকের শেষে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে দেখা দিয়েছিল তা হল 'আরব্য



৫৯ মৃতের দেশ, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, আঃ ১৯৪৩ খ্রি

উপন্যাস' চিত্রমালা। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বলেছেন[৯৮] : "যদিও উপলক্ষ্য আরব্য উপন্যাস কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছেন তাঁর সারাজীবনের অভিজ্ঞতা। শহুরে জীবনের অভিজ্ঞতাকে বোগদাদের লৌকিক, অলৌকিক ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন এমনভাবে যে কালের ব্যবধান মুছে গেছে সে ক্ষেত্রে। উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা শহরের জনস্রোত ও বিচিত্র কর্মজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা আরব্য উপন্যাসের কাহিনীতে রূপান্তরিত করেছেন অবনীন্দ্রনাথ। এটিকে আরব্য উপন্যাসের চিত্রাবলী না বলে তাঁর লৌকিক কলকাতা নগরীর কাহিনী বলা অসংগত নয়"। কেবল বিষয় নির্বাচন বা তার উপস্থাপনাতেই নয়, চিত্রভাষায় সেই বিষয়কে প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও অভিনবত্ব নিয়ে হাজির হয়েছিল এই ছবিগুলি। বিনোদবিহারী আরও বলেছেন[৯৯] "... এই রচনাগুলির সার্থকতা অনুসরণ করতে হলে আঙ্গিকের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আরব্য উপন্যাসের প্রতিটি চিত্রই নির্মিত হয়েছে ইমারতের মতো কঠিন করে। জীবজন্তু, মানুষ, সেলাইয়ের কল, হ্যারিকেন-লণ্ঠন, হোটেলের নামলেখা স্যুটকেশ সব কিছুই ছবির ইমারতী বাঁধনকে দৃঢ়তর করে। কোথাও অসংলগ্নতা বা বিচ্ছিন্নতা লক্ষ করা যায় না। নির্মিতির দিক দিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যেমন উপাদান সংগ্রহ করেছেন তেমনি পরম্পরা থেকে অনুরূপ উপাদান আত্মসাৎ করতে তিনি দ্বিধা করেন নি।" ছবিগুলি ওয়াশ রীতিতে রচিত হলেও এক্ষেত্রে বর্ণ অনেক বেশি উষ্ণ এবং তাদের পারস্পরিক সংঘাত ছবিগুলিতে এমন এক প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করেছে যা দর্শকদের সহজেই আকৃষ্ট করে। অবনীন্দ্রনাথের 'আরব্য উপন্যাস' চিত্রমালা তার নতুন ভাব, ভাবনা ও আঙ্গিকে কেবল যে শিল্পীর সৃজনশীলতার প্রবহমানতাকে তুলে ধরে তাই নয়, সেই সঙ্গে এ কথাও প্রমাণ করে যে নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতি তিরিশের দশকের সূচনাতেও পূর্ণমাত্রায় সজীব ছিল।

কেবল অবনীন্দ্রনাথই নন, তাঁর প্রথম সারির ছাত্ররা— যেমন অসিতকুমার, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, শৈলেন্দ্রনাথ প্রমুখ—একইভাবে আপন আপন ক্ষেত্রে নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলাকে সমৃদ্ধ করে চলেছিলেন বিশের আর তিরিশের দশকের বছরগুলিতে। অসিতকুমার তাঁর প্রথম যৌবনের শৈলীতেই নানান বিষয় ও ভাবনাকে রূপ দিয়েছিলেন এই দুই দশকে। কিন্তু বিষয়ের গুণে তাঁর ছবির রূপ-বিন্যাস ও নির্মিতিতে, এমন-কি বর্ণ প্রয়োগেও দেখা দিয়েছে লক্ষণীয় পরিবর্তন।
প্রসঙ্গত তাঁর লখনউ-এর আর্ট কলেজের সুপরিচিত 'জগাই-মাধাই ও নিত্যানন্দ' (১৯২৯) ৮৭
ভিত্তিচিত্রটির উল্লেখ করা যেতে পারে। চরিত্রচিত্রণে ও গাঢ় বর্ণের প্রয়োগে এই ছবিটি যে অসিতকুমারের পূর্ববর্তী আদর্শায়িত দেহভঙ্গিমা-প্রধান ছবিগুলি থেকে স্বতন্ত্র, তা সহজেই চোখে পড়ে। ক্ষিতীন্দ্রনাথ প্রধানত 'গীতগোবিন্দ' ও 'চৈতন্য-আশ্রিত' বিষয় নিয়ে প্রায় সারা জীবন ধরে গুরুর ওয়াশ টেকনিকে ছবি করেছেন। কিন্তু তাঁর রূপনির্মিতি ও চিত্রবোধ এক জায়গায় থেমে থাকেনি। ক্ষিতীন্দ্রনাথ যত দিন গেছে তত চিত্রের রূপ-বিন্যাসে জ্যামিতিক শৃঙ্খলা
এনেছেন, এমন-কি চৈতন্যদেবের দেহরূপেও এনেছেন দৃঢ়বদ্ধতা। শৈলেন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব ১৯
শৈলীকে যে কতখানি পরিশীলিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তার সাক্ষ্য বহন করছে 'নির্বাসিত যক্ষ' নামক কালিদাসের 'মেঘদূত' অবলম্বনে আঁকা ছবিটি।

নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলা এই বিশের দশকে আর এক শিল্পীর সাধনায় সমৃদ্ধ হয়েছিল—তিনি হলেন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। দেবীপ্রসাদ অসীম আগ্রহে পিতার হাত ধরে হাজির হয়েছিলেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বিখ্যাত দোতলার দক্ষিণের বারান্দায়—অবনীন্দ্রনাথের কাছে। বাসনা তাঁর শিষ্যত্ব লাভ। কিন্তু তরুণ দেবীপ্রসাদের কাজ দেখে সন্তুষ্ট হননি অবনীন্দ্রনাথ—তাঁকে উপদেশ দেন বাংলার পটচিত্র অনুশীলন করতে। এ নির্দেশ মেনে না নিয়ে দেবীপ্রসাদ শিক্ষা নেন কলকাতায় বসবাসকারী এক ইটালীয় শিল্পী ঈ. বইস-এর কাছে—তিন বছর পরিশ্রম করে

অর্জন করেন ইয়োরোপীয় অ্যাকাডেমিক রীতিতে ছবি আঁকার করণকৌশল। তার চেয়েও যা বিশেষভাবে তিনি তাঁর ইটালীয় শিক্ষকের কাছে শেখেন তা হল অ্যানাটমি বা শারীরস্থানবিদ্যা। এই অ্যানাটমি জ্ঞানই তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্যকলার মেরুদণ্ড হিসাবে কাজ করে সমকালে তাঁকে এক বিশেষ প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল।

পাশ্চাত্যরীতিতে শিল্পশিক্ষা নিয়ে দেবীপ্রসাদ অবনীন্দ্রনাথের কাছে ফিরে যান। অবনীন্দ্রনাথও ভিন্ন শিল্পরীতিতে সুশিক্ষিত দেবীপ্রসাদকে ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হননি। শুধু তাই নয়, তিনি দেবীপ্রসাদকে তাঁর নিজের পথেই এগিয়ে যেতে উপদেশ দেন। তাঁর উপদেশেই দেবীপ্রসাদ হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর কাছে ভাস্কর্যকলায় উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হয়েছিলেন। দেবীপ্রসাদের শিল্পদক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট এ পাশ্চাত্যরীতির চিত্রশিক্ষার শিক্ষক করেন।

চিত্রকর হিসাবে দেবীপ্রসাদ সারাজীবন ধরে পাশাপাশি দুই চিত্রশৈলীর সাধনা করেছেন—পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক রীতি ও নব্য-বঙ্গীয় রীতি। আশ্চর্য এই যে তিনি এই দুই বিপরীত রীতিতেই অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ছবি এঁকে দেশে ও বিদেশে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। উভয়ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায় তাঁর নির্ভুল অ্যানাটমি জ্ঞান তাঁর ছবির মধ্যে এক দৃঢ়বদ্ধ রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। কী অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ওয়াশ, কী পাশ্চাত্যরীতির তেলরং বা প্যাস্টেল, কী টেম্পেরা, সকল মাধ্যমেই তিনি সমান পারদর্শিতার পরিচয় দেন। কিন্তু ভাস্কর ও চিত্রকর হিসাবে সম্ভবত তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হল, তিনি নব্য-বঙ্গীয় শিল্পকলাকে বাস্তবধর্মী জীবনবোধের শক্ত ভিতের ওপর স্থাপন করে বৃহত্তর সমাজজীবনের অঙ্গ করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশের দশকের শেষ-দিকে দেবীপ্রসাদের শিল্পী-খ্যাতির স্বীকৃতি এল দু দিক থেকে। একদিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের চিত্রায়ণের দায়িত্ব দিলেন; অন্যদিকে মাত্র তিরিশ বছর বয়সে তিনি আমন্ত্রিত হলেন মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের কর্ণধার হিসাবে যোগদানের জন্য। ওই পদে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে যোগদান করে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আসীন থেকে দেবীপ্রসাদ ভারতীয় কলাশিল্পের ওপর একজন শিক্ষক হিসাবে কী একজন সৃজনশীল শিল্পী হিসাবে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর এই প্রভাব এ দেশের কলাশিল্পকে উন্মার্গগামিতার পথ থেকে কঠিন স্বদেশভূমি আর তার অবহেলিত, দুর্গত ও শ্রমরত মানুষদের দিকে পরিচালিত করেছিল।

কলাভবনেব অধ্যক্ষ হয়ে নন্দলাল তাঁর শান্তিনিকেতনের জীবনে কলালক্ষ্মীব সেবা করেছিলেন দু-ভাবে—প্রথমত একজন সৃজনশীল, সদা অনুসন্ধিৎসু শিল্পী হিসাবে, দ্বিতীয়ত একজন অনন্যসাধারণ শিল্প-শিক্ষক হিসাবে। তিনি যখন কলাভবনের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন তখন তার শিক্ষক ছিলেন তিন জন—তিনি স্বয়ং, অসিতকুমাব হালদার এবং সুরেন্দ্রনাথ কর। কিন্তু ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে অসিতকুমার কলাভবনের কাজ ছেড়ে জয়পুরের মহারাজের কলাবিদ্যালযেব অধ্যক্ষতা নিয়ে চলে গেলে নন্দলালই হন তার শিক্ষাধারার নিয়ন্ত্রক। ১৯২৩ থেকে ১৯৫১-তে তাঁর অবসরগ্রহণকাল পর্যন্ত কলাভবনের শিক্ষা মূলত তাঁর নির্দেশ ও আদর্শ অনুযায়ীই পরিচালিত হযেছে। সেই শিক্ষাধারাব সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেলে অবনীন্দ্র-শিষ্য নন্দলালের শিল্পচিন্তার সঙ্গেও সাধারণভাবে পবিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটবে।

নন্দলাল যখন ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কলাভবনে স্থায়ীভাবে যোগদান করলেন তখন তার ছাত্র ছিলেন চারজন—কলকাতার আর্ট স্কুল ছেড়ে-আসা অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরাচাঁদ দুগার ও কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ এবং শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে আসা ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মণ। এরপর বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং ক্রমে ক্রমে অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, ভি আব. চিত্রা, বিনায়ক মাসোজী, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ এসে কলাভবনে যোগ দেন। এই প্রথম পর্বের ছাত্রদের শিক্ষাদানেব মধ্য দিযেই নন্দলাল তাঁর নিজস্ব শিল্পশিক্ষা পদ্ধতিটি গড়ে তুলেছিলেন। তিনি সাধারণভাবে তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের মতোই শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধাধরা এবং নিয়মমাফিক শিক্ষাক্রম অনুসরণের বিরোধী ছিলেন। দু'জনেই ছাত্রদের দক্ষ কারিগব অপেক্ষা মৌলিক ভাবনাব অধিকারী সৃজনশীল শিল্পী হিসাবে গড়ে তোলার দিকে জোব দিয়েছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ যতখানি ভাব ও কল্পনাশ্রয়ী, নন্দলাল ততখানি নন। শিল্পী হিসাবে যেমন শিক্ষক হিসাবেও তেমনই নন্দলাল নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতিকে উন্মার্গতার ক্ষেত্র থেকে সজীব প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ প্রাকৃতিক জগতের দিকে পরিচালিত করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সৃজনশীল শিল্পীজীবন কাটিয়েছিলেন জোড়াসাঁকোর ৫ নম্বর দ্বারকানাথ লেনের দোতলার প্রশস্ত দক্ষিণের বারান্দায়—তাঁব মন সাধারণত বিচরণ করেছে কল্পলোকে বা ইতিহাসের পাতায়। শান্তিনিকেতনের আশ্রমে নন্দলালও তাঁর মাটির কুটিরের একতলার দক্ষিণের বারান্দায় বসে ছবি আঁকতেন—কিন্তু সে বারান্দা ছিল মাটিরই কাছাকাছি, প্রকৃতির মধ্যিখানে।

সৃজনশীল শিল্পী নন্দলাল শিল্পগুরু হিসাবে মৌলিক রচনা, প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ ও পরম্পরা—এই তিনের মিলনে তাঁর শিক্ষানীতিকে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন বলে লিখেছেন তাঁর অগ্রণী ছাত্র বিনোদবিহারী[১০০]। শিল্পশিক্ষায় মৌলিকতা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও পরম্পবা এই তিনের প্রয়োজন নিয়ে মতভেদ নেই। কিন্তু এদের ব্যাখ্যা সকলে একভাবে করেন না। প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ বলতে নন্দলাল কী বুঝতেন তা ধারণা করা যায় ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মণের কথা থেকে[১০১] "নেচার স্টাডি শব্দটির অর্থ খুবই ব্যাপক, গাছপালা, ফল, ফুল, আকাশ, মাটি যেমন প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে, আবার সকল জীবজন্তু, মানুষও তার মধ্যে রয়েছে। এই সকলের চলাফেরা, তাদের জীবনের প্রকাশকে নিবীক্ষণ করা, তাদের স্বভাব, গঠন, বর্ণ, তাদের অন্তরকে

বুঝবার চেষ্টাকেই বলে নেচার স্টাডি।…নেচার স্টাডি বলতে শুধু অবজেক্ট-এর গঠন ও রঙ স্টাডিতে পূর্ণতা আসে না। তার সঙ্গে অবজেক্ট-এর স্বভাবও স্টাডি করা প্রয়োজন। নেচার স্টাডি শিল্পীর পক্ষে আনন্দের উৎস, তাই সারা জীবন ধরেই এই স্টাডি তার চলতে থাকে। ভারতীয় শিল্পশিক্ষায় বলতে গেলে নন্দলালই সর্বপ্রথমে আউট ডোর স্টাডি বা নেচার স্টাডির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এই শিক্ষার দ্বারা ড্রইঙের দৃঢ়তা ও দক্ষতা লাভ হয়। অথচ মজার বিষয় হল, ছবি আঁকবার সময় এই সব স্টাডি বা স্কেচ দেখতে নন্দলাল ছাত্রদের বারণ করেছিলেন"। এর কারণ ভারতীয় রীতিতে স্মরণ বা ধ্যানের সাহায্যে ছবি আঁকায় বিশ্বাসী ছিলেন নন্দলাল। আর একই কারণে তিনি বলতেন রবীন্দ্রনাথের গান থেকে প্রকৃতিকে অনুভব করতে, ভালোবাসতে। একই বস্তুকে দিনে রাত্রে সকাল-সন্ধ্যায় দেখার বিশেষ প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিও তিনি চালু করেছিলেন ছাত্রদেব মধ্যে।

পরম্পরা শিক্ষা বিষয়ে বিনোদবিহারী লিখছেন[১০২]: "পরম্পরাকে বিচার করা চলে দুই ভাগে—এক, জাতীয় অর্থে, দুই, সামগ্রিক অর্থে। কলাভবনের সূচনা কাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছেন এই শিল্প কেন্দ্রটিকে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে। সেই কারণে তিনি বিভিন্ন কালেব বিচিত্র শিল্পীমনের সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের পথ উন্মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এই আদর্শ অনুযায়ী শিল্প-পরম্পরার সমষ্টিগত রূপ ছাত্র ও শিক্ষকরা লক্ষ করতে সক্ষম হয়ে ছিলেন"। নন্দলাল নিজেও তাঁর ছবিতে মিশর, আসিরিয়া, চীন ও জাপানের চিত্র-পরম্পরা থেকে উপাদান গ্রহণ করেছেন। কিন্তু একটি বিষয়ে তিনি ইয়োরোপীয় আধুনিকতা তন্ত্রের বিরোধী ছিলেন—তা হল তার বিমূর্ত বা অ্যাবস্ট্রাক্ট চিত্রকলার। তিনি চিত্রকলাকে রূপকলা হিসাবেই মানতেন এবং এই রূপকলার প্রকৃত প্রাণশক্তি বলে মনে করতেন তার মণ্ডন (ডিজাইন) গুণকে। তিনি মনে করতেন "বাস্তব উদ্দীপনা, চিত্রের বাঁধন ও আঙ্গিকের নৈপুণ্য—এই ত্রিধারার সংযোগে"[১০৩] শিল্পশিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব। এই শিক্ষার ভিত্তিতেই শিল্পীর মৌলিক রূপভাবনা পেতে পারে সার্থক অভিব্যক্তি।

প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে নন্দলাল তাঁর ছাত্রদের যতখানি আকারের জগৎ সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছেন, ততখানি করেননি বর্ণের জগৎ সম্পর্কে। তিনি নিজে যেমন ছিলেন প্রধানত রেখানির্ভর আকারমাত্রিক শিল্পী, সেইভাবেই চিত্রে বিষয়কে তার রূপনির্মিতিতে ধরতে শিখিয়েছেন ছাত্রদের। তিনি নিজেও গুরুর স্বচ্ছ জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতির ছবির পাশাপাশি শুরু করেন ঘন জলরঙের টেম্পেরার কাজ। প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে যেমন, এই টেম্পেরা পদ্ধতির প্রচলনের মাধ্যমেও নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের চিত্ররীতি থেকে সরে আসেন। চিত্রের বিষয় নির্বাচনে নন্দলাল মহাকাব্য ও ইতিহাস-নির্ভর ছিলেন এ সময়েও। কিন্তু এই সব ছবির পাশাপাশি প্রকৃতিপর্যবেক্ষণমূলক ছবিও প্রাধান্য পেতে শুরু করল তাঁর হাতে। শান্তিনিকেতনের দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর, তার খোয়াই, মাঠে বিচরণরত মোষ, সাঁওতাল নারী-পুরুষ-শিশু, তালগাছের ৬৮
সারি, হাটযাত্রী পথিক ও মালবোঝাই গোরুরগাড়ি; তার গাছপালা-ফুল-পাখি সব কিছুই সযত্নে অঙ্কিত হতে থাকল নন্দলাল আর তাঁর ছাত্রদের কলমে-তুলিতে। বিষয় হিসাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি যেমন গুরুত্ব পেল, তেমনই পেল কোনো সাঁওতাল বালিকা—সামান্য ঘাসফুলও প্রকৃতির গর্বিত প্রতিনিধি হিসাবে স্থান পেল চিত্রপটে। নন্দলাল নিজে অগ্রণী হয়ে শান্তিনিকেতনের আশপাশের জীবনকে ভালোবেসে শিল্পে গ্রহণ করার সহজ অথচ মহৎ আদর্শ সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন তাঁর ছাত্রদের মনে। রূপনির্মিতিতে ও আঙ্গিকে, এমন-কি শিল্পাদর্শেও, তাঁর ছাত্রদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ক্রমে ক্রমে বিভিন্নতা দেখা দিয়েছিল—কিন্তু বিষয় নির্বাচনে এই যে সহজিয়া বোধ, তা থেকে তাঁর কোনো ছাত্রই বিচ্যুত হননি।



৬০ একটি বুড়া সাঁওতাল, নন্দলাল বসু, ১৯৪৪ খ্রি

নন্দলালের যে মূল শিক্ষা—প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ ও বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্যতা—তা কেবল শান্তিনিকেতনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, কলাভবনে তাঁর কাছে শিক্ষা নিয়ে যাঁরা কলকাতায় শিল্পী-জীবন অতিবাহিত করেন তাঁদের কাজেও এই শিক্ষা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। উদাহরণস্বরূপ হীরাচাঁদ দুগার ও তাঁর পুত্র ইন্দ্র দুগারের নাম করা যায়। এঁরা দুজনেই নন্দলালের ছাত্র এবং শিল্পী-জীবন এঁদের কেটেছে শান্তিনিকেতনের বাইরে। অথচ প্রকৃতিকে আপন করে নেওয়ায় এবং অনুপুঙ্খের প্রতি মনোযোগে এঁরা এঁদের নিসর্গচিত্রগুলিকে যে সার্থকতা দিয়েছেন, তা নন্দলালেরই আদর্শজাত। নিসর্গ রূপনির্মিতিতে হীরাচাঁদ এক দুর্লভ স্বকীয় শৈলীর অধিকারী; অন্যপক্ষে, পুত্র ইন্দ্র নন্দলালের ধারাকে কলকাতার বুকে সত্তরের দশক পর্যন্ত সজীব রাখতে ৩১
সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর নানান সিরিজের ছবিতে।


R
B

কিন্তু কেবল বিষয়-ভাবনাতেই নয়, আঙ্গিক জগতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রেও নন্দলালের ছিল অনলস প্রয়াস। দেশজ ঘন জলরঙের রীতিতে ছবি আঁকার ইচ্ছায় দেশী পদ্ধতিতে বিভিন্ন আকর থেকে রং তৈরি করে নিতে আরম্ভ করেছিলেন তিনি। কিন্তু সে কথা জেনে, এতে শিল্পীর সময় নষ্ট হবে বলে, নিষেধ করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। নন্দলাল তাঁর শান্তিনিকেতনের জীবনে দুটি ভিন্ন দিকে চিত্রকলার ধারাকে সম্প্রসারিত করে সাফল্য অর্জন করেন, এক, গ্রাফিকস বা ছাপাই ছবির ধারায়, দুই, ফ্রেস্কো বা ভিত্তিচিত্রের ধারায়। প্রচলিত রীতিতে কাগজে বা কাপড়ে রং-তুলি-কালি-কলমে ছবি আঁকার পাশাপাশি এই দুই বিপরীতধর্মী মাধ্যমে ছবির ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তিনি সারা ভারতের চিত্রশিক্ষার জগতে পথিকৃতের ভূমিকা নেন।

গত শতাব্দীর শেষ দুই দশক ধরে সরকারি আর্ট স্কুলের ছাত্র অন্নদাপ্রসাদ বাগচী ও তাঁর সহযোগীদের মিলিত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটি লিথোগ্রাফ পদ্ধতিতে ছবি ছেপে ও তা প্রচার করে বাঙালি জনজীবনে কতখানি প্রভাব ফেলেছিল তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। নব্য বঙ্গীয় কলাশিল্পের আন্দোলনে এই ছাপাই ছবির গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছিল কিছু দেরিতে— ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ, যে সময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির 'বিচিত্রা সভা' হয়ে উঠেছিল ওই আন্দোলনের মূলকেন্দ্র। এই সময় গগনেন্দ্রনাথ সমাজ রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র আঁকায় বিশেষভাবে মেতে উঠেছিলেন এবং সেই ছবিগুলিকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি বিচিত্রা সভায় একটা লিথো প্রেস চালু করেছিলেন। আধুনিক বাংলার চিত্রকলায় এই ঘটনাটি কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই বিচিত্রাসভার প্রেসটিকে ঘিরেই নব্য বঙ্গীয় চিত্রশৈলীর শিল্পীরা ছাপাই ছবির দিকে ঝুঁকেছিলেন। এই প্রেস থেকে কেবল যে গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্রের অন্যতম সংকলন 'অদ্ভুত লোক' (১৯১৭) প্রকাশিত হল, তাই নয়, অন্যান্য যে সব ছবির বই বেরোল তার মধ্যে ছিল সরাসরি পাথরের পাটায় আঁকা ছবি সহ অবনীন্দ্রনাথের বর্ণমালা পরিচয় 'চিত্রাক্ষর' (১৯২৪-২৫)।

এই বিচিত্রা সভাতেই ছাপাই ছবির প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন মুকুলচন্দ্র দে। ১৯১৫ থেকে ১৯১৯—এই চার বছর তিনি এখানেই এচিং আর ড্রাই পয়েন্ট পদ্ধতিতে হাত পাকিয়ে এমন কিছু ছবি ছেপেছিলেন যা দেখে বিচারপতি জন উড্রফ তাঁকে 'সম্ভবত ভারতের প্রথম বিশিষ্ট এচার' আখ্যা দিয়েছিলেন[১০৮]। নন্দলালও তাঁর প্রথম লিথোগ্রাফ চিত্র 'সাঁওতাল নৃত্য' (১৯১৮) এখানেই এঁকেছিলেন, যেমন সুরেন্দ্রনাথ করও পরের বছর করেছিলেন কয়েকটি লিথোতে ছাপাই ছবি। স্বাভাবিকভাবেই নন্দলাল ও সুরেন কর শান্তিনিকেতনের কলাভবনে চলে এসে সেখানে ছাপাই ছবির কাজ চালু করলেন এবং কালক্রমে বিচিত্রা সভার ছাপাই মেশিনটিও স্থানান্তরিত হয়ে এল শান্তিনিকেতনে। উইলিয়াম পিয়ারসনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে পাওয়া ইংল্যান্ডের বিখ্যাত গ্রাফিক-চিত্রকর ম্যুরহেড বোন-এর এচিং ও ড্রাই পয়েন্টের ছবিগুলি দেখে এবং মেক্সিকোর কলারসিক ফাইম্যানের কাছ থেকে জাপানি রঙিন উডকাট পদ্ধতি বিষয়ে অবহিত হয়ে বিশেষ আগ্রহে ছাপাই ছবির বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন কলাভবনের শিক্ষক ও ছাত্ররা। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নন্দলালের চীন ও জাপান



৬২ রবীন্দ্রনাথ সকাশে শিলাইদহ গ্রামের মানুষ মুকুল দে ১৯১৫ খ্রি

ভ্রমণ কলাভবনকে ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে আরও সমৃদ্ধ করল—কেননা নন্দলাল এই ভ্রমণের সূত্রে প্রচুর জাপানি উড প্রিন্ট, উড ব্লক ইত্যাদি নিয়ে এসেছিলেন। কেবল নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথই নন,তাঁদের ছাত্রদেরও কেউ কেউ এই ছাপাই ছবির দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে এচিং, ড্রাই পয়েন্ট, উডকাট, লিনোকাট ইত্যাদিতে পারদর্শী হয়ে উঠলেন। কলাভবনের ছাত্র মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তকে তাঁর আগ্রহেব জন্য পিয়ারসন এচিং-এর যন্ত্র ও মেশিন উপহার দিযেছিলেন ইংল্যান্ড থেকে এনে।

তবে যে দু'জন শিল্পী ছাপাই ছবির মধ্য দিয়েই প্রধানত তাঁদের কাজের পরিচয় রেখে যেতে অগ্রণী হন তাঁরা হলেন মুকুলচন্দ্র দে ও রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। মুকুলচন্দ্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে জে. ব্লান্ডিং স্লোয়ান-এর কাছে এচিং শিখে তারপর যান ইংল্যান্ডে। লন্ডনের স্লেড স্কুলে কিছুকাল শিক্ষারত থেকে যোগ দেন রয়াল কলেজ অব আর্ট-এ। তাবপর কিছুকাল কাজ করেন ফ্রাঙ্ক শর্টের স্টুডিয়োতে। এইভাবে, দীর্ঘ সাত বছর ধরে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে ছাপাই কাজে উচ্চ-শিক্ষা নিয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ছাপাই পদ্ধতিগুলির মধ্যে তাঁর বিশেষ ঝোঁক দেখা যায় এচিং ও ড্রাই পয়েন্টের দিকে। এই দুই পদ্ধতিতে সূক্ষ্মতর রেখার কখনও সীমিত প্রয়োগে কখনও বিপুল ও জটিল ব্যবহারে তিনি তাঁর ছবিগুলি করেছেন। বিষয় নির্বাচনে তাঁর ছাপাই ছবিগুলি জলরঙের ছবি থেকে স্বতন্ত্র। জলরঙে তিনি মূলত অবনীন্দ্রনাথের ধারাতেই সাহিত্য-নির্ভর ছবি এঁকেছেন ; কখনও বা আদর্শ গ্রাম্যজীবনেব দৃশ্যও। কিন্তু তাঁর ছাপাই ছবিতে প্রাধান্য পেয়েছে সাধারণ কর্মরত মানুষ, বিশেষ করে সাঁওতালদের জীবন। এই সব কাজে তিনি অবশ্যই একজন বাস্তবধর্মী শিল্পীর ভূমিকা পালন করেছেন।

সুরেন্দ্রনাথও ছাপাই ছবির যোগ্য শিক্ষক হয়ে উঠতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৯২৪-এ লন্ডনে গিয়ে লিথোগ্রাফিতে বিশেষ শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন। রমেন্দ্রনাথ কলাভবনে তাঁর কাছ থেকে লিথোগ্রাফি এবং ফরাসি-ইহুদি শিক্ষয়িত্রী আঁদ্রে কার্পেলে-এর কাছ থেকে উডকাট আয়ত্ত করেন। পরিণত বয়সে, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে গিয়ে তিনি ম্যুরহেড বোন-এর কাছে বিশেষ করে এচিং, ড্রাই পয়েন্ট ও অ্যাকোয়াটিন্ট শেখেন বছর দুই। চিত্রকলার বিভিন্ন আঙ্গিক, জলরং, টেম্পেরা ও তেলরঙের পারদর্শী শিল্পী হলেও রমেন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের অনেকটাই ব্যয় করেন গ্রাফিক্স-এর বিভিন্ন পদ্ধতিতে ছবি এঁকে ও ছাপিয়ে। উডকাট, এচিং, অ্যাকোয়াটিন্ট, ড্রাই পয়েন্ট, লিথোগ্রাফ ও লিনোকাটে প্রায় সমান পারদর্শী ছিলেন তিনি। শান্তিনিকেতনে নন্দলালের ছাত্র হিসাবে তিনি অবনীন্দ্র-পরম্পরাকেই বহন করে গিয়েছিলেন। কী প্রতিকৃতিচিত্রণে, কী নিসর্গচিত্রণে তাঁর দক্ষতা ছিল উচ্চমানের। কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের শিক্ষক হিসাবে এবং পরবর্তী কালে তার অধ্যক্ষতার দায়িত্বে থেকেও অনেক কৃতী ছাত্র তৈরি করেছিলেন তিনি। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে আর্ট স্কুলের অস্থায়ী অধ্যক্ষ হয়ে ছাপাই ছবির শিক্ষাক্রমকে নতুন করে গুরুত্ব তিনিই দিয়েছিলেন। শফিউদ্দিন আহমেদ ও হরেন্দ্রনারায়ণ দাসের মতো গ্রাফিক্স-এর শিল্পী তাঁরই ছাত্র। শফিউদ্দিনের কাছ থেকেই গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে উডকাট শিখেছিলেন পরবর্তী কালের যশস্বী গ্রাফিক্স-শিল্পী সোমনাথ হোর। এই কারণে বলা চলে যে শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাপাই ছবির ধারাই এখনও বহমান রয়েছে বাংলার নানান দক্ষ শিল্পীর মধ্য দিয়ে।

শান্তিনিকেতনে এই ধারাকে যাঁরা পুষ্ট করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। হিমালয়ের কেদারনাথ ও বদ্রিনাথের বারোটি লিনোকাট চিত্র প্রকাশ করেছিলেন তিনি ১৯৩৩-এ; অ্যালবামটির মুখবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন নিকোলাস রোয়েরিখ। এর আগের বছর মুকুলচন্দ্র প্রকাশ করেছিলেন তাঁর বোন তরুণী শিল্পী রানী চন্দের পঁচিশটি লিনোকাটের একটি পোর্টফোলিও—তার মুখবন্ধ লেখেন রবীন্দ্রনাথ। এই



৬৩ মুঙ্গেরের গঙ্গা, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আঃ ১৯৫০ খ্রি



৬৪ বারান্দা, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায, আঃ ১৯৪৮ খ্রি



বৃষ্টি, রামকিঙ্কর বেইজ, ১৯৪৭ খ্রি.



৬৬ ভিখারিনী, হরেন দাস, আঃ ১৯৬০ খ্রি,

লিনোকাটগুলিতে মোটা দাগে আলোছায়ার দ্বন্দ্বে, বাংলার নিসর্গ আর ঘরোয়া গ্রামজীবনকে ৬১
ফুটিয়ে তুলেছেন রানী চন্দ।

কলকাতাব গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে শিক্ষা নিয়ে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করে রাধাচরণ বাগচীও ছাপাই ছবির দিকে ঝুঁকেছিলেন।

তবে, কী নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, কী স্মরণীয় ছবি এঁকে ছাপাই ছবির জগতে কলাভবনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা নন্দলাল আর তাঁর দুই ছাত্র বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর বেইজের হাতে। এঁরা তিন জন লিথোগ্রাফ, উডকাট, উড-এনগ্রেভিং, লিনোকাট, এচিং, ড্রাই পয়েন্ট ও অন্যান্য রীতিবহির্ভূত পদ্ধতিতে ছাপাই ছবি করে এমন সব উদ্ভাবনী ও সৃজনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, যার তুলনা ভারতের ছাপাই ছবিব ইতিহাসে বিরল। এমন এক পরীক্ষার মন নিয়ে নন্দলাল ও রামকিঙ্কর সিমেন্টের ব্লকের সাহায্যেও ছবি ছাপিয়ে ছিলেন। তাঁরা যে কেবল ছাপাই ছবির করণকৌশল নিয়েই পরীক্ষা করেছেন, তা নয়, ছাপাই ছবির নিজস্ব চরিত্রকে তার প্রত্যক্ষতায়, বস্তুসংস্থাপনের সারল্যে এবং বলিষ্ঠ রেখামাত্রিকতায় তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁদের কাজে। নন্দলালের উডকাট আব্দুল গফ্ফর খান ও বাপুজী, ড্রাই পয়েন্ট পাইন বন, কোপাই নদী ও অর্ধ-শায়িত অর্জুন, এচিং গীতরত বাউল ও ছাগল—গ্রাফিক্স-এর কাজে তাঁর
বিভিন্নমুখী সাফল্যের সাক্ষ্য। বিনোদবিহারীও উডকাট, লিনোকাট, এচিং ও ড্রাই পয়েন্টে তাঁর ৬৫
নিজস্ব শিল্পবোধে ও নৈপুণ্যে এমন অনেক ছাপাই ছবি করে গেছেন যা পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। তবে সম্ভবত রামকিঙ্করের অবদান এক্ষেত্রে আরও বিশিষ্ট। ভাস্কর্যে ও চিত্রকর্মে যেমন, ছাপাই ছবির কাজে, বিশেষত উডকাটে তিনি এমন এক বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর রেখেছেন যার তুলনা অন্য কোনো শিল্পীর কাজে মেলে না। এর কারণ এখানেও তিনি ছবিকে তার নিজস্ব মূল্যে, আলোছায়ার রূপবন্ধনে, তার অনন্য প্রাণশক্তিতে আবিষ্কার করে গেছেন একের পর এক। রামকিঙ্কর ও বিনোদবিহারীর কাজের মধ্য দিয়ে ছাপাই ছবিতে শান্তিনিকেতন পৌঁছে গেছে সাম্প্রতিক চিত্রকলার জগতে। তাঁদের পর কলাভবনে ছাপাই ছবির চর্চা বেশ কিছু কাল স্তিমিত ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের হাতে তার সেই ধারা আবার নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়েছে।

৩৪ ভিত্তিচিত্রের নতুন যুগ : শান্তিনিকেতন

ভারতীয় কলাশিল্পের এক মহত্তম অভিব্যক্তি তার ভিত্তিচিত্রে—যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অজন্তা ও বাঘের গুহাচিত্র। প্রাচীন এই চিত্রমাধ্যমকে আধুনিক কালে পুনর্জীবিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন হ্যাভেল। তিনি কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে জয়পুর থেকে কারিগর আনিয়ে অবনীন্দ্রনাথকে দিয়ে জয়পুর রীতিতে দুটি ফ্রেস্কো আঁকিয়েওছিলেন—যার একটি 'কচ ও দেবযানী' (১৯০৫), অপরটি 'রাধাকৃষ্ণ'।

কিন্তু হ্যাভেল আর্ট স্কুল ছেড়ে দেশে ফিরে গেলে স্বভাবতই মিনিয়েচার-ধর্মী চিত্রকলার অনুবর্তক অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বাকি জীবনে আর ভিত্তিচিত্র রচনায় সচেষ্ট হননি। সদা-অনুসন্ধিৎসু ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তৎপর নন্দলাল কিন্তু ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের অজন্তা গুহাবলির চিত্র অনুলিপির অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন ভারতীয় চিত্রের এক মহৎ অভিব্যক্তি হল তার ভিত্তিচিত্র। তাই জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান-মন্দিরে অজন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কয়েকটি দেয়ালচিত্র করেছিলেন তিনি (১৯১৭)। তারপর, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অসিতকুমার ও সুরেন্দ্রনাথ সহ নন্দলালের মধ্যপ্রদেশের বাঘগুহার চিত্রাবলির অনুলিপি করার মধ্য দিয়ে ভিত্তিচিত্র আঁকার বাসনা আরও দৃঢ় হয়। বাঘ থেকেই তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা কলাভবনের ছাত্রদের ভিত্তিচিত্র বিষয়ে নানা কথা চিঠিতে লিখে পাঠাতেন। তার দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ধীরেনকৃষ্ণ-বিনোদবিহারীরা সে সময় দু-একটি ছোট ছোট দেয়ালচিত্র আঁকেন[১০৫]। কিন্তু শান্তিনিকেতনে এই প্রয়াস প্রথম গুরুত্ব পেল ১৯২২-এর গ্রীষ্মাবকাশে—যখন নন্দলাল পুরনো লাইব্রেরি-বাড়ির একটি ঘরের চার দেওয়াল জুড়ে আঁকলেন বাঘ ও অজন্তা থেকে আহৃত নানা মোটিফ—পদ্ম, পদ্মপাতা ও নাল, মাছ, বক ইত্যাদি। এই প্রয়াস ছিল কিছুটা সৌখিন। প্রকৃত পেশাদারি প্রচেষ্টা ঘটেছিল ১৯২৭-এ—যে বছর জয়পুর থেকে নরসিংলাল নামক এক শিল্পী এলেন শান্তিনিকেতনে জয়পুর পদ্ধতির ফ্রেস্কো শেখাতে। পুরনো লাইব্রেরি-বাড়ির ওপরের তলায় নরসিংলাল আঁকলেন কিছু পরম্পরাগত রূপকল্প এবং কয়েকটি নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ পরিকল্পিত ছবি। এই ছবি আঁকার সময় ছাত্রদের সঙ্গে নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথও গভীর নিষ্ঠা ও বিনয়ের সঙ্গে জয়পুর রীতির বার্নিশ পদ্ধতির ফ্রেস্কোর করণকৌশল শিখেছিলেন। সেই শিক্ষাকে ভিত্তি করেই পরের বছর নন্দলাল আঁকলেন শ্রীনিকেতনের 'হলকর্ষণ' দেয়ালচিত্রটি। দ্বিমাত্রিকভাবে পরিকল্পিত শান্তিনিকেতনের হলকর্ষণ উৎসবের এই দৃশ্য, যাতে রবীন্দ্রনাথকেও দেখা যাচ্ছে সক্রিয় অংশ নিতে, নন্দলালের এক বলিষ্ঠ রূপসৃষ্টি। দুঃখের কথা, অবিবেচক হাতে জীর্ণোদ্ধারের দায়িত্ব দেওয়ায় এই মহৎ ছবিটির আসল চরিত্র অনেকটাই এখন অনুমান সাপেক্ষ হয়ে পড়েছে।

নরসিংলালকে কলাভবনে আবার নিয়ে আসা হয় ১৯৩৩-এ। এবার নন্দলালই নরসিংলালকে সহযোগী করে পুরনো লাইব্রেরি-বাড়ির একতলার দেয়ালে অনেকগুলি ছবি করলেন জয়পুররীতিতে। কী রূপকল্পনায়, কী তার বিন্যাসে, এই ছবিগুলি যে ভিত্তিচিত্র মাধ্যমে নন্দলালের পূর্ণ অধিকারের সাক্ষ্য তা আজ পঞ্চাশ বছর পর সেগুলি দেখলে মেনে নিতে হয়। দেয়ালের ওপরের ভাগে একদিকে আঁকা হয়েছে শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী কোপাইয়ের দৃশ্য, অন্যদিকে এক বিশাল বটবৃক্ষের তলায় রাখাল আর গোরুর দল, আর মাঝখানে শ্রীচৈতন্যের



৬৭ হলকর্ষণ, নন্দলাল বসু, আঃ ১৯২৮ খ্রি

জন্ম। বাঁদিকে দেয়ালে আঁকা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচনে'র দৃশ্য, ডানদিকের দেয়ালে শান্তিনিকেতন আশ্রমের নানান কর্মধারা। বিষয়বিন্যাসে, রেখার বলিষ্ঠতায় আর বর্ণের উজ্জ্বল ব্যবহারে এই দেয়ালচিত্রগুলি কেবল নন্দলালেরই নয়, নব্য-বঙ্গীয় শৈলীর এক মহত্তম সৃষ্টি। এরপর নন্দলাল চার-পাঁচ বছর কোনো উল্লেখযোগ্য ভিত্তিচিত্র করেননি। যদিও ১৯৩৮-এ হরিপুরা কংগ্রেসে তাঁর নিজের হাতে আঁকা তিরাশিটি ছবি পিচবোর্ডের ওপর কাগজ সেঁটে আঁকা হলেও, ব্যবহারের বিচারে দেয়ালচিত্রের সমগোত্রীয় বলে মনে করা যেতে পারে। গান্ধিজির আহ্বানে আঁকা এই ছবিগুলিতে নন্দলাল চিরন্তন ভারতের গ্রামে গ্রামে যুগ যুগ ধরে প্রবহমান জীবনধারাকে তার গার্হস্থ্য জীবন, খেলাধূলা, নানান সংগীতকার , জীবজন্তু, গাছপালা, এমন-কি কল্পনার জগতের পরী ও দেবদূত—সব কিছুকেই চৌকস পটে, অনেকটা পটচিত্রের স্বাচ্ছন্দ্যেই ফুটিয়ে তুলেছিলেন পরম একাত্মতায়। এই সময়েই তিনি বরোদার মহারাজের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পান রাজপরিবারের মৃত ব্যক্তিদের দেহাবশেষ-ধারক কীর্তি-মন্দির-এ ভিত্তিচিত্র আঁকার জন্যে। স্থাপত্যকর্ম হিসাবে 'কীর্তি-মন্দির' ভিত্তিচিত্র আঁকার উপযোগী না হলেও নন্দলাল ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত সাত বছর সময় নিয়ে ছ-শ বর্গফুটের বিশাল কাজ করেছিলেন তার দেয়ালে আর গম্বুজের সিলিং-এ। ছবিগুলির বিষয় ছিল 'গঙ্গাবতরণ'-এর মতো পৌরাণিক দৃশ্য, মীরার জীবনাবলম্বনে ঐতিহাসিক দৃশ্য এবং মহাভারতের কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্য। এই ছবিগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা'র একটি দৃশ্যও স্থান পেয়েছে কীর্তি-মন্দিরে। নন্দলালের কাজের বলিষ্ঠতা ও কল্পনার বিস্তৃতি এই ছবিগুলিতে লক্ষিত হলেও এগুলি যেন প্রকৃত অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠার সুযোগ থেকে বঞ্চিত বলে মনে হয়। এই কীর্তি-মন্দিরের 'নটীর পূজা' ছবিটির সঙ্গে ১৯৪২-এ শান্তিনিকেতনের চীনা-ভবনে আঁকা তাঁর পূর্বতন 'নটীর পূজা' ছবিটির তুলনা করলে প্রকৃত অনুপ্রেরণার অভাবের দিকটা সহজেই চোখে পড়বে। চীনা-ভবনের নৃত্যরতা নটীর দীর্ঘায়িত রূপের মধ্য দিয়ে নন্দলাল তাঁর দক্ষতা ও রসবোধের যে অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন তা রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের মতোই অনন্যসাধারণ।

নন্দলাল-প্রবর্তিত আধুনিক ভিত্তিচিত্রের ধারা তাঁর দুই অগ্রগণ্য ছাত্র ধীরেনকৃষ্ণ ও বিনোদবিহারীর হাতে সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ হয়েছিল। ধীরেনকৃষ্ণ অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের আদর্শে সূক্ষ্ম রেখা ও বর্ণকর্মের মিনিয়েচার-ধর্মী ছবির জন্য বিশেষ পরিচিত হলেও বড় পরিকল্পনার ভিত্তিচিত্রের কাজেও তাঁর দক্ষতা সর্বজনস্বীকৃত। তিনি ও আর তিনজন বাঙালি শিল্পী—ললিতমোহন সেন, সুধাংশুশেখর চৌধুরী ও রণদাচরণ উকিল—এক সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় মনোনীত হয়ে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে 'ইন্ডিয়া হাউস'-এ ভিত্তিচিত্র আঁকতে লন্ডনে যান। সেখানে রয়াল আর্ট অ্যাকাডেমিতে এক বছর ভিত্তিচিত্র-বিষয়ে শিক্ষানবিশির পর তাঁরা ইন্ডিয়া হাউসের দেয়ালে ও গম্বুজের সিলিং-এ কয়েকটি স্মরণীয় ছবি এঁকে দেশে ও বিদেশে খ্যাতিলাভ করেন। এই দেয়ালচিত্রগুলির বিষয় ভারতের ইতিহাস-আশ্রিত এবং এগুলির রূপাদর্শ নব্য-বঙ্গীয় শৈলীর। এই চারজন শিল্পীর তিনজনই—ধীরেনকৃষ্ণ, সুধাংশুশেখর ও রণদাচরণ—ছিলেন অবনীন্দ্র-নন্দলাল পরম্পরার শিল্পী। ললিতমোহনের শিক্ষা পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক রীতিতে—প্রথমে লখনউ-এর সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ন্যাটহার্ডের তত্ত্বাবধানে ও পরে লন্ডনের রয়াল কলেজ অব আর্ট-এ। কিন্তু তিনিও সহযোগীদের সঙ্গে সমমর্মী হয়ে ইন্ডিয়া হাউসে নব্য-বঙ্গীয় শৈলীরই অনুসরণ করেন। ললিতমোহন-অঙ্কিত দুটি ভিত্তিচিত্র হল 'বুদ্ধশিষ্য আনন্দ' ও 'ফতেপুরসিক্রি নগর-পরিকল্পনা পরীক্ষানিরত আকবর'। রণদাচরণ আঁকেন সিলিং-এর 'আলেকজাণ্ডার ও পুরুরাজা'র চিত্রটি এবং দেয়ালের দুটি খণ্ডচিত্র 'তোড়িরাগিণী' ও 'ঈদের প্রথম চাঁদ'। সুধাংশুশেখরের ছবি হল দুটি খণ্ডচিত্র 'বনদেবী' ও



মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রার সিংহল যাত্রা ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মণ ইন্ডিয়া হাউস লণ্ডন

'আনারকলি' এবং 'চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁর নারীপ্রহরীগণ'। ধীরেনকৃষ্ণের সিলিং-এ আঁকা ছবিটির বিষয় 'অশোক-কন্যা সঙ্ঘমিত্রা ও পুত্র মহেন্দ্রের বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য সিংহল যাত্রা' এবং ৬৮
খণ্ডচিত্রগুলি হল 'মানবজীবনের অষ্টধাপ'। ইন্ডিয়া হাউসের এই ভিত্তিচিত্রগুলি বিষয় ও রূপ-নির্মিতির গুণে আজও বাঙালি চিত্রকলার নিদর্শন হিসাবে লন্ডনে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসের ছবি ছাড়াও ধীরেনকৃষ্ণ ভারতের মাদুরাইয়ের গান্ধি স্মারক সংগ্রহালয়ে, জব্বলপুরের শহিদ স্মারক ভবনে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব পুরনো লাইব্রেরির পশ্চিমেব দেয়ালে আরও কয়েকটি দেয়ালচিত্র সম্পূর্ণ করেছিলেন। এগুলির মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে আঁকা বামায়ণ-মহাভাবত ও উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁসের ইতিহাস-আশ্রিত ছবিগুলি কল্পনা ও রূপবিন্যাসের বিস্তৃতিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের শিল্পবোধহীনতার কারণে কলকাতার এই বিশিষ্ট শিল্পকর্ম আজ সম্পূর্ণ বিনষ্টির পথে।

বিনোদবিহারী ভিত্তিচিত্রকে তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভায় আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নন্দলালের আবদ্ধ পথে তিনি যে কেবল শান্তিনিকেতনের ভিত্তিচিত্র-পরম্পরার ধারাকে প্রবাহিত বেখেছিলেন তা নয়, তাকে রূপ-নির্মিতির নতুন বোধে সমৃদ্ধতর করে যেতে পেবেছিলেন। ধীরেনকৃষ্ণের সঙ্গে সন্তোষালয়ের ছাত্রাবাসে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ভাতের মাড় ইত্যাদি দিয়ে ভিত্তিচিত্র বচনাব যে প্রথম প্রয়াস তিনি করেছিলেন তার প্রায় দুই দশক কাল পবে এই মাধ্যমেব দিকে আবার তিনি ফিরে এসেছিলেন—এবার অবশ্যই অনেক বেশি পেশাদারি মন নিয়ে। তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিচিত্র হিসাবে পরিচিত হল ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে কবা শান্তিনিকেতনের ছাত্রাবাসের সিলিং-এব চন্দ্রাতপ-সদৃশ কাজটি। রূপবিন্যাসে দেখা যায় ছবিটিব কেন্দ্রে রয়েছে একটা পুকুর, আব তাকে ঘিরে গাছপালা, ফুলফল, বাড়িঘর, মানুষজন, গোরু-গাধা-কুকুর, আবও কত কী। সব মিলিয়ে বীরভূমের প্রকৃতিঘেবা পল্লিজীবনের এক স্নিগ্ধ পরিবেশ। আধুনিক মননশীলতায ও শৃঙ্খলায়, লৌকিক চিত্রভাষায় সবুজে-পাটলে বর্ণাঢ্য এই ছবিটির সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ চবিত্রলক্ষণ হল বহুমুখী দৃষ্টিকোণ বা মালটি-পারস্পেকটিভ বচনারীতি। ছবিটি আজ তার আসল ঔজ্জ্বল্য অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তবু সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। যেমন গেছে এককালে পান্থশালা পরে স্টেট ব্যাঙ্ক-বাড়ির দেযালে করা বিনোদবিহারীর আব একটি পুষ্করিণী-দৃশ্য। এবপরে আঁকা চীনা-ভবনের ছবিটি—যাতে শান্তিনিকেতনের আশ্রম জীবনকে রূপ দেওযা হয়েছে। আকারে বড় না হলেও শিল্পকর্ম হিসাবে দৃষ্টি আকর্ষক।

তবে নিঃসন্দেহেই বিনোদবিহারীর শ্রেষ্ঠ ভিত্তিচিত্র হল হিন্দি-ভবনেব দেযালে ১৯৪৬-৪৭ এ
আঁকা সাতাত্তর ফুট বিস্তৃত ও আট ফুট দীর্ঘ বিবাটাকাব ছবিটি। এই ছবিটিতে শিল্পী উপস্থিত ৬৯
করেছেন ভারতের মধ্যযুগের সাধুসন্তদের এক একটি সুনির্দিষ্ট চরিত্র হিসাবে। কিন্তু কারোরই জীবনবর্ণনায় ব্রতী হননি তিনি। প্রবহমান গঙ্গার দুই পারে জানা ও অজানা সাধুসন্তরাও বিধৃত হয়েছেন যেন চলমান মিছিলের মতোই—তাঁদের কেউ বসা, কেউ দাঁড়ানো, কেউ হেঁটে চলেছেন পথে। প্রশস্ত এই চিত্রপটের রূপবিন্যাসে যে জ্যামিতিক শৃঙ্খলা, তা তাঁরা ক্ষুণ্ণ করেন না কোনোখানেই। বাড়িঘর যেমন ঋজু ও ঊর্ধ্বমুখী, তাঁরাও তেমনভাবেই তাঁদের যাব যার মেরুদণ্ডে দণ্ডায়মান। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন যোগী, দার্শনিক, তান্ত্রিক, উদাসীন, এমন-কি কারুকর্মে ব্যাপৃত সন্তও। কোনো কোনো চরিত্রকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না—যেমন পরিচিত ধাতুমূর্তির আদলে রামানুজ, অথবা রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভঙ্গিমায় রামানন্দকে, কিংবা কাশীর গঙ্গাঘাটের নিকটবর্তী তুলসীদাসকে। তবে নাম-না-জানা চরিত্রই বেশি এবং তাঁবাই যেন বয়ে



৬৯ মধ্যযুগের সন্তগণ, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ১৯৪৭ খ্রি

নিয়ে চলেছেন ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনের ধারা তার প্রাণস্রোতস্বরূপিণী গঙ্গার পারে পারে। বিনোদবিহারীর কৃতিত্ব, তিনি এই বিরাটাকার ছবিটি এঁকেছেন সামান্যতম রঙের ব্যবহারে—বিষয়ের নিরাভরণ শুদ্ধতার কথা মনে রেখে। আর চিত্রপটকে এমন এক দৃঢ়বদ্ধ রূপবন্ধে বেঁধেছেন যে তার মধ্যে দেখা দিয়েছে এক সুনিশ্চিত স্থাপত্যগঠন। চরিত্রগুলির আকারের মধ্যেও লক্ষ করা যায় গথিক ভাস্কর্যের ঋজুতা ও কাঠিন্য যার আশ্রয় স্থাপত্য। করণকৌশলের বিচারেও এই ভিত্তিচিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ—এটি শিল্পী রচনা করেছেন ইটালীয় ফ্রেস্কো বুয়োনো পদ্ধতিতে। অথচ এর আগেকার করা কাজগুলি—যেমন ছাত্রাবাসের দৃশ্যটি তিনি এঁকেছিলেন এগ-টেম্পেরায়। মনে হয় যেন বিষয়ের গুরুত্ব ও চিরায়ত তাৎপর্যের বিবেচনাতেই ভিত্তিচিত্রের এক স্থায়ী করণকৌশলে বিনোদবিহারী রূপ দিয়েছিলেন তাঁর জীবনের সবথেকে মহিমামণ্ডিত শিল্পকর্মটিকে। অপরপক্ষে, রাজস্থানের বনস্থলিতে ১৯৫০-এ আঁকা তাঁর অপর এক ভিত্তিচিত্রে বিনোদবিহারী রূপাদর্শ হিসাবে বেছে নিলেন লোকচিত্রের আদল।



৭০ তিনজন রমণী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ১৯৫০ খ্রি

৩৫ কলাভবন ও আধুনিক চিত্রকলার বিকাশ

শিল্পী নন্দলাল, আচার্য নন্দলাল চেয়েছিলেন কলাশিল্প সৌখিন রসবেত্তার একচেটে অধিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সকল মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। সেই উদ্দেশ্যেই চিত্রকলাকে তিনি অতীতচারিতা থেকে মুক্ত করে সমকালের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে প্রয়াসী হন। কলাভবনের প্রথম দিককার ছাত্রদের তিনি অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় ওয়াশ-রীতিতে ছবি আঁকতে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু এই সব ছাত্ররাও—যেমন ধীরেনকৃষ্ণ, অর্ধেন্দুপ্রসাদ, হীরাচাঁদ, মণীন্দ্রভূষণ, মাসোজী, সত্যেন্দ্রনাথ, প্রভাতমোহন—গোড়া থেকেই ছবিতে বিষয় হিসাবে প্রাধান্য দিয়েছেন শান্তিনিকেতন ও তার আশপাশের পল্লিবাসীদের জীবনকে—হাট-বাজাব, মেলা, পর্ণকুটির, গ্রামবধূ, সাঁওতাল, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা—এমন সব সাধারণ দৃশ্যবস্তুকে ; সেই সঙ্গে অবশ্যই গাছপালা, ফুলফল, পশুপাখিকেও।

ছবিতে বিষয় হিসাবে প্রকৃতি আর মানুষকে প্রাধান্য দিয়েও আত্মতৃপ্ত হননি নন্দলাল। তিনি রূপকলাকে সকলেব জীবনে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন নানা তৎপরতায়। ছাত্রদের নিয়ে সংগঠিত করেছেন কারুসঙ্ঘ (১৯৩০)—উদ্দেশ্য ব্যাবহারিক কারু ও চারুশিল্প তৈরি করে সাধারণের মধ্যে প্রচার এবং তার আয় থেকে শিল্পীদেব সমবায় জীবন গড়ে তোলা। মেয়েদের চিরদিনের যে ঘরোয়া সূচীশিল্প, তাকেও গুরুত্বেব সঙ্গে কলাভবনে অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। বিশেষত তাঁর ও প্রতিমা দেবীব চেষ্টায় চারুকলার সঙ্গে সঙ্গে কারু-কলা শিক্ষা প্রচলিত হয়েছিল কলাভবনে। আর তাবই ফলে শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে এক সুস্থ ও রুচিসম্মত গৃহপরিবেশ বচনাব আন্দোলন দেখা দিয়েছিল।

গান্ধিজির সংস্পর্শে আসায় দেশেব শিল্প-পরম্পরাকে তাব লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন নন্দলাল। তিনি গান্ধিজির আমন্ত্রণে লখনউ কংগ্রেসে (১৯৩৫) ভারতীয় শিল্পের এক আনুপূর্বিক প্রদর্শনী সংগঠিত করে কংগ্রেসে সমাগত অসংখ্য দেশবাসীকে তাঁদের কলা-ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত করলেন। গান্ধিজিরই নির্দেশে ফৈজপুর কংগ্রেসে এক কুটিরশিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে ও গ্রামে উৎপন্ন জিনিস দিয়ে অভিনবভাবে কংগ্রেসের মণ্ডপ সাজিয়ে তিনি কলাশিল্পেব ব্যাবহারিক সম্ভাবনা সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে তুললেন। পরের বছব আবার গান্ধিজিব আমন্ত্রণে হরিপুরা কংগ্রেসের মণ্ডপসজ্জা ও প্রদর্শনীর জন্য আঁকা তাঁর ভারতীয় জীবনধারা বিষয়ক লোকচিত্র-সদৃশ ছবিগুলি আজও তাদের রচনাগুণে ও বিষয়গুণে সকলকেই পরিতৃপ্ত করে। প্রত্যক্ষ রাজনীতি-বর্জিত শান্তিনিকেতনে থেকেও নন্দলাল এইভাবেই জাতীয় আন্দোলনেব মূলধারার সঙ্গে তাঁর শিল্পকে সম্পর্কিত করে তাকে প্রকৃত অর্থে ভারতীয়ত্ব দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁব ছাত্র প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় তিনি গোপনে অনেকগুলি রাজদ্রোহমূলক প্রচারচিত্রও এঁকে দিয়েছিলেন লিনোকাট পদ্ধতিতে ছেপে গ্রামে-গঞ্জে প্রচারের জন্যে[১০৬]।

কলাভবন একদিকে যেমন চিত্রকলাকে জীবনমুখী করেছে, অন্যদিকে তেমনই অনলস প্রয়াসে তার ভাষাকে নানাভাবে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করেছে। নন্দলাল তাঁর ছাত্রদের দক্ষ কারিগব হিসাবে গড়ে তুলতে চাননি ; তাঁদের প্রত্যেককে তিনি চেয়েছেন মৌলিক ভাব-কল্পনার অধিকারী শিল্পী হিসাবে গড়ে তুলতে। তাই কেবল চোখের শিক্ষাই তিনি তাঁদের দেননি, সেই

সঙ্গে তাঁদের মনকেও সজাগ ও শিক্ষিত করবার দিকে নজর ছিল তাঁর। ছাত্রদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বি.এ. পাশ, তাই তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন অবসর সময়ে তাঁর সহপাঠীদের হ্যাভেলের গ্রন্থপাঠ করে শোনাতে। তা ছাড়া বিশ্বভারতীর খ্যাতিমান অধ্যাপকদের কাছ থেকে ছাত্রদের ইংরেজি সাহিত্যের পাঠ নিতেও উৎসাহিত করেছিলেন তিনি। কলাভবনের গ্রন্থাগারের বইয়ের সাহায্যে ইয়োরোপীয় চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি থেকে তিনি নিজে যেমন শিক্ষা নিতেন, ছাত্রদেরও দিতেন। এইভাবে, দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠ কলাশিল্পের সঙ্গে তিনি তাঁর ছাত্রদের পরিচয় ঘটিয়েছিলেন।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আরও উদার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই তিনি উপলব্ধি করছিলেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক সীমা ক্ষীণ হয়ে আসছে— তারা পরস্পরের নিকটবর্তী হচ্ছে। উগ্রজাতীয়তাবাদই শুধু সৃষ্টি করছে এক দেশের মানুষের সঙ্গে অন্য দেশের মানুষের বিরোধ। তাই তিনি মানবকল্যাণের কথা ভেবে এক মহৎ বিশ্ববোধ নিয়েই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'বিশ্বভারতী'। কলাভবনে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন পূর্ব-পশ্চিমের রূপকলা চর্চার মিলন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি নন্দলালকে তাঁর চীন জাপান (১৯২৪), যবদ্বীপ-বলি (১৯২৭) ও সিংহল (১৯৩৪) ভ্রমণে সঙ্গী করেছিলেন। নন্দলালও তাঁর প্রাচ্যদেশগুলির ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় শিল্পকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন কলাভবনকে কেন্দ্র করেই। আবার ইয়োরোপ থেকেও আধুনিক কলাশিল্পের বার্তাবাহী শিল্পী ও শিল্প-ঐতিহাসিকদের আহ্বান করে আনেন রবীন্দ্রনাথ। বিশের দশকের প্রথম কয়েক বছরের মধ্যে আসেন স্টেলা ক্রামরিশের মতো শিল্প-ঐতিহাসিক, আঁন্দ্রে কাপেলে-এর মতো চিত্রকর এবং লিজা ফন পট ও মাদাম মিলওয়ার্ডের মতো ভাস্কর। এঁদের কাছ থেকেই কলাভবনের ছাত্ররা সরাসরি আধুনিক ইয়োরোপীয় কলাশিল্পের পাঠ নেন। স্টেলা ক্রামরিশ তাঁদের ইয়োরোপীয় শিল্প-ইতিহাসের সূত্রে জানালেন কিউবিজম সহ আধুনিক কালের বিভিন্ন শিল্প আন্দোলনের কথা—তাদের নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা, তার কিছু তাঁরা হাতে-কলমে শেখার সুযোগ পেলেন আঁন্দ্রে কার্পেলের কাছে তেলরং আর গ্রাফিকসের মাধ্যমে। মাদাম মিলওয়ার্ড ছিলেন রোদ্যাঁর বিখ্যাত ছাত্র বুরদেল-এর শিষ্যা। তাঁর কাছ থেকে রামকিঙ্কর, সুধীর খাস্তগীর প্রমুখেরা নিলেন আধুনিক ভাস্কর্যের শিক্ষা। এইভাবেই নন্দলালের চোখের সামনে, রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানেই অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত নব্য-বঙ্গীয় কলারীতির পরম্পরা থেকে স্বতন্ত্র ধারায় নিজেদের প্রস্তুত করে তুললেন কলাভবনের কোনো কোনো ছাত্র তার প্রথম যুগ থেকেই।

কলাভবনে যাঁরা আধুনিক চিত্রকলার দিকে এগোলেন তাঁরা সকলেই যে সমান সচেতনতায় এগিয়েছিলেন তা বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ সুধীর খাস্তগীরের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। নন্দলালের এই খ্যাতিমান ছাত্র নিজেকে সব সময়েই অবনীন্দ্র-নন্দলাল পরম্পরার শিল্পী বলে পরিচয় দিয়ে এসেছেন। অথচ তাঁর ঘন জলরং বা তেলরঙের ছবিতে, এমন-কি ভাস্কর্যেও, ইয়োরোপীয় ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের কাজের ছাপ স্পষ্ট। অন্যপক্ষে, অবনীন্দ্র-নন্দলাল পরম্পরাকে অস্বীকার না করলেও ভারতীয় আধুনিক কলাশিল্পের দুই সচেতন প্রতিনিধি বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর ওই পরম্পরার বন্ধনে নিজেদের বেঁধে না রেখে আপন আপন পথে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ইয়োরোপীয় অর্থে এ দেশে তাঁরা যে আধুনিক চিত্রকলার প্রকৃত পথিকৃৎ তা আজ সকলেই স্বীকার করেন।

বিনোদবিহারীর চিত্রে মননের পরিচয় সব সময়েই স্পষ্ট। ক্ষীণদৃষ্টি এই শিল্পী সংখ্যা অপেক্ষা উৎকর্ষের ওপর গুরুত্ব দিয়েই সারাজীবন তাঁর শিল্পসাধনা করে গেছেন। নন্দলালের শিক্ষায় তাঁর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা হয়ে উঠেছিল অনন্যসাধারণ। কিন্তু তিনি কেবলমাত্র ভারতীয়

কলাশিল্পকেই তাঁর চিত্রচর্চার পরম্পরাগত পশ্চাদভূমি না ভেবে বিশ্বের সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পকেই আয়ত্তীকরণে ব্রতী হয়েছিলেন। তবে তাঁর বিশেষ প্রবণতা ও শিক্ষা ছিল চীন ও জাপানের ক্যালিগ্রাফিক রেখানির্ভর চিত্রকর্মে। কলাভবনে শিক্ষালাভের পর তিনি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে চীন ও জাপান ভ্রমণ করেন। জাপানে তিনি এক বছর কাল থেকে সেখানকার শিল্পকলা ও শিল্প ভাবনার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে দেশে ফেরেন। তাঁর এই জাপান ভ্রমণ তাঁকে তাঁর চিত্রকলা বিষয়ে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। তিনি নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার অনুগামীদের মতো কোনোদিন ওয়াশ-এর কাজ করেননি এবং একটি ছাড়া জীবনে পুরাণ-নির্ভর ছবিও আঁকেননি। ক্যালিগ্রাফিক রেখার বলিষ্ঠ সঞ্চালনে, প্রধানত ঘন জলরঙের সামান্য ব্যবহারে, তিনি প্রকৃতির ফুল, গাছপালা, মানুষ, পশুপাখি এক ছন্দোময় সুস্পষ্টতায় তাঁর চিত্রপটে ফুটিয়ে তুলেছেন। একই প্রাচ্য চিত্ররীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত তাঁর কোনো কোনো ছবি ফরাসি শিল্পী মাতিসের ছবির কথা স্মরণে আনে। তাঁর তুলিতে, কলমে, নরুনে আর বাটালিতে তিনি যে সব ছবি ও প্রতিকৃতি করেছেন তার সব কটিতেই তাঁর শিল্পীব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট।

রামকিঙ্কর প্রধানত ভাস্কর হলেও তাঁর চিত্রকর্ম আধুনিক বাংলা চিত্রকলার ইতিহাসে দিকচিহ্নস্বরূপ। বিনোদবিহারীর পরিশীলিত মনন, আত্মপ্রত্যয় ও সংযম যদি প্রাচ্য, বিশেষ করে চীন ও জাপানের শিল্পধারার অনুবর্তক হয়, তবে রামকিঙ্কর তাঁর স্বভাবজাত আবেগপ্রবণ উদ্দাম ৩১
সৃজনশীলতায় অবশ্যই ইয়োরোপের পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের সমগোত্রীয়। তাঁর বীরভূমের গ্রাম-প্রান্তরের নিসর্গচিত্রে সেজানের নিসর্গচিত্রের রূপনির্মিতির আভাস মেলে, তাঁর বুনো ঘাসের বলিষ্ঠ চিত্রণে পাওয়া যায় ভ্যান গগের আবেগসম্ভূত আবেদন, তাঁর গ্রামের গরিব কৃষিজীবী মানুষের ছবিতে মেলে গগ্যাঁর সমদৃষ্টির পরিচয়। কিন্তু রামকিঙ্কর এখানেই থেমে থাকেননি। রূপনির্মিতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে তিনি বেছে নেন কিউবিস্টদের পূর্বসূরি সেজানের পথ—প্রকৃতিতে আবিষ্কার করেন বেলন, শঙ্কু ও গোলক[১০৭]—যা, তিনি মনে করতেন, অনুভূতির সঙ্গে সাজালে যন্ত্রসংগীত হয়ে উঠতে পারে ছবির ক্যানভাসে। এমনিভাবেই তিনি কিউবিস্টদের শর্তে বিমূর্তবাদী শিল্পী হয়ে ওঠেন। তবু দেখা যায় তাঁর চিত্রে সব সময়েই প্রাধান্য পায় মানুষ—তাদের ভাঙাচোরা, আধা-বিমূর্ত আধা-মূর্ত অবয়ব নিয়ে। বিশেষ করে তাঁর ছবিতে আসে সাঁওতাল আদিবাসী নারী-পুরুষ-বালক-বালিকা-শিশু—তাদের জন্ম-মৃত্যু, শ্রম আর প্রেমের অকৃত্রিম প্রকাশে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তাঁর চিত্রপট। কেননা তাদের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসাই তাঁকে জুগিয়ে এসেছে সৃষ্টির অনুপ্রেরণা, তাঁকে করে তুলেছে সমকালের এক শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে মুখ ফেরালে দেখা যাবে, সেখানেও পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এই পরিবর্তনের মূল কেন্দ্র হয়ে ওঠে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল, আর তার সূত্রপাত ঘটে এক জোরদার ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। পার্শি ব্রাউন অবসর গ্রহণ করার পর তাঁর জায়গায় স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন অবনীন্দ্র-শিষ্য, রবীন্দ্র-স্নেহধন্য, আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী মুকুলচন্দ্র দে। তাঁর এই মনোনয়নে ক্ষুব্ধ হয়ে স্কুলের দীর্ঘদিনের উপাধ্যক্ষ, পার্শি ব্রাউন অবসর নেওয়ার পর থেকে অস্থায়ী অধ্যক্ষপদে কর্মরত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় অকালে অবসর নেন। শিক্ষক হিসাবে যামিনীপ্রকাশের বিশেষ খ্যাতি ছিল, এবং অধিকাংশ ছাত্রই তাঁর কাছ থেকে পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক রীতিতে পেইন্‌টিং শেখার বাসনা নিয়ে সে সময় আর্ট স্কুলের ফাইন আর্ট বিভাগে ভরতি হতেন। যামিনীপ্রকাশের অবসর গ্রহণের ফলে তাঁদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। তাঁদের এমন ধারণাও হয় যে অবনীন্দ্র-শিষ্য মুকুল দে পাশ্চাত্যরীতির চিত্রকলা-শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সরে দাঁড়াবেন। তা ছাড়া তিনি স্কুলে কয়েকটি নতুন নিয়ম চালু করলে ছাত্ররা আরও ক্ষুব্ধ হন এবং ছাত্র-ধর্মঘট শুরু হয়। ছাত্রদের আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু ছাত্ররা ধর্মঘট প্রত্যাহারে সম্মত হয়েও প্রশাসনের কঠোরতার কারণে ধর্মঘট চালু রাখেন ও আন্দোলনকে আরও জোরদার করে তোলেন। এর ফলে স্কুল ও ছাত্রাবাস অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ছাত্র স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হন। এই বহিষ্কৃত ছাত্ররাই মিলিত হয়ে ১৯৩১ সালে ইয়াং আর্টিস্টস ইউনিয়ন নামে একটি শিল্পী-সংস্থা গঠন করে এক নতুন ধরনের শিল্পান্দোলন শুরু করেন। এই সংস্থার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অবনী সেন, গোবর্দ্ধন আশ, অন্নদা দে ও দিগিন ভট্টাচার্য এদের সঙ্গে আরও কয়েকজন এসে যুক্ত হন।

ইয়াং আর্টিস্টস ইউনিয়নের ছাত্র-শিল্পীরা উল্টোডাঙায় একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে কমিউন করে একসঙ্গে থাকতে শুরু করেন। এঁদের মধ্যে নিয়মমতো সাত-আটজন আউটডোর এবং সাত-আটজন ইনডোর স্টাডিতে নিযুক্ত হন, কেননা একসঙ্গে সকলের ইনডোর স্টাডি করার মতো জায়গা ওই বাড়িতে ছিল না। এইভাবে ছবি আঁকতে আঁকতে কিছু ছবি জমা হলে এঁরা এঁদের পূর্বতন শিক্ষক, সদ্য বিলেতফেরত শিল্পী অতুল বসুর উপদেশে একটি প্রদর্শনীতে সে সব ছবি দেখাতে উদ্যোগী হন। ১৯৩১-এর ডিসেম্বরে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসবের অঙ্গ হিসাবে টাউন হল প্রাঙ্গণে আয়োজিত মেলায় একটি স্টল ভাড়া নিয়ে ইয়াং আর্টিস্টস ইউনিয়নের শিল্পীরা তাঁদের প্রদর্শনীটির ব্যবস্থা করেন। এতে অবনী সেন, গোবর্দ্ধন আশ, অন্নদা দে ও দিগিন ভট্টাচার্য ছাড়াও আর্ট স্কুল ছেড়ে-আসা আরও কয়েকজন শিল্পী অংশ নেন—যেমন, কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার, সুরেন দে, শচীন দাস, পঙ্কজ বসু প্রমুখ। তা ছাড়া পার্শি ব্রাউন-যামিনীপ্রকাশের পুরনো ছাত্র পূর্ণ চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখের ছবিও এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। পাশ্চাত্যরীতির অ্যাকাডেমিক ধারার এই সব শিল্পীদের ছবির প্রদর্শনীটি শিল্প-রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং নেপাল ও ত্রিপুরার মহারাজারা তার কয়েকটি ছবিও কিনেছিলেন।



৭১ যুদ্ধবিধ্বস্ত বুটজুতো, অবনী সেন, আঃ ১৯৩৩ খ্রি

ইযাং আর্টিস্টস ইউনিয়ন অল্প দিনের মধ্যেই উঠে যায়। কিন্তু তাব উদ্যোক্তারাই দু-বছর পর মিলিত হয়ে প্রতিষ্ঠা করেন আর্ট রিবেল সেন্টাব (১৯৩৩)। এই নতুন সংস্থাটির সাংগঠনিক ভূমিকায় ছিলেন অবনী সেন, গোবর্দ্ধন আশ ও অন্নদা দে এবং এঁদের বয়োজ্যেষ্ঠ, গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের কমার্শিয়াল বিভাগের কৃতী ছাত্র, ভোলা চট্টোপাধ্যায়, যিনি ভি. সি. নামে খ্যাত ৫০
ছিলেন। আরও যে সব তরুণ শিল্পী আর্ট রিবেল সেন্টার-এর সঙ্গে যুক্ত হন তাঁরা হলেন ললিত চন্দ্র, হবিদাস গঙ্গোপাধ্যায়, সমর দে, অমর দাসগুপ্ত, শচীন দাস, কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার, খগেন রায়, সুবেন দে, মনোজ বসু, রবি বসু প্রমুখ। এঁদের মধ্যে গোবর্দ্ধন আশ, কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদাব ও খগেন রায কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে বিতাড়িত হলেও দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর আহ্বানে মাদ্রাজে গিয়ে সেখানকার আর্ট স্কুলে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন।

আর্ট রিবেল সেন্টার ১৯৩৩-এর এপ্রিল মাসে ৪৯ ধর্মতলা স্ট্রিটের চারতলায় তাঁদের সদস্যদের ছবির একটি বড ধরনের প্রদর্শনী করেন। প্রদর্শনীর চিত্রতালিকার মুখবন্ধটি লিখে দেন অতুল বসু এবং সেই মুখবন্ধে আর্ট রিবেল সেন্টার-এর শিল্পাদর্শ সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। এতে বলা হয়, আর্ট রিবেল সেন্টার-এর লক্ষ্য এমন এক শিল্প যা হবে ওজস্বী ও শক্তিশালী, কিন্তু ভাবপ্রবণতা বিরোধী, নতুন পথসন্ধানে তা হবে নিঃশঙ্ক ও অগ্রগামী। এমন এক শিল্পই পারবে বর্তমানের পরম্পরাগত রক্ষণশীলতা ও সাধারণের অভ্যস্ত উদাসীনতার হাত থেকে ভারতীয় শিল্পকে বক্ষা করতে। এই শিল্প হবে আবেগসমৃদ্ধ ও উদ্দীপক, এবং সৃজনশীল প্রতিভার পক্ষে বিশেষ উৎসাহদায়ক।

প্রধানত অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত চিত্ররীতির বিরোধী এবং পার্শি ব্রাউন-যামিনীপ্রকাশ-প্রদর্শিত পথের অনুসারী হলেও, আর্ট রিবেল সেন্টার-এর শিল্পীরা অ্যাকাডেমিক রীতির বাঁধাধরা পদ্ধতিতে কাজ করেননি। তাঁদের কাজের মধ্যে জীবনের উত্তাপ, একটা স্বাভাবিক সমাজ-বাস্তবতাবোধ এবং নতুনতর আঙ্গিকগত পরীক্ষার প্রচেষ্টা চোখে পড়ে। বিশেষ করে অবনী সেন ও গোবর্দ্ধন আশের ছবিতে দেখা গেল সমকালীন সাহিত্যের মতোই সাধারণ ৭১
শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে সমমর্মিতা। অন্যদিকে, ভোলা চট্টোপাধ্যায় আধুনিক ইয়োরোপীয় চিত্রকলার অভিজ্ঞতায় গগনেন্দ্রনাথের পথে কিউবিস্টধর্মী কাজে আনলেন মননজাত বিশ্লেষণ। এই প্রদর্শনীর ছবি দেখে তখনকার একজন চিত্রসমালোচক মন্তব্য করলেন : "রিবেল আর্ট সেণ্টারের লক্ষ্য হল ভারতীয় চিত্রকলাকে তার সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখা, ইয়োরোপের আন্দোলনগুলোর অন্তর্লীন রীতিনীতিগুলিকে ঠিকমতো অনুধাবন করা, ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক শৈলীগুলির উৎকর্ষের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা এবং যেখানেই সম্ভব ভারতীয় শিল্পের প্রকৃত চরিত্র ও সত্তাকে রক্ষার জন্য পাশ্চাত্যের শৈলীগুলির আঙ্গিক আয়ত্ত করা ; এবং বাস্তববাদের দিকে বিশেষ মনোযোগী হওয়া"[১০৮]।

আর্ট রিবেল সেন্টারও স্থায়ী হয়নি, কিন্তু তার যে অন্বেষণ তাকেই নতুন এক পরিস্থিতিতে আরও সম্প্রসারিত ও তাৎপর্যময় করে তুলতে জন্ম নিয়েছিল 'ক্যালকাটা গ্রুপ'—১৯৪৩-এ।

ছবির ক্ষেত্রে এই যে নতুন ভাবনা তার ছোঁয়াচ মুকুল দে-র অধ্যক্ষতায় পরিচালিত আর্ট স্কুলের শিক্ষক-শিল্পীদের কাজেও লেগেছিল—তবে এক অন্য মাত্রায়। মুকুল দে অধ্যক্ষপদে পাঁচ বছরের চুক্তিতে যোগদান করেন ১১ জুলাই ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। তারপর থেকেই, ছাত্রদের প্রাথমিক গোলমাল কাটিয়ে উঠে, তিনি স্কুলের কার্যপরিচালনায় নানাভাবে উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হন। প্রথমত, তাঁর উদ্যোগে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে পরপর এমন কয়েকটি চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় যা বাংলার চিত্রকলার আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। এর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যামিনী রায়ের বাংলার পটচিত্রের অনুসরণে আঁকা নতুনধারার



৭২ মাছধরা, গোবর্দ্ধন আশ, আঃ ১৯৪০ খ্রি

চিত্রকলার ১৯২৯ সালে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীটির কথা। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমেই যামিনী রায়ের নিজস্ব শৈলীর প্রকাশ প্রথম বড় করে জনসমক্ষে ঘটেছিল। সম্ভবত, আরও তাৎপর্যপূর্ণ হল ১৯৩২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারিতে উদ্‌বোধিত রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রদর্শনীটি। এর আগের বছব টাউন হলে তাঁর সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় তাঁব কিছু ছবি প্রদর্শিত হলেও মুকুল দে-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের প্রদর্শনীর মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথের ছবি কলকাতার কলাবসিকদের সামনে প্রথম বড় আকারে তুলে ধরা হযেছিল। রবীন্দ্রনাথের ছবির এই প্রদর্শনীটি কলকাতার সংস্কৃতি জগতে বিশেষ আলোড়ন তুলতেও সক্ষম হয। মুকুল দে ১৯৩১ থেকে 'আওয়ার ম্যাগাজিন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেছিলেন—-যাতে ছাপা হত স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের কাজের নির্বাচিত নিদর্শনসমূহ।

স্কুলের পুরনো শিক্ষকেরা একে একে অবসর নিলে তাঁদের জায়গায মুকুল দে যথাক্রমে রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৯), সতীশচন্দ্র সিংহ (১৯২৯), মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত (১৯৩১) ও সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (১৯৩২) নিযুক্ত কবেন। এঁদের মধ্যে সতীশচন্দ্র ছিলেন আর্ট কলেজে যামিনীপ্রকাশের ছাত্র; কিন্তু বাকি তিনজনই ছিলেন শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্র—প্রধানত নন্দলালের হাতে-গড়া শিল্পী। এই নিয়োগেব ফলে অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল প্রবর্তিত চিত্রধারার শিক্ষা যে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে পূর্ণ মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মুকুল দে অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র হলেও, তাঁর দীর্ঘদিনের ইয়োরোপ ও আমেরিকার চিত্রশিক্ষা তাঁকে যথেষ্ট উদার মনোভাবাপন্ন করে তুলেছিল। তিনি ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় উভয় রীতির চিত্রশিক্ষাকেই যোগ্যতম শিক্ষকদের সাহায্যে বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি সতীশ সিংহকে এবং তারপর পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক রীতির সুদক্ষ শিল্পী অতুল বসুকে স্কুলে আহ্বান করে আনেন। অতুল বসু বিদ্যালয় ছেড়ে বিলেতে চলে গেলে তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন ইয়োরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশিষ্ট চিত্রকব, খ্যাতিমান প্রতিকৃতি-শিল্পী বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে (১৯৩০)। মুকুল দে ব্যক্তিগতভাবে মনে করতেন পাশ্চাত্যরীতির শিল্পীরা পুরনো অ্যাকাডেমিক রীতির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে নতুন প্রজন্মেব ছাত্রদের নতুনতর ইয়োরোপীয় করণকৌশলের সঙ্গে পরিচিত করুন। তিনি নিজে তাঁর নিজস্ব মেশিনে ছাত্রদের ধাতুপাতে এচিং করে ছাপাই ছবি করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন তাঁদের নিয়মিত পাঠ্যক্রমের বাইরে।

শিক্ষক এবং শিল্পী হিসাবে রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। কলাভবনের আশ্রম-পরিবেশে ও নন্দলালের সাধকসুলভ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এঁরা সকলেই ছিলেন কর্মঠ এবং নিষ্ঠাবান। নন্দলালের শিক্ষার গুণে ও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এঁরা কেবলমাত্র পুরাণ-ইতিহাসের পাতা থেকে ছবির বিষয় আহরণ না করে প্রকৃতি ও জীবনমুখী ছবির প্রতিও বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। রমেন্দ্রনাথ ছাপাই ছবিতে বিশেষ মনোযোগী হয়ে ওঠার আগে অবনীন্দ্রনাথের ধারায় ও নন্দলালের শিক্ষায় ভারতীয় শৈলীতে যে সব ছবি এঁকেছেন তার মধ্যে দেখা যায় 'বাজার', 'গঙ্গার ঘাট', 'পদ্মার চর', 'বিবাহান্তের শোভাযাত্রা'র মতো জনজীবন-আশ্রিত ছবি। মণীন্দ্রভূষণ তাঁর ভ্রাম্যমাণ জীবনের বহু নিসর্গচিত্র দিয়ে বিস্তৃত করেছেন নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলাকে—যার মধ্যে অবশ্য স্মরণীয় হল হিমালয়ের দৃশ্যাবলি। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পীজীবনে আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে না এগিয়ে নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতিকেই তাঁর নিষ্ঠায় ও রুচিবোধে পরিশীলিত করেছেন। তাঁর তুলিতে যেমন পুরাণকাহিনী রূপ পেয়েছে, তেমনই পেয়েছে বাংলার পল্লিজীবনের নানান ঘনিষ্ঠ দৃশ্য। গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে এঁদের প্রথমদিককার ছাত্র সুশীলচন্দ্র সেন ও অজিতকৃষ্ণ গুপ্ত এবং

ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর ছাত্র ইন্দুভূষণ রক্ষিত ভারতীয় রীতির অনুগামী হয়েও তাঁদের চিত্রের বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন অতীতচারী পুরাণ ও ইতিহাসের পরিবর্তে প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে শান্ত ও সুস্মিত সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনধারাকে। ইন্দুভূষণ তো অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৯৩৪-এ প্রকাশিত তাঁর একটি রচনায় এ কথা ঘোষণাই করেছিলেন যে পুরনো ও অচল পৌরাণিক মনোভাব ছেড়ে তাঁদের চিত্রকলা এগিয়ে চলেছে সমকালীন ভারতীয় জীবনধারার দিকে[১০৯]। ভারতীয় রীতিতে এই পর্বে চিত্রবিদ্যা শিখে যাঁরা খ্যাতিমান হন তাঁদের মধ্যে আরও উল্লেখ করা যায় জ্যোতিরিন্দ্র রায়, আব্দুল মৈন, হেরম্ব গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেশ গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীর মুন্শী, মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নাম। এঁরা সবাই ছিলেন গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র। শান্তিনিকেতন থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত, প্রথমে নন্দলাল ও পরে অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র, মনীষী দে-র কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে। কেননা তিরিশের দশকেও যে ক'জন শিল্পীর কাজে অবনীন্দ্র-নন্দলালের চিত্ররীতি সজীব ও হৃদয়স্পর্শী ছিল তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। শান্তিনিকেতন ও কলকাতা ছেড়ে সুদূর বাঙ্গালোরে চলে গেলেও মনীষী দে-র ছবি নব্য-বঙ্গীয় শৈলীর এক সংবেদনশীল পরিশীলিত অভিব্যক্তি হিসাবে দেশে ও বিদেশে স্বীকৃতি লাভ করেছে। হালকা ওয়াশে করা তাঁর নিসর্গচিত্রগুলিতে এবং নরনারীর বিভিন্ন চরিত্রচিত্রণে, শিল্পীর আত্মস্থ মেজাজ ও উন্নত রুচি সুস্পষ্ট। পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও যে তাঁর অনীহা ছিল না, তা বোঝা যায় মোজেইক ধরনে করা তাঁর পূর্ণাঙ্গ ২৯
রবীন্দ্র-প্রতিকৃতিটি দেখে।

প্রসঙ্গত আবার উল্লেখ করতে হয় তিরিশের দশকে করা অবনীন্দ্রনাথের ছবির কথা। নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার আদিগুরু অবনীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে আঁকেন তাঁর বহুখ্যাত 'আরব্য উপন্যাস' সিরিজের ছবিগুলি। 'ওমর খৈয়াম' সিরিজের পর এত অভিনিবেশ সহকারে আর কোনো সিরিজই তিনি আঁকেননি। এই 'আরব্য উপন্যাস' সিরিজের ছবিতে দেখা গেল অবনীন্দ্র-চিত্রকলার পূর্ণ বিকাশ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিনোদবিহারী বলেছেন, এই আরব্য উপন্যাস সিরিজেই অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত শিল্পীব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটাতে পেরেছিলেন। এই ছবিগুলিতে তিনি তাঁর সারাজীবনের অভিজ্ঞতায় বোগদাদের লৌকিক ও অলৌকিক ঘটনাবলির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন উনিশ শতকের কলকাতার জীবনকে[১১০]। এমন-কি, চিত্র-নির্মিতির ক্ষেত্রেও এই সিরিজে তিনি শুদ্ধতম চিত্রের দ্বিমাত্রিক কাহিনীর পর কাহিনী অভিনব বস্তুবিন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন! কিন্তু এই অনন্যসাধারণ ছবিগুলি আঁকার পর দীর্ঘ আট বছর তিনি আর তুলি ধরেননি, বরং তার বদলে তাঁর স্বাভাবসিদ্ধ উন্মাদনায় লিখে গেছেন যাত্রা, পালাগান, গল্প-কাহিনী। তারপর, মুকুল দে-র উদ্যমে, গুরুর সামনে প্রতিদিন ছবি এঁকে রং-তুলি ছড়িয়ে রাখার ফলে, একদিন আবার সেই রং-তুলি হাতে নিয়ে হঠাৎই ছবির জগতে ফিরে আসেন অবনীন্দ্রনাথ। মাত্র চার-পাঁচ মাসের মধ্যে আঁকেন কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও কৃষ্ণমঙ্গল সিরিজের প্রায় একশ খানা ছবি। এ ছবিতে তাৎপর্যপূর্ণভাবেই দেখা যায় মুঘল আর পারসিক ইতিহাস আর কল্পকাহিনীর পৃথিবী থেকে তিনি চলে এসেছেন বাংলার লোকজ মঙ্গলকাব্যে—আর এই ছবির জন্যে বেছে নিয়েছেন বাংলারই লোকচিত্রকলার কাঠামো। মোটা বলিষ্ঠ রেখায়, চড়া রঙের প্রয়োগে তিনি নতুন এক চিত্রবোধে আঁকলেন এই দুই সিরিজের ছবিগুলি।

মুকুল দে প্রায় পনেরো বছর অধ্যক্ষতার পর ১৯৪৩ সালে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে অবসর নেন। এই দেড় দশককাল আর্ট স্কুলের শিক্ষার মান তিনি যে যথেষ্ট উন্নত রাখতে পেরেছিলেন তার প্রমাণ তাঁর আমলের কৃতী ছাত্ররা। ভারতীয় চিত্রকলা বিভাগের ছাত্রদের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি যে পাশ্চাত্য চিত্ররীতির ক্ষেত্রেও সমান মনোযোগী ছিলেন তা

বোঝা যায় ফাইন আর্ট বিভাগে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে শৈলজ মুখোপাধ্যায়, জয়নুল আবেদিন, রথীন্দ্র মৈত্র, কিশোরী রায়, সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের মতো পরবর্তী কালে অশেষ খ্যাতিমান শিল্পীদের নাম থেকে। এই সব শিল্পীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই পরবর্তী চল্লিশের দশকে বাংলা চিত্রকলার জগতে আধুনিকতার শর্তে নতুন বাক্‌ধারার সৃজনশীল অধ্যায় শুরু হয়েছিল।



১৩ বুভুক্ষু, আদিনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৯৪৩ খ্রি



৭৪ ১৩৫০-এর মন্বন্তর, জয়নুল আবেদিন, ১৯৪৩ খ্রি

৩৭ ১৩৫০-এর মন্বন্তর ও শিল্পীর প্রতিবাদ

তিরিশের দশক জুড়ে অর্থনৈতিক মন্দার ফলে মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবন পর্যুদস্ত হচ্ছিল। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও ব্যাপক আর ভয়াবহ আকার নিয়ে শুরু হলে তার প্রভাব এসে পড়ল ভারতবর্ষেও। একদিকে ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতের সকল সম্পদ আহরণ করে নিজেদের যুদ্ধপ্রস্তুতিতে ব্যবহার করতে শুরু করল, অন্যদিকে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেল। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হলে পুলিশের অত্যাচারের শেষ থাকল না। কিন্তু জার্মানি সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করলে কমিউনিস্টরা জাতীয় মুক্তি অপেক্ষা ফ্যাসিস্টশক্তির প্রতিরোধকেই বেশি গুরুত্ব দিল। বিশেষ করে ফ্যাসিস্ট দলভুক্ত জাপান দ্রুত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অধিকার করে ভারতের দিকে এগিয়ে এলে, বোমারু আক্রমণে চট্টগ্রাম শহরকে গুঁড়িয়ে দিলে, পৃথিবীর নানান দেশের ফ্যাসীবিরোধী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কলকাতার লেখক-শিল্পীদের অনেকেই পৃথিবীর সেই অশুভ দানব শক্তির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হলেন—গঠিত হল ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ (১৯৪২)। প্রচলিত যে শিল্পাদর্শ—যার মূল কথা হল রসসৃষ্টিতেই শিল্পের সার্থকতা—তার ভিত্তি নড়ে উঠেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই। শান্ত, সুস্থ ও পরিশীলিত শিল্পবোধ ও ভাবনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন কিছু কিছু নবীন সাহিত্যিক ও শিল্পী—তাঁরা জীবনের দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে তুলতে শুরু করেছিলেন বিশ আর তিরিশের দশকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার অনিশ্চয়তা, ফ্যাসিস্ট অক্ষবাহিনীর আক্রমণে দুর্বল দেশগুলির পরাজয় এবং সেখানকার মানুষের দুঃখ, যন্ত্রণা, প্রতিরোধ বাঙালি শিল্পী-সাহিত্যিকদের দ্রুত টেনে এনেছিল সমাজ-বাস্তবতার আদর্শের দিকে। তাঁরা শিল্প আর সাহিত্যকে বিনোদনের উপাদানে সীমাবদ্ধ না রেখে, করে তুলতে চাইলেন মানুষের জীবনমরণ সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার।

এই সময়েই বাংলার বুকে নেমে আসে ১৩৫০-এর মহাদুর্ভিক্ষ। বিদেশী শাসক আর দেশী মজুতদারদের যোগসাজশে সহসা দেশের হাট-বাজার থেকে ধান-চাল গেল উধাও হয়ে—দারুণ দুর্মূল্যে গ্রামের গরিবদের জীবন হল দুর্বিষহ। দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামের মানুষ খাদ্যের সন্ধানে দলে দলে এল কলকাতায়। তারপর তাদের 'ফ্যান দাও' 'ফ্যান দাও' হাহাকার ও পথে পথে মৃত্যু। এই দৃশ্য, মানবতার এই অপমান বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে আনল এক বিরাট পরিবর্তন—দলমত নির্বিশেষে তাঁরা এগিয়ে এলেন দেশের মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার অংশীদার হতে। সে সময় ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের উদ্যোগে রচিত হল গান, কবিতা, নাটক, গল্প ও উপন্যাস। শিল্পীরাও পিছিয়ে থাকলেন না, প্রবীণ ও নবীন শিল্পীরা তুলি ধরলেন সেই দুর্ভিক্ষের নিদারুণ অভিজ্ঞতাকে চিত্রপটে ধরে রাখতে। অনাহারে ক্লিষ্ট অস্থিসার মানুষের মিছিল আঁকলেন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ও অতুল বসুর মতো প্রবীণ শিল্পী। গোবর্দ্ধন আশ তাঁর বেগমপুরের গ্রামে বসেই শহরাভিমুখী অনাহার অনশনে কঙ্কালসার নারী-পুরুষ-শিশুর মর্মস্পর্শী ছবি ধরে রাখলেন দ্রুত তুলির প্রাণবন্ত টানে। অবনী সেন দুর্ভিক্ষের প্রতিবাদ জানালেন ভয়ংকর জন্তুর প্রতীকী চিত্র এঁকে। নবীন শিল্পীরাও পিছিয়ে থাকলেন না—গোপাল ঘোষ, নীরদ মজুমদার, সূর্য রায়, ইন্দ্র দুগার প্রমুখ শিল্পীরা তুলি আর কলমে দুর্ভিক্ষের দিনলিপি রচনা ৭৩

করলেন। গ্রামে ঘুরে ঘুরে বুভুক্ষু কৃষকদের ছবি আঁকলেন তরুণ সোমনাথ হোর, শহরের ৭৫
ফুটপাতের মৃত্যু আঁকলেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। অন্যভাবে, প্রতীকী তাৎপর্যে দুর্ভিক্ষের ব্যাখ্যা ৭৭
দিলেন নন্দলাল বসু তাঁর অন্নদাতা অন্নপূর্ণার ছবিতে—সামনে নৃত্যরত ভিক্ষাভাণ্ড হাতে কঙ্কালসার শিব তখনকার সেই সময়েরই প্রতীক। শান্ত, সমাহিত যামিনী রায়ও নিশ্চুপ থাকলেন না। তবে সবথেকে প্রাণস্পর্শী আর নিষ্করুণ, সবথেকে সার্থক আর সংবেদনশীল ১৩৫০-এর মন্বন্তরের ছবি আঁকলেন জয়নুল আবেদিন ও চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য। এই দুই তরুণ শিল্পীই ছিলেন ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সদস্য।

জয়নুল আবেদিন কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে পড়তে আসেন অবিভক্ত বাংলার মৈমনসিং জেলার কিশোরগঞ্জ থেকে। তাঁর শিল্পীজীবনের অনুপ্রেরণা ছিল পূর্ববাংলার প্রকৃতি—বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্রের মতো বড় বড় নদীর প্রবহমানতা। তিনি আর্ট স্কুল থেকে পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক রীতির চিত্রবিদ্যা শিখে বেরোন ১৯৩৮-এ। ওই বছরেই আর্ট স্কুলের শিক্ষকতার কাজ পেয়ে শুরু হয় তাঁর শিল্পীজীবন। তাঁর মনের গঠন ছিল রোমান্টিক—যেমন তাঁকে টানত ব্রহ্মপুত্র নদের বিস্তার আর তার পারাপারের মানুষ, তেমনই সাঁওতাল পরগনার নিসর্গ আর আদিবাসী নারী-পুরুষের ছন্দোময় জীবন। ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষ তাঁকে এই সহজ আনন্দের জীবন থেকে এক ধাক্কায় সরিয়ে আনল। দুর্ভিক্ষের সূচনায় তিনি ফিরে যান মৈমনসিং-এ, কিন্তু সেখানকার মানুষের দুর্দশা সহ্য করতে না পেরে চলে আসেন কলকাতায়। যেন তাঁকে অনুসরণ করেই কলকাতায় এসে হাজির হয় হাজার হাজার অভুক্ত মানুষ। তাদের
হতাশা আর বেদনা, বুভুক্ষা আর হাহাকার তিনি আঁকলেন এক সিরিজ কালি আর শুকনো তুলির ৭৮
স্কেচে। যুদ্ধের ডামাডোলে ভালো কাগজ ছিল দুর্লভ আর দুর্মূল্য। ফলে সস্তা, হালকা রঙের মোড়কের কাগজে জয়নুল এঁকেছিলেন তাঁর বলিষ্ঠ রেখা আর দরদী মনের স্কেচগুলি—যা আজ ১৩৫০-এর বাংলার মহামন্বন্তরের মহামূল্য দলিল। দুর্ভিক্ষের ছবিগুলি প্রধানত কালি-তুলিতে আঁকলেও তার একটি এঁকেছিলেন তেলরঙে আর দুটি ছাপাই পদ্ধতিতে—একটি ড্রাই পয়েন্ট, অন্যটি লিনোকাট-এ। এই ছবিগুলি জয়নুলের এতই প্রিয় ছিল যে সেগুলিকে কোনোদিন হাতছাড়া করেননি তিনি। দুর্ভিক্ষের মানুষগুলিকে তিনি সাধারণ অনাহারী জীব হিসাবে আঁকেননি, তিনি তাঁর সংবেদনশীলতায় প্রত্যেককে দিয়েছেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভিব্যক্তি, বিশেষ বিশেষ চরিত্র। এই ছবিগুলি দেখে তাই ১৯৪৪-এ অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে, "জয়নুলের দুঃসাহসী নিষ্করুণ তুলির আঁচড়ে এমন এক স্বতঃস্ফূর্ততা, আন্তরিকতা ও বাস্তবধর্মিতা ফুটে উঠেছে যা বাংলার আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে দুর্লভ"[১১১]। ১৯৫২-তে লন্ডনের এক প্রদর্শনীতে এই ছবিগুলি দেখেই এরিক নিউটন মন্তব্য করলেন : "... এগুলিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এমন এক সমন্বয় দেখা যায়, যা সকলেই মনে করেছেন অসাধ্য"[১১২]। জয়নুল দেশভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যান এবং সেখানকার আধুনিক চিত্রকলার শিক্ষা ও আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তারপর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে জাতীয় শিল্পীর মর্যাদা লাভ করেন। নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিচরণ করতে হয়েছে তাঁকে নানা সময়ে, কিন্তু ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষ তাঁকে যে দীক্ষায় দীক্ষিত করেছিল—সেই মানবহিতৈষিতা, সেখান থেকে তিনি সরে যাননি কোনোদিন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভকাল থেকেই চিত্তপ্রসাদ ছিলেন বামপন্থী কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। চিত্রশিক্ষা তাঁর স্বোপার্জিত—কোনো আর্ট স্কুলের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তিনি অর্জন করার সুযোগ পাননি। অথচ তাঁর শিল্পমনীষা ছিল এমনই যে নিজের একটা চিত্রভাষা খুঁজে নিতে দেরি হয়নি তাঁর। সে ভাষা সহজ কালি-তুলির ভাষা, তাঁর ছবির বিষয়ের উপযোগী সহজ

ও অনাড়ম্বর। কালো কালির ব্যবহারে তিনি এমনই সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেন যে তাঁর ছবিতে রঙের অভাব বোধ হয় না। তা ছাড়া শিল্পী হিসাবে তাঁর আত্মপ্রকাশ যে দুর্যোগের কালে, তখন রংই যেন ছিল বেমানান। তিনি তাঁর শিল্পীজীবন শুরু করেছিলেন জেলায় জেলায় ঘুরে ফ্যাসিস্ট জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে কৃষকসাধারণের সংগঠিত হওয়ার খবর আর তার ছবি কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক 'জনযুদ্ধ'-এ প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে। তাঁর ছবি যে প্রচারধর্মী ছিল, তা নয়, কিন্তু তাঁর ছবিকে তিনি ব্যবহার করেছেন প্রচারমাধ্যম হিসাবে। আর তিনি তা করেছেন সচেতনভাবেই— একজন সমাজবাস্তববাদী শিল্পীর কর্তব্যে। ১৯৪২-এ একটি নিবন্ধে তিনি নির্দ্বিধায় লিখেছিলেন: "এ যুগে জনতার জীবনের সর্বদিকে সর্বক্ষেত্রেই বণিক-রচিত যত সংকট, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের তেজ জাগাতেই প্রয়োজন মনুষ্য-দৃপ্ত শিল্পকলার। তেমন বীর্যবান কাজে না লাগলে যে শিল্প যত মধুর ও পবিত্ররসের আধার হোক, সবই আধুনিক জীবনে নিষ্প্রয়োজন বলে অন্তত আপাতত ব্যর্থ—অর্থাৎ আধুনিকতার দাবি সে শিল্প করতে পারে না"[১১৩]। দুর্ভিক্ষের বছরেও তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ছবি এঁকে এনেছেন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য। সে ছবি তিনি এঁকেছেন আলোছায়ার দ্বন্দ্বে, কালো কালির যন্ত্রণায়। দুর্ভিক্ষের পরবর্তী বছরগুলিতে কলকাতায় বসে তিনি আঁকলেন শ্রমিক-ধর্মঘট আর ছাত্র আন্দোলনের দৃপ্ত সব ছবি। তারপর ১৯৪৬ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির ইংরেজি পত্রিকার জন্যে তাঁর বোম্বাইবাস শুরু হয়। সেখানে তিনি আঁকেন 'নৌ-বিদ্রোহ' সিরিজ। আরও পরে লিনোকাট ছাপাই ছবিতে রূপ দেন শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের সেই সব শিশুদের যারা আশৈশব খেটে খায়। তাদের প্রেম আর
স্বপ্নকে চিত্তপ্রসাদ ফুটিয়ে তুলেছেন পশ্চিমভারতের লোকচিত্রকলার ঐতিহ্যকে নিজের করে ৭৬
নিয়ে বিশিষ্ট এক চিত্রভাষায়।



৭৫ রাতে খুলি বৈঠক, সোমনাথ হোড়, ১৯৪৬ খ্রি



৭৬ রাখাল বালক চিত্তপ্রসাদ, ১৯৬২ খ্রি।



৭৭ ঘরমুখো, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, আঃ ১৯৫০ খ্রি

৩৮ নব্যপন্থী শিল্পান্দোলন : ক্যালকাটা গ্রুপ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের সংকটকালে বাংলার চিত্রকলাজগতে একটা বড় ঘটনা ঘটল—১৯৪৩-এ প্রতিষ্ঠিত হল নতুন এক শিল্পীগোষ্ঠী 'ক্যালকাটা গ্রুপ'। কোনো আতিশয্য বা আড়ম্বর ছিল না, ছিল না ধনী বা প্রভাবশালী পৃষ্ঠপোষক খোঁজার চেষ্টা। সবার উপরে মানুষ সত্য এমন এক বিশ্বাস নিয়ে, তখনকার সেই মানবতার দুর্দিনে নতুন যুগোপযোগী এক শিল্পধারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভাবনা শুরু করেছিলেন মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত চারজন নবীন শিল্পী—প্রদোষ দাশগুপ্ত, কমলা দাশগুপ্ত, গোপাল ঘোষ ও পরিতোষ সেন। অন্যদিকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের স্বশিক্ষিত শিল্পী সুভো ঠাকুর ও কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে পাশ করা শিল্পী রথীন মৈত্রও অনুভব করছিলেন যে, একদিকে অ্যাকাডেমিক রীতির জড়ত্ব ও অপরদিকে নব্য-বঙ্গীয় শৈলীর অতীতচারিতার প্রতিরোধে সক্রিয় হয়ে ওঠা দরকার। এই উদ্দেশ্য নিয়ে এঁরা দু-জন যোগাযোগ করেন গোপাল ঘোষ ও ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এ শিক্ষাপ্রাপ্ত নীরদ মজুমদারের সঙ্গে। নীরদের মাধ্যমে এঁদের পরিচয় হল প্রদোষ দাশগুপ্তের সঙ্গে। তখন এঁরা সকলে মিলে একটি শিল্পীগোষ্ঠী গঠন করতে মনস্থ করেন এবং প্রদোষের পরামর্শে তার নাম দেন 'ক্যালকাটা গ্রুপ'। এই নাম প্রদোষ দিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের আধুনিকপন্থী শিল্পী-সংস্থা 'লন্ডন গ্রুপ'-এর কথা মনে রেখে। এই গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হলেন আটজন—প্রদোষ দাশগুপ্ত, সুভো ঠাকুর, রথীন মৈত্র, গোপাল ঘোষ, পরিতোষ সেন, নীরদ মজুমদার, কমলা দাশগুপ্ত ও প্রাণকৃষ্ণ পাল। প্রাণকৃষ্ণ ছিলেন নীরদের মতোই ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর কৃতী ছাত্র। ক্যালকাটা গ্রুপের যুগ্ম-সচিব নির্বাচিত হলেন প্রদোষ দাশগুপ্ত ও রথীন মৈত্র। গ্রুপ মিলিত হতে শুরু করে সুভো ঠাকুরের ৫-এ, এস. আর. দাস রোডের প্রশস্ত স্টুডিয়োতে। এখানে তাঁরা নিয়মিত জড়ো হয়ে শিল্পবিষয়ে আলোচনা করতেন। ওই আটজন ছাড়াও আলোচনায় যোগ দিতে আসতেন বিষ্ণু দে, শহীদ সুহ্‌রাবর্দী, নীহাররঞ্জন রায়, স্নেহাংশু আচার্যের মতো শিল্প-আলোচক ও রসিকেরা। সে সময় যুদ্ধের সূত্রে কলকাতায় আগত বেশ কয়েকজন ইংরেজ শিল্পী-সাহিত্যিকও যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন ক্যালকাটা গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে। এঁদের মধ্যে ঔপন্যাসিক ই. এম. ফর্স্টার, শিল্প-আলোচক জন আরউইন ও পরবর্তী কালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাস্কর্যকলার স্লেড অধ্যাপক ফ্রেডরিক ম্যাক উইলিয়ামস বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ক্যালকাটা গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যদের মধ্যে তখন পর্যন্ত ইয়োরোপীয় আধুনিক শিল্পকলার প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করেছিলেন একমাত্র প্রদোষ দাশগুপ্ত। মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে ভাস্কর্যশিল্প শিক্ষালাভের পর তিনি ১৯৩৭ থেকে ৩৯ দু-বছর লন্ডনের রয়াল অ্যাকাডেমি ও প্যারিসের ইকোল দ্য গ্রাঁ সমিয়ের-এ ভাস্কর্যে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে কলকাতায় ফিরেছিলেন। বিশেষ করে জেকোব অ্যাপস্টিনের ভাস্কর্যের আদিমত্ব ও আধুনিকতা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু গ্রুপের অন্যান্য সদস্যরাও কলকাতায় বসেই ইয়োরোপীয় আধুনিক কলাশিল্পের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেলেন তাঁদের বিদেশী শিল্প-রসিক বন্ধুদের মাধ্যমে—ইয়োরোপ থেকে আসা শিল্প-বিষয়ক পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত ছবি দেখে ও তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে। এই পরিচয় তাঁদের আধুনিক ইয়োরোপীয় কলাশিল্প—বিশেষ করে

ফরাসি শিল্পীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে আকৃষ্ট করল। তাঁরা গ্রুপে সমবেত হয়েছিলেন নানা ধারায় ও শৈলীতে শিক্ষা নিয়ে—যেমন রথীন মৈত্র নিয়েছিলেন পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক রীতির বাস্তবধর্মী ছবি আঁকাব পাঠ,নীরদ মজুমদার ও প্রাণকৃষ্ণ পাল প্রধানত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারেব কাছে শেখেন অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত নব্য-বঙ্গীয় চিত্রশৈলী আর প্রদোষ দাশগুপ্ত, গোপাল ঘোষ, পরিতোষ সেন ও কমলা দাশগুপ্ত মাদ্রাজ থেকে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে শিখে এসেছিলেন উপরোক্ত দুই ধারারই শিল্পবিদ্যা। এঁরা মিলিত হয়েছিলেন এক সাধারণ লক্ষ্যে—শিল্পকে পুরনো অভ্যাসের নিগড় থেকে মুক্ত করে 'সমকালীন' করে তুলতে। এঁরা ঘোষণা করলেন: "আর্টের উদ্দেশ্য হবে আন্তর্জাতিক নির্ভরতামূলক দেওয়া-নেওয়াব মধ্যে...গত তিন শ' বছরের মধ্যে ভারতের বাইরের জগৎ শিল্পক্ষেত্রে প্রভূত ভাবে এগিয়ে গেছে শিল্পের আঙ্গিকগত পরিভাষার নতুন নতুন আবিষ্কারে। তাই আমাদের পক্ষে এটা খুবই জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ফাঁককে যথাসম্ভব পূরণ করা পশ্চিমের এইসব নতুন নতুন আবিষ্কারের সাহায্য নিয়ে"[১১৪]। এঁরা আরও বললেন : "আমরা পছন্দ করি আর না করি, এটাই অবশ্যম্ভাবী। আজকের প্লেন আর টেলিভিশনের জগতে, আমাদের পদ্মশুভ্র ঐতিহ্যের শুদ্ধতা রক্ষা করা আর সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। কারণ, বিজ্ঞানের মতোই শিল্পও এক আন্তর্জাতিক ক্রিয়াকলাপে পরিণত হচ্ছে। ভাল হবে যদি আমরা সচেতনতার সঙ্গে, খুঁটিয়ে বিচার করে পছন্দ মতো বিদেশী প্রভাব আমাদের জাতীয় শৈলী ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সমন্বিত করি। কেননা, তা না হলে, অসচেতনভাবে আত্তীকৃত প্রভাব আমাদের শিল্পকে সমৃদ্ধ না করে বরং বিকৃত করতে পারে"[১১৫]।

ক্যালকাটা গ্রুপের প্রথম তৎপরতা হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে ৫-এ, এস. আর. দাস রোডে গোপাল ঘোষ, নীরদ মজুমদার ও সুভো ঠাকুরের কাজের পরপর তিনটি প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীগুলি ঠিক সর্বজনীন ছিল না।কিন্তু তা সত্ত্বেও কলারসিকদের অনেকেই এগুলি দেখে ক্যালকাটা গ্রুপের প্রতি আকৃষ্ট হন। সে সময় বাংলার গভর্নর হয়ে আসেন অস্ট্রেলিয়ার আর. জি. কেসি। তাঁর স্ত্রী মে কেসি ছিলেন শিল্পী। তিনি আরউইনের কাছে ক্যালকাটা গ্রুপের কথা শুনে ১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারিতে এস. আর. দাস রোডের স্টুডিয়োতে যান গ্রুপের সদস্যদের ছবি দেখতে। তারপর তাঁরই সহায়তায় যুদ্ধের কাজে ইয়োরোপ ও আমেরিকা থেকে আসা শিল্পী ও শিল্পরসিকদের সংস্থা সার্ভিসেস আর্ট ক্লাব-এর আওতায় গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে গ্রুপের প্রথম যৌথ ও সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত প্রদর্শনী হয় ওই বছরেরই মার্চ মাসে। এই প্রদর্শনী কলকাতার কলারসিক মহলে বিশেষ সাড়া তুলতে পেরেছিল। ক্যালকাটা গ্রুপের প্রথম আত্মপ্রকাশে কেউ কেউ বাংলার, এমন-কি ভারতের শিল্পকলা জগতে নতুন সম্ভাবনার সূত্রপাত দেখেছিলেন, আবার অন্য কেউ কেউ তাঁদের সৃষ্টি দেখে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। 'দি স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার সমালোচক লিখলেন: "...যে সব সূত্র থেকে ক্যালকাটা গ্রুপ...প্রেরণা পাচ্ছেন তা হল গগ্যাঁ, মদিগলিয়ানি আর মাতিসের কাজ। নিঃসন্দেহে এটা বলতে পারি যে এই শিল্পীরা শিল্পের বর্ণপরিচয় এঁদের কাছ থেকে পেয়েছেন কিন্তু যে ধারাবাহিকতা ও চটক ঐ সব শিল্পীদের কাজে বিদ্যমান তার সব গুণাবলি এই শিল্পীরা এখনও আত্তীগত করতে পারেননি। সেটা না হওয়া পর্যন্ত এই শিল্পীদের কাজে ব্যক্তিত্বের ছাপ গড়ে উঠবে না"[১১৬]। অন্যপক্ষে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লিখলেন: "...এই শিল্পীরা প্রবলভাবে তাঁদের জাতীয় পরম্পরাকেই অস্বীকার করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। আমাদের বলা হয়েছে যে এই শিল্পীরা পিছন দিকে তাকাবেন না আর 'ভারতীয় শিল্পে'র অর্থহীন ললিত অলংকরণ ও প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি মধ্যবিত্ত মানসিকতাসুলভ অহংবোধ কাটিয়ে উঠবেন। যদিও এ কথা স্পষ্টত অস্বীকার করা

হয়েছে যে এই শিল্পীরা ইয়োরোপের ধুলোঝড়ের দ্বারা আক্রান্ত, কিন্তু তবু দেখা যাচ্ছে যে জাতীয় পরম্পরা যেন সেই সন্দেহজনক ধুলোঝড়ে বয়ে আনা আবর্জনার অতলে চাপা পড়ে গেছে"[১১৭]।

এই দুই বিপরীত মত থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীরা তাঁদের শিল্পভাষাকে পশ্চিমী শিল্পের, বিশেষ করে সমকালীন ফরাসি শিল্পের অনুসরণে আধুনিক করে তুলতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ফেলেছিলেন। তাঁদের ঘোষণা মতোই তাঁরা নব্য-বঙ্গীয় শৈলী ও অ্যাকাডেমিক রীতির বাঁধাধরা পথ ছেড়ে নতুন পথে পা বাড়াতে সাহসী হয়েছিলেন। এই নতুন পথের অনুসন্ধানে তাঁরা অবশ্যই অতিরিক্তভাবে ফরাসি আধুনিকতার অনুকারী হয়ে উঠেছিলেন। এ কথা বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয় বিনয়কুমার সরকারের মন্তব্য থেকে। তিনি লিখেছিলেন, "একালের একোল দ্য কালকুত্তা বলতে পারি এই ক্যালকাটা গ্রুপকে···ঘরে ঢুকবামাত্র মনে হল যেন বিংশ শতাব্দীর চরমপন্থী পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পী আর ভাস্কর্যশিল্পীদের বাজারে প্রবেশ করেছি। প্যারিসে ফি বছর বসে সালোঁ দোতোন্ আর সালোঁ আঁদ পাঁদার তদবিরে দুটো বড় শিল্পমেলা। তার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আধুনিকতা, নবীনতা, চরমপন্থীতা ইত্যাদি। কলকাতার মজলিশকে এই দুই ফরাসী সালোঁর মাসতুত ভাই বলা যায়"[১১৮]। কেবল ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীরাই যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পকলার অনুকারী ছিলেন, তা নয়। সারা ভারতেই আধুনিকপন্থী শিল্পীদের কাজে এই অনুকরণধর্মিতা প্রথম প্রথম প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। ক্যালকাটা গ্রুপের অন্যতম সচিব প্রদোষ দাশগুপ্ত নিজেই পরে লিখেছেন, "···প্রধানত পাশ্চাত্য শিল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নতুনত্বের শৈল্পিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সারা দেশে কর্মপ্রেরণা দেখা দিল। গোড়ায় নবীন শিল্পীরা পশ্চিমী গুরুস্থানীয় শিল্পী পিকাসো, মাতিস, ফান গখ, হব্‌লামিন্‌ক, ব্রাক, হেনরি মূর, ব্রাঁকুসি ও অন্যান্যদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে অসার্থক প্রচেষ্টা করেছিলেন যা বিরূপ সমালোচনার কারণ হয়েছিল। কালক্রমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রভাবগুলি শিল্পীদের ব্যক্তিগত অভিব্যঞ্জনায় সদর্থকভাবে আত্তীভূত হয়েছিল"[১১৯]।

ক্যালকাটা গ্রুপের সদস্যরা একত্রিত হয়েছিলেন প্রধানত কলাশিল্পের ভাষাকে আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের শিল্পীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে। তাঁরা যে সময় মিলিত হয়েছিলেন সে সময়ের দুর্ভিক্ষ, মহাযুদ্ধ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিবেশ তাঁদের সকলকে না হোক, কয়েকজনকে গণমুখী করে তুলেছিল। সুভো ঠাকুর কেবল শিল্পী ছিলেন না, তিনি গল্প-কবিতাও লিখতেন। এ সময় প্রকাশিত তাঁর একটি গল্পের বইয়ের নাম দেন তিনি 'নীল রক্ত লাল হয়ে গেছে, আর একটি কবিতার বইয়ের নাম 'মে ডে অ্যান্ড আদার পোয়েম্‌স'। অভিজাত ঠাকুরবংশের সন্তান যে সে সময় সাম্যবাদী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকেছিলেন তা এই সাহিত্যকর্মগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। রথীন মৈত্র ছিলেন কবি ও গীতিকার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের অনুজ। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও বিষ্ণু দে তখন ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সংগঠক হিসাবে কাজ করছিলেন। সেই সূত্রে রথীন এই সংঘের কলাশাখার সম্পাদক হয়ে কমিউনিস্ট দায়বদ্ধতায় বেশ কিছু ছবিও আঁকেন। নীরদ মজুমদারও তাঁর সুহৃদ বিষ্ণু দে-র প্রভাবে সাম্যবাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন অল্পদিনের জন্যে। সে সময় তিনি মৈমনসিং জেলার নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত কৃষকসভার সম্মেলনে অলংকরণের কাজও করেছিলেন। এই সব যোগাযোগের মধ্য দিয়েই ১৯৪৫-এর শেষদিকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে বোম্বাইয়ের আর্কিটেকচারাল ভবনে ক্যালকাটা গ্রুপের দ্বিতীয় প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়। 'টাইমস্ অব ইন্ডিয়া'-র কলা-সমালোচক প্রদর্শনীটিকে বাংলার আধুনিক শিল্পের প্রথম অভিব্যক্তি হিসাবে অভিনন্দন জানালেন। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'পিপ্‌লস ওআর'-এ এই প্রদর্শনী প্রশংসিত হল প্রগতিশীল শিল্প-আন্দোলনের সূচক হিসাবে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও ক্যালকাটা গ্রুপের আন্দোলন ছিল মূলত ফর্ম-সংক্রান্ত। তাঁরা অবশ্যই যুগের দাবিতে নব্য-বঙ্গীয় শৈলীর অতীতচারিতা অতিক্রম করে, দেবদেবী-মহাকাব্য-পুরাণ ছেড়ে 'মানুষের চরিত্রগত বৃত্তিকে শিল্পের ভাষায় ব্যক্ত করতে' চেয়েছেন। কিন্তু সেখানেও 'মানুষের চরিত্রে'র চেয়ে শিল্পের ভাষার ওপরেই জোর পড়েছে বেশি—'কী আঁকব', তার চেয়ে 'কী ভাবে আঁকব' তাই ছিল গ্রুপের শিল্পীদের কাছে বড় প্রশ্ন। তাই যে অর্থে জয়নুল আবেদিন বা চিত্তপ্রসাদ সে সময় সমাজসচেতন শিল্পীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, সে অর্থে এই গ্রুপের কোনো শিল্পীই সমাজসচেতন শিল্পী ছিলেন না। আর সম্ভবত সেই কারণেই জয়নুল বা চিত্তপ্রসাদ আমন্ত্রিত হননি এই গ্রুপে যোগদানের জন্যে। আসলে রূপ ও গড়ন, রং ও রেখা, এবং তাদের ভারসাম্য ও ছন্দোময়তা ইত্যাদিই ছিল ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীদের অন্বেষার বিষয়।

এই গ্রুপের জীবন মাত্র দশ বছরের —১৯৪৩-এ তার জন্ম আর ১৯৫৩-তে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীটিই হল তার সদস্যদের শেষ যৌথ প্রয়াস। তার পরেও, ১৯৬৩-তে প্রাণকৃষ্ণ পাল, রথীন মিত্র ও হেমন্ত মিশ্র মিলে ক্যালকাটা গ্রুপের নামে কলকাতার আর্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির কক্ষে একটি প্রদর্শনী করেছিলেন। কিন্তু তাকে ঠিক গ্রুপের প্রয়াস বলা যায় না।

প্রধানত প্রদর্শনী সংগঠিত করে সদস্যদের নতুন কাজ দর্শকসমাজের সামনে তুলে ধরাই ছিল ক্যালকাটা গ্রুপের কাজ। কিন্তু সে কাজও গ্রুপ নিয়মিতভাবে করতে পারেনি প্রতি বছর। তা ছাড়া তার সদস্যরা দেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়ায় সবসময় তাঁদের নতুন কাজ দেখানোও সম্ভব হয়নি। তার ওপর এই সংক্ষিপ্ত জীবনেও গ্রুপে কম ভাঙাগড়া ঘটেনি। প্রথম বছরের পরই সুভো ঠাকুর গ্রুপের সঙ্গ ত্যাগ করেন। তারপর ১৯৪৯-এ ঘটে আরও বড় বিপর্যয়—রথীন মৈত্র ও গোপাল ঘোষ গ্রুপ ছেড়ে রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সহকারী হিসাবে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর সঙ্গে পাকাপাকিভাবে যুক্ত হন। এর ফলে গ্রুপ স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে ও তাকে শক্তিশালী করে তুলতে প্রয়োজন হল নতুন সদস্য সংগ্রহের। প্রদোষ দাশগুপ্ত ও প্রাণকৃষ্ণ পাল উদ্যোগী হলে একে একে গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হন অবনী সেন (১৯৪৭), রথীন মিত্র (১৯৪৯), গোবর্দ্ধন আশ (১৯৫০), রামকিঙ্কর বেইজ (১৯৫০), সুনীলমাধব সেন (১৯৫১) ও হেমন্ত মিশ্র (১৯৫২)। এঁরাও যে সকলে শেষ পর্যন্ত গ্রুপের সঙ্গে সংযোগ রেখেছিলেন, এমন নয়।

বাংলার চিত্রকলায় ক্যালকাটা গ্রুপের আন্দোলন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই তাৎপর্য গ্রুপ চলাকালীন তার সদস্যদের শিল্পকর্মের গুরুত্বের কারণে নয়। কেননা সেই পর্যায়ে গ্রুপের প্রায় সকল সদস্যের কাজই ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইয়োরোপের আধুনিক শিল্পীদের কাজের দ্বারা প্রকটভাবেই প্রভাবিত। এই আন্দোলনের গুরুত্ব হল সদস্য-শিল্পীদের নতুন পথে এগোবার ক্ষেত্রে সহায়ক হওয়া ও অনুপ্রেরণা জোগানো। গ্রুপের প্রত্যেক শিল্পীই ছিলেন শক্তিশালী। তাঁদের সকলেই পরবর্তী সময় আপন আপন চিত্রভাষায় ছবি এঁকে বাংলার আধুনিক চিত্রকলাকে বহুমুখী ও বিচিত্রগামী করেছেন, সমৃদ্ধি দিয়েছেন। আর এ কথা অনস্বীকার্য যে তাঁদের ব্যক্তিগত সাফল্যের পিছনে গ্রুপের দিনগুলির সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা নানাভাবেই কাজ করেছে।

কেবল বাংলার নয়, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের আধুনিক কলাশিল্পের আন্দোলনেও ক্যালকাটা গ্রুপের উদাহরণ সে সময় বিশেষ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। এই গ্রুপের ১৯৪৫-এর বোম্বাইয়ের প্রদর্শনী দেখে উদ্বুদ্ধ হন সেখানকার আধুনিকপন্থী শিল্পীরা—তাঁরা সংগঠিত হন ১৯৪৮-এ প্রতিষ্ঠিত বোম্বে প্রোগ্রেসিভ গ্রুপ-এ। একই সময় গড়ে ওঠে দিল্লির আধুনিকপন্থী 'দিল্লি শিল্পীচক্র' আর মাদ্রাজের প্রোগ্রেসিভ আর্টিস্টস্ গ্রুপ। এর দু-বছর আগে, ১৯৪৬-এ গঠিত

হয় কাশ্মীর গ্রুপ। এইভাবে প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে কলকাতার আন্দোলনের ঢেউ চল্লিশের দশকের শেষদিকে ভারতের কলাশিল্পচর্চার প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

আধুনিক কলাশিল্পের আন্দোলনকে সর্বভারতীয় চরিত্র দিতে ও তাকে শক্তিশালী করে তুলতে আগ্রহী ক্যালকাটা গ্রুপ ও বোম্বে প্রোগ্রেসিভ গ্রুপের শিল্পীরা ১৯৫০-এ একটি মিলিত প্রয়াস নিয়েছিলেন। তাঁরা ওই বছরের এপ্রিল মাসে কলকাতায় ১ চৌরঙ্গি টেরাসে একটি যৌথ প্রদর্শনী করেন। এই প্রদর্শনীতে ক্যালকাটা গ্রুপের পক্ষে অংশ নেন চিত্রশিল্পী নীরদ মজুমদার, প্রাণকৃষ্ণ পাল, গোবর্দ্ধন আশ ও রথীন মিত্র এবং ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজ, প্রদোষ দাশগুপ্ত ও কমলা দাশগুপ্ত। আর বোম্বে গ্রুপের অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন কে. এইচ. আরা, মকবুল ফিদা হুসেন, ফ্রান্সিস নিউটন সুজা, এইচ. এ. গাড়ে, সৈয়দ হাইদার রাজা ও রাইবা এবং ভাস্কর সদানন্দ কে. বাকরে।

এই যৌথ প্রদর্শনীতে বহু লোকেব সমাগম ঘটেছিল এবং পত্র-পত্রিকাতেও প্রদর্শনীটি বিশেষ প্রচার লাভ করেছিল। 'যুগান্তব' পত্রিকার কলা-সমালোচক লিখেছিলেন, "সম্প্রতি বিরানব্বুইখানা শিল্প নিদর্শন নিয়ে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন ক্যালকাটা গ্রুপ। বোম্বাইয়েব প্রগতিবাদী শিল্পী ও ক্যালকাটা গ্রুপের সদস্যবৃন্দের এই সম্মিলিত প্রদর্শনীটি শিল্প-সৃজনে আধুনিক শিল্পীমনের স্বাধীনতা ও মৌলিক প্রচেষ্টার পবিচয় দিয়েছে। প্রাণবান বলিষ্ঠতার দাবীতে এই প্রদর্শনী যে স্থান অধিকার করেছে অধুনাকালে তাব তুলনা স্বল্প।...আমাদেব আধুনিক শিল্পীদের হেঁয়ালিপনা নিয়ে সাধারণ দর্শকমণ্ডলীতে অভিযোগের কণ্ঠ সুউচ্চ। সাধারণত দর্শকেরা চলেন এক যুগ পেছনের রুচি ও বিচার ক্ষমতা নিয়ে। সুতরাং যাঁরা নতুন লিখবেন বা নতুন আঁকবেন তাঁদের পক্ষে প্রারম্ভেই জনপ্রিয়তা লাভ অসম্ভব না হলেও দুর্লভ ত' নিশ্চয়ই। তবু এ সমস্ত কিছু স্মরণ রেখেও মাঝে মাঝে এই আধুনিকদের অতি নব্যতা আমাদের পীড়িত করে। কিন্তু এবার সে মনঃপীড়া থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। কয়েকটি বিশিষ্ট ও প্রকৃষ্ট শিল্পকর্ম দেখে একটি সন্ধ্যাকে ভরিয়ে তোলার যে সুখ তা এই প্রদর্শনী আমাদের দিয়েছে"[১২০]। 'লোকসেবক' পত্রিকাব সমালোচক লিখলেন, "ভবিষ্যতের ইতিহাস লেখক চৌরঙ্গী টেরাসের আজকার প্রদর্শনীতে ভারতীয় আর্টের রেনেসাঁর Premonitory Symptom ছাড়া আর কিছু বলে ভুল করবে না। শিল্পীরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ"[১২১]। বাস্তবিকই, কলকাতাব কলারসিকদের বৃহত্তর অংশই এই প্রদর্শনীকে আধুনিকপন্থী ভারতীয় শিল্পীদের প্রথম পরিণত পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য করেছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন ক্যালকাটা গ্রুপ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠে বাংলা শুধু নয় ভারতের কলাশিল্পের ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটাবে। কিন্তু গ্রুপ সে দায়িত্ব সম্যকভাবে পালন করতে পারেনি। কয়েক বছরের মধ্যেই তার সদস্যরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এবং সে কথা স্মরণ করলে বলা যেতে পারে যে ১৯৫০-এ এই প্রদর্শনীই ছিল গ্রুপের চরম স্ফুরণ। এরপর থেকেই তার অবক্ষয় শুরু হয়ে যায়।

কলকাতার ১৯৫০-এর এই প্রদর্শনীটি আর একটি কারণেও গুরুত্বপূর্ণ—তা হল এই প্রথম কলকাতা ও বোম্বাইয়ের শিল্পীরা একই আন্দোলনেব শরিক হয়ে মিলিত হয়েছিলেন। এর আগের প্রজন্মে কলকাতা ও বোম্বাই দুটি পরস্পর বিরোধী শিল্পাদর্শ নিয়ে সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলেছিল। তখন কলকাতা ছিল প্রাচ্যরীতিতে আস্থাশীল নব্য-বঙ্গীয় কলাশিল্পের কেন্দ্র আর বোম্বাই ছিল ইয়োরোপীয় অ্যাকাডেমিক বাস্তবধর্মিতার ভারতীয় পীঠস্থান। নতুন কাল, নতুন পবিস্থিতি, এবং কলাশিল্পের আন্তর্জাতিক মূল্যবোধ কেবল কলকাতা ও বোম্বাই নয় দিল্লি ও মাদ্রাজের শিল্পীদেরও পরবর্তী দশকগুলিতে একই আধুনিকতার আন্দোলনের দিকে টেনে এনেছিল।

৩৯ ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীবৃন্দ : চিত্রে আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা

ক্যালকাটা গ্রুপ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগেই তার সদস্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েন, এবং গ্রুপ হিসাবে তার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে গ্রুপের শিল্পীদের ব্যক্তিগত শিল্প-সাধনাও সেই সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে যায়। বরং লক্ষ করা যায় পঞ্চাশ আর ষাটের দশক জুড়ে গ্রুপের পূর্বতন সদস্যরা নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যক্তিগত শিল্প-ভাবনাকে রঙে ও রেখায় রূপ দিচ্ছেন। তাঁদের অনেকেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে এই দুই দশকেই আধুনিক ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পীর মর্যাদা অর্জন করে নিয়েছিলেন। এই গ্রুপের দুজন ছিলেন ভাস্কর—প্রদোষ দাশগুপ্ত ও তাঁর স্ত্রী কমলা, আর অপর একজন, রামকিঙ্কর বেইজ, ছিলেন প্রধানত ভাস্কর, তবে চিত্রশিল্পী হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব কম ছিল না। আব বাকি সকলেই ছিলেন চিত্রকর। রামকিঙ্কর সহ তাঁদেব রূপসাধনার মধ্য দিয়েই প্রধানত বাংলার আধুনিক চিত্রকলার চর্চা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাই তাঁদের কাজের কিছু সবিশেষ আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

বয়োক্রমের বিচারে প্রথমেই নাম করতে হয় রামকিঙ্করের। কিন্তু তিনি ছিলেন ক্যালকাটা গ্রুপের আমন্ত্রিত সদস্য এবং তাঁর ছবির আলোচনা ইতিমধ্যেই শান্তিনিকেতনের চিত্রধারার সূত্রে করা হয়েছে। অবনী সেন ও গোবর্দ্ধন আশ একইভাবে পরিণত বয়সে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন গ্রুপে। তিরিশের দশকে তাঁদের যে আধুনিকতার প্রয়াস তাও চিহ্নিত হয়েছে পূর্ববর্তী কয়েক পৃষ্ঠায়। গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যদের মধ্যে সম্ভবত প্রবীণতম ছিলেন সুভো ঠাকুর। কিন্তু তিনি গ্রুপের ১৯৪৫-এর প্রদর্শনীতেই কেবল অংশ নিয়েছিলেন। সেই প্রদর্শনীতে তাঁর উপস্থিতি অবশ্যই আকর্ষণীয় ছিল। কেননা তিনি এক নতুন রীতিতে, রঙের ছোট ছোট বর্গাকার খণ্ড দিয়ে, প্রায় জ্যামিতিক শৃঙ্খলে প্রতিকৃতি রচনায় সফলকাম হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বিশেষ করে ভারতীয় পরম্পরার কারুকলার সমজদার। তাঁর ছবিতে তাই কারুশিল্পীর শৃঙ্খলাবোধের সঙ্গে ৩০
অলংকরণপ্রীতিও যুক্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর করা জওহরলাল, নেতাজি সুভাষ ও রবীন্দ্রনাথের বহু পরিচিত প্রতিকৃতিগুলি অঙ্কিত হয়েছে বস্ত্রবুননের রূপবন্ধনে। পরবর্তী কালে অবশ্য সুভো ঠাকুর চিত্রকর হিসাবে অধিক পথ অতিক্রম করেছিলেন, এমন নয়।

রথীন মৈত্র কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের শিক্ষায় অ্যাকাডেমিক রীতিতে তেলরঙের ছবি আঁকায় দক্ষতা প্রদর্শন করলেও তিনি ক্যালকাটা গ্রুপের প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিজের একটা চিত্রভাষা তৈরি করে নিতে প্রয়াসী হন। তখনকার যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষের পরিবেশে তিনি যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর নতুন চিত্রভাষা তিনি কিন্তু খুঁজে নেন বাস্তবধর্মী অ্যাকাডেমিক আদর্শের বদলে অলংকারধর্মী এক বাক্‌রীতির মাধ্যমে, যে বাক্‌রীতি অনুপ্রাণিত হয়েছিল যামিনী রায়ের লোকচিত্র-নির্ভর শৈলীর দ্বারা। তাঁর এই অনুপ্রেরণার কথা রথীন নিজেই স্বীকার করে বলেছেন, "যামিনীদা'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি সেই সময়। আর প্রায়ই যামিনীদা'র ছবির বিষয় থেকে শুরু করে রঙ, রেখা, রচনা আমাকে নাড়া দিত।...হয়তো অনেকটাই ওই সময়ে যামিনীদা'র সান্নিধ্য ছাড়তে পারিনি বলেই আমার কাজে লোকায়ত শিল্পানুষঙ্গ বা পটের সরলীকরণের ছাপ পড়েছিল"[১২২]।

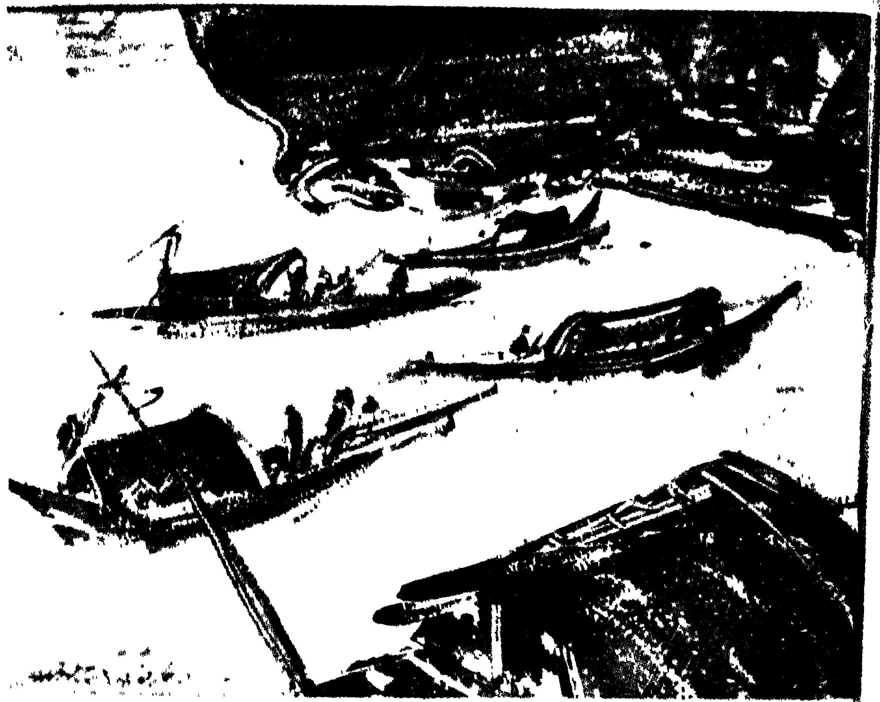


৭৮ গতি, রথীন মৈত্র, আঃ ১৯৫০ খ্রি

এই স্বীকৃতি সত্ত্বেও তাঁর অলংকারধর্মী, সুপরিকল্পিত 'সাঁওতাল মা', 'সাঁওতাল নাচ',
'নৌকাবাইচ উৎসব', 'নমাজ' আর 'পুনর্মিলন'-এর মতো ছবিতে আধুনিক মননশীলতার পরিচয়
স্পষ্ট। তাঁর সমাজমনস্ক মন শেষোক্ত ছবিটিতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির এক ঐতিহাসিক
মুহূর্তকে ধরে রেখেছে গ্রামবাংলার সমৃদ্ধ পরিবেশে। রথীনের শিল্পীজীবন মূলত কলকাতার
নাগরিক পরিমণ্ডলে গড়ে উঠলেও, তাঁর ছবি সাঁওতাল জীবন ও তাঁর উত্তরবঙ্গের জন্মভূমির
স্মৃতি বহন করে। ক্যালকাটা গ্রুপের সময় থেকে তাঁর কাজে এক বিশেষ পরিকল্পনাজাত
আঙ্গিকধর্মিতার প্রবণতা দেখা দিলেও শিল্পী হিসাবে তাঁর যে উৎকর্ষ ও বিশিষ্টতা তা সব সময়েই
স্পষ্ট। তাঁর ছবি একদিকে নয়নাভিরাম, অন্যদিকে জীবনধর্মী। জীবনের প্রাণশক্তিও কখনও ৭৮
কখনও রূপ নিয়েছে তাঁর তুলিতে, যেমন মৃগযূথের দ্রুতগমনে। আর সেই কারণেই তাঁর রচনার
স্বল্পতা চিত্ররসিক সমাজের অতৃপ্তির কারণ হয়ে ওঠে।

সৃজনশীলতায় গোপাল ঘোষ রথীন মৈত্রের বিপরীত মেরুর। শিল্পীজীবনে তিনি কাজ করে
গেছেন অক্লান্তভাবে। তার পরিমাণ তাঁর সমকালীন শিল্পীদের কাজের তুলনায় বিপুল। তাঁর
রেখার চলৎশক্তি, বর্ণের উচ্ছ্বাস আর রচনার স্বতঃস্ফূর্ততা তাঁকে তাঁর কালের এক প্রধান শিল্পীর
মর্যাদা দিয়েছে। নিসর্গ রচনায় সম্ভবত তাঁকে বলা যায় সমসাময়িকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য—আর
তা কী সংখ্যার কারণে, কী উৎকর্ষের বিচারে। তিনি তাঁর নিসর্গচিত্রগুলি এঁকেছেন প্রধানত ঘন ৭৯
জলরঙে ও প্যাস্টেলে, আর কখনও কখনও দুইয়ের মিশ্রণে। প্যাস্টেলের ব্যবহারে তিনি যে
ফরাসি ইম্প্রেশনিস্টদের কাজের দ্বারা অনুপ্রাণিত তা তাঁর ছবি দেখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না।
কিন্তু তাঁর ক্যালিগ্রাফিক লাইন, আকাশচারী পরিপ্রেক্ষিত আর চিত্রপটে ক্ষুদ্রায়তনে মানুষ, পাখি
বা কোনো পশুর সংযোজনের মধ্য দিয়ে ব্যাপ্তি আনায় রয়েছে চীনা ও জাপানি পরম্পরার
প্রাচ্যদেশীয় প্রবণতা। তাঁর তুলিতে ভারতের নিসর্গ, বিশেষ করে বাংলার সবুজ জলজ প্রকৃতি
যেভাবে রূপলাভ করেছে তার তুলনা আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলায় বিরল। মেজাজে রোমান্টিক
ও অনুভাবনায় কবি গোপাল ঘোষ তাঁর ছবির মধ্য দিয়ে চিত্র-রসিকদের প্রকৃতিকে, তার
বনস্পতি আর প্রাণীজগৎকে ভালোবাসতে শেখান—যেমন বাংলা কবিতায় শেখান জীবনানন্দ
দাশ আর কথাসাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর হৃদয়ের আবেগ তাঁর নিসর্গে আর ফুলে
সঞ্চারিত হয়ে যেন এক শাশ্বত রূপ লাভ করেছে। তিনি আধুনিক বাংলার চিত্রকলার
দর্শক-সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে গেছেন, যেমন তাঁর আগে বাড়িয়েছিলেন যামিনী রায়।

রথীন মৈত্র বা গোপাল ঘোষ আধুনিক চিত্রভাষা আয়ত্ত করবার জন্যে ইয়োরোপে যাননি,
প্রাণকৃষ্ণ পালও তাই। কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ তাঁর নিজস্ব চিত্র-বাক্‌রীতি গড়ে তুলতে স্বচ্ছন্দভাবেই
পশ্চিমের আধুনিক চিত্রকলার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইন্ডিয়ান
সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এ তিনি প্রাচ্যরীতির সুষমা ও পরিশীলন আত্মস্থ করেছিলেন।
তাই তিনি যখন ক্যালকাটা গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হলেন তখন তাঁর নতুন রীতির কাজেও এই
পরিশীলন লক্ষিত হল। সে কারণে গ্রুপের প্রথম সম্মিলিত প্রদর্শনীতেই তাঁকে দলের সবথেকে
পরিণত শিল্পী হিসাবে চিহ্নিত করেন কোনো কোনো চিত্র-সমালোচক, এবং তা নিতান্তই
অকারণে নয়। মন্বন্তরের পরিবেশে দু-একটি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষ নিয়ে ছবি আঁকলেও
প্রাণকৃষ্ণের ঝোঁক দেখা গেল আঙ্গিক বা রূপগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে। শিল্পীজীবনের সূচনা
থেকেই তিনি ছিলেন চিত্রপটে বিষয়কে সহজ সংস্থাপনায় তুলে ধরার পক্ষপাতী। কম্পোজিশনে ৮২
জটিলতাকে পরিহার করে, বহু কিছুর বদলে প্রধান কিছুকে অবলম্বন করেই রূপরচনা করেছেন
তিনি। তাঁর 'পরিবার', 'নৃত্যরতা', 'মা ও ছেলে' ছবিগুলিতে এই চরিত্রলক্ষণ স্পষ্ট। একদিকে
যেমন 'পরিবার' ছবির মুখগুলোতে মদিগলিয়ানির রূপভাবনার পরিচয় মেলে, অন্যদিকে তেমনই
'নৃত্যরতা' ছবিতে দেখা যায় বাংলার মাটির পুতুলের গড়নের প্রভাব। কিন্তু চিত্রবিন্যাসে কিংবা



৭৯ নৌকা, গোপাল ঘোষ, আঃ ১৯৫৩ খ্রি।

তার বর্ণ প্রয়োগে প্রাণকৃষ্ণের আধুনিক মননশীলতা দুটিতেই সমানভাবে সৃজনশীল হয়ে উঠেছে। প্রাণকৃষ্ণের চরিত্রে আবেগ ছিল সুসংযত, ছবিতেও তাই। তাঁর 'চুম্বন' ছবিটির উপস্থাপনায়, রূপ ও রঙেব সরল আর সুসমঞ্জস ব্যবহারে শিল্পীর এই মানাসিকতাই প্রকাশ পেয়েছে এক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিবেশেও। রূপভাবনায় তিনি হয়ত পিকাসোর কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন, কিন্তু নান্দনিক চরিত্রের বিচারে তাঁর ছবির নির্দেশ মাতিসের দিকেই।

একদা ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এ ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে নব্য-বঙ্গীয় শৈলীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত নীরদ মজুমদার ক্যালকাটা গ্রুপের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ফরাসি চিত্রকলার প্রতি অশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে বিষ্ণু দে প্রমুখের সান্নিধ্যে তিনি ফরাসি দেশের আধুনিক কলা আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হন এবং ১৯৪৬-এ একটি বৃত্তি পেয়ে দু-বছরের জন্যে প্যারিসে গিয়ে দীর্ঘ বারো বছর সে দেশে কাটিয়ে আসেন। এই বারো বছব কাল তিনি ফরাসি আধুনিক চিত্রকলার পাঠ নেন গভীর অভিনিবেশে। ফলে তাঁর ছবির চরিত্র সম্পূর্ণ বদলে যায়—রং, রেখা ও রূপবিন্যাসে তাঁর ছবি ভারতীয়ত্ব হারিয়ে ফরাসি চরিত্র নেয়। ফ্রান্স তাঁকে রূপ ও লাস্যে মোহিত করেছিল, তিনি ফরাসি-দুহিতা বিবাহ করে সেখানেই ঘর বেঁধেছিলেন। শিল্পী হিসাবে তিনি বিশেষভাবে সেজানের রচনারীতি অনুধাবন করেন, সেইসঙ্গে ব্রাক ও ব্রাকুসির মতো শিল্পীদের সান্নিধ্যে নিজেকে সমৃদ্ধও করে নেন।

নীরদের প্রকৃতি ছিল অস্থির। কোনো কিছুতেই তৃপ্ত হওয়া ছিল তাঁর চরিত্রবিরোধী। তাই আঙ্গিকগত পারদর্শিতা কিংবা আধুনিক চিত্রকলার সাম্প্রতিকতম অভিব্যক্তিব সঙ্গে পরিচয়—কোনো কিছুতেই তিনি থিতু হয়ে ছবি করতে পারলেন না। বরং বারো বছর পর ১৯৫৮-তে দেশে ফিরে শুরু করলেন নতুন অন্বেষা—ছবির বিষয় হিসাবে তিনি বেছে নিলেন পুরাণকথা ও তান্ত্রিক দেবীর ধ্যানসমূহ। একে একে আঁকলেন কয়েকটি চিত্রমালা—লখীন্দর-বেহুলার কাহিনীতে শুরু করে তিনি পৌঁছে গেলেন তান্ত্রিক ষোড়শী কলায়। একদিন যে শিল্পী নব্য-বঙ্গীয় চিত্রশৈলীর অতীতচারিতা আর পুরাণ-আশ্রয়বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তিনিই তাঁর পরিণত বয়সে দীর্ঘদিন আধুনিক কলাচর্চার কেন্দ্র প্যারিসে কাটিয়ে এসে তন্ত্রমন্ত্রে নিমগ্ন হলেন। তিনি তান্ত্রিক দেবীকে আঁকলেন শ্বেতাঙ্গ স্ত্রীকে মডেল করে। হালকা হলুদ আর ছাই রঙের বর্ণে ফরাসি মেজাজে রচিত হলেন তাঁর আরাধ্য প্রতিমা। কিন্তু না বর্ণে না রূপে সে প্রতিমা তান্ত্রিক ধ্যান বর্ণিত লক্ষণে চিহ্নিত হল, ফলে তাঁর দেবী সর্বজনীন প্রতিমার স্বীকৃতি লাভে সফল হল না। এইভাবেই বাংলার আধুনিক চিত্রকলার এক শক্তিশালী শিল্পী আত্মিক অস্থিরতায় নিঃশেষ করলেন নিজের প্রতিভা।

নীরদ মজুমদারের মতো পরিতোষ সেনও আধুনিক চিত্রকলার শিক্ষা নিতে প্যারিসে গিয়েছিলেন তিন বছর পর ১৯৪৯-এ। সেখানে অকাদেমি গ্রাঁ সমিয়ের-এ, আন্দ্রে লোৎ-এর স্টুডিয়োতে ও ইকোল দ্য বোজার্ড-এ তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেন। পরিতোষ প্রথম থেকেই একজন মননশীল শিল্পী। তিনি সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলভুক্ত না হয়েও, দেশে ও বিদেশে সবসময়েই শ্রমজীবী মানুষের কাছাকাছি থেকেছেন—তাদের জীবন নিয়ে ছবি এঁকেছেন। সমাজের অবিচার আর ব্যভিচারের দিকগুলিকে তিনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন—কখনও ব্যঙ্গে কখনও কটাক্ষে। সমাজমনস্ক হলেও তিনি কোনোদিনই আবেগতাড়িত হননি, তাঁর ছবিও কোনো সময়েই কাঠামোগত দুর্বলতার শিকার হয়নি। বস্তুসংস্থাপনায় তিনি স্থপতিসুলভ শৃঙ্খলার পক্ষপাতী, রং ও রেখার ব্যবহারে তাঁর সতর্কতা প্রথম থেকেই লক্ষণীয়। ক্যালকাটা গ্রুপের প্রতিষ্ঠাকালে ছিল তাঁর রঙের প্রতি প্রবণতা, সম্ভবত ফরাসি শিল্পীদের, বিশেষ করে, মাতিসের অনুপ্রেরণায়। কিন্তু ফ্রান্সে যাবার পর তিনি ঝুঁকলেন কিউবিজমের দিকে—তাঁর ছবি রংকে সংযত করল রূপনির্মাণের কাঠামোগত শৃঙ্খলায়। দেশে ফিরে তিনি ভারতীয় চিত্রকলার



৮০ উমা, নীরদ মজুমদার, আঃ ১৯৬৫ খ্রি

গড়নের সঙ্গে মেলাতে চাইলেন কিউবিজমের শিক্ষাকে—সৃষ্টি করলেন নিজের এক বিশিষ্ট
বাক্‌রীতি। এই পর্যায়ে তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় ছবি হল 'তরমুজ রসিক' আর 'বাবু'। কিন্তু কিছু ৮১
দিনের মধ্যেই রঙের প্রতি প্রবণতা তাঁকে নিয়ে গেল নতুন এক অভিব্যক্তির দিকে—রূপকে
কেবলমাত্র আভাসিত করে, দর্শকের কল্পনাকে জাগিয়ে তুলতে চাইলেন তিনি, আর সেই সঙ্গে
চাইলেন রঙের উচ্ছ্বাসে তার ইন্দ্রিয়কে মোহিত করতে। এই ধারারই ছবি হল তাঁর 'বড়ে গোলাম
আলী'। এরপর পরিতোষ রঙের প্রাবল্যও কাটিয়ে উঠে চলে গেছেন গ্রামজীবনের বর্ণনাধর্মী
ছবির দিকে। বড় কথা হল, তিনি অনেক পথ অতিক্রম করেও শিল্পী হিসাবে আজও অতৃপ্ত ও
অন্বেষী। আর তাঁর জিজ্ঞাসাও কেবলমাত্র চিত্রপটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি তাই বলেন :
"কেবল ছবি এঁকেই এখন আমি আর তৃপ্ত নই। ব্যক্তিগত দার্শনিক প্রশ্ন—বিশ্ববীক্ষা,
জীবনযাপন, বিশ্বাস ও জ্ঞান সম্পর্কিত নানান প্রশ্ন আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ"[১২৩]।

রথীন মৈত্র, গোপাল ঘোষ, প্রাণকৃষ্ণ পাল, নীরদ মজুমদার ও পরিতোষ সেন—ক্যালকাটা
গ্রুপের এই পাঁচজন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন অবশ্যই গ্রুপের প্রধান চিত্রকর। এঁদের
পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ধ্যান-ধারণা পঞ্চাশের দশকের বাংলার চিত্রকলার সম্ভবত সবথেকে অগ্রগামী
নিদর্শনের ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু এঁরা ছাড়াও অপর যে তিনজন শিল্পী গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে
তার আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করেন তাঁরা হলেন সুনীলমাধব সেন, রথীন মিত্র ও হেমন্ত মিশ্র।
সুনীলমাধব ছিলেন পেশায় আইনজীবী কিন্তু ছবি আঁকার নেশাই তাঁর মনপ্রাণ কেড়ে নিয়েছিল।
একজন মৌলিক জিজ্ঞাসু শিল্পী হিসাবে তিনি যেমন হেমেন মজুমদার ও অতুল বসুর কাছ থেকে
অ্যাকাডেমিক রীতির তেলরঙের কাজ সম্পর্কে জেনেছেন, তেমনই আগ্রহের সঙ্গে যামিনী
রায়ের কাছ থেকে শুনেছেন ছবির মর্মকথা। তিনি যে সময় একজন শিল্পী হিসাবে পথ
হাতড়াচ্ছেন, সেই সময়েই, ১৯৪৯-এ, তাঁর যোগাযোগ ক্যালকাটা গ্রুপের সঙ্গে। তখন থেকে
সুনীলমাধবের আধুনিকপন্থী সৃজনশীল শিল্পী হিসাবে আত্মপ্রকাশ। ইয়োরোপীয় চিত্রকলার ৮২
আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে দেশজ লোকশিল্পের রূপবোধকে মিলিয়ে তিনি এমন কিছু ছবি
করলেন, যার সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক অন্য কোনো শিল্পীর কাজের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।
তাঁর বিষয় তিনি যেমন গ্রহণ করেছেন আশপাশের বাস্তব জগৎ থেকে, তেমনই লোককথা আর
রূপকথার জগৎ থেকেও। রেখায় তাঁর জোর ছিল, আবার রঙের প্রত্যয়ী প্রয়োগেও তাঁর কুণ্ঠা
ছিল না। ফলে তাঁর ছবির আবেদন হয়ে উঠেছে প্রবল। বস্তু-সংস্থাপনের সারল্যে তাঁর 'হাতির
পিঠে যাত্রী' ছবিটি যেমন লোকশিল্পের সমগোত্রীয়, তেমনই অন্যদিকে তাঁর 'মেঘলোক'
ছবিটিতে ভারতীয় রূপবোধের সঙ্গে ইয়োরোপীয় সুররিয়ালিস্ট চিত্রধারার সম্পর্ক সুস্পষ্ট। তাঁর
সাফল্য দেশ ও বিদেশের চিত্র-অভিজ্ঞতাকে অনায়াসে সমন্বিত করায়। কিন্তু তাঁর অস্থির
মানসিকতা আর স্বশিক্ষিত চিত্রবিদ্যা নিজস্ব এক বাক্‌রীতি গড়ে তোলার পক্ষে অনুকূল ছিল না।
সে কারণে তাঁর ছবিতে যেমন বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে, তেমনই সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁর স্বকীয়
চিত্ররীতি বা শৈলীকে খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়ে উঠেছে।

ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন রথীন মিত্র। তাঁর চিত্রশিক্ষা কলকাতার
সরকারি আর্ট স্কুলে এবং কর্মসূত্রে তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন দীর্ঘকাল
ধরে। তাঁর ছবির বিষয়ও তিনি আহরণ করেছেন তাঁর এই চলমান জীবনে দেখা শহর-গ্রাম,
পাহাড়-বন, বাজার-হাট, গলিঘুঁচি থেকে। মানুষের জীবনধারার প্রতি আগ্রহও তাঁর প্রবল।
প্রকৃতপক্ষে, তিনি দু-চোখ ভরে যা দেখেছেন তা তাঁর দক্ষ হাতে এঁকেছেন, বিশেষ করে তাঁর
রেখাবন্ধন যেমন শক্তিশালী তেমনই অবিচল। তাই ছাত্রজীবন থেকেই দৃঢ় কাঠামোর নিসর্গ ও
মানুষের কর্মজীবনের ছবি এঁকেছেন তিনি। তাঁর 'শিলং বাজার' ছবিটি সেজান-ধর্মী
কাঠামো-মাত্রিকতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। রথীন আজও এক সদা-ভ্রাম্যমাণ শিল্পী। এখন তিনি



৮১ হংসপাতি, পরিতোষ সেন, ১৯৪০ খ্রি



৮২ সাপুড়ে, প্রাণকৃষ্ণ পাল, আঃ ১৯৬০ খ্রি

ব্যস্ত রয়েছেন কলকাতা শহরের পুরনো স্থাপত্যকর্মগুলিকে রেখায় ধরে রাখতে। তুলনায় হেমন্ত মিশ্রের ছবির জগৎ ভিন্ন। তিনিও একজন স্বশিক্ষিত শিল্পী, চিত্রবিদ্যার চর্চা তাঁর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিলিটারির স্টাফ আর্টিস্ট হিসাবে প্রচারমূলক ছবি আঁকায়। সেই শিক্ষাকে তিনি পরিশীলিত করেছিলেন পত্র-বিনিময়ে ইংরেজ শিল্পী জন হ্যাসেল-এর কাছ থেকে অ্যাকাডেমিক রীতিতে পাঠ নিয়ে। প্রথম দিকে তিনি আঁকতেন রঙিন নিসর্গচিত্র আর তার পটভূমিতে শ্রমিক-মজুরদের আনাগোনা, তাদের কর্মধারাকে। পরে, ক্যালকাটা গ্রুপের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার পর, তাঁর ছবি মননশীল হয়ে ওঠে—তিনি কিউবিজমের দিকে আকৃষ্ট হন, তারপর চলে আসেন সুররিয়্যালিস্টদের দিকে। 'কল্পরূপ'-এর মতো ছবিতে তাঁর এই ধারার কাজের পরিচয় মেলে। তবে কিউবিস্ট ও সুররিয়্যালিস্ট চিত্রবোধের সঙ্গে ভারতীয় রূপধারাকে সমন্বিত করে আঁকা তাঁর 'চতুরঙ্গ'-এর মতো কাজগুলি সম্ভবত অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ।



৮৩ মুখ, সুনীলমাধব সেন, আঃ ১৯৬০ খ্রি

৪০ উপসংহার

ক্যালকাটা গ্রুপ কোনো একটি বিশেষ শিল্পতত্ত্বকে সামনে রেখে দানা বাঁধেনি। তাই গ্রুপের সদস্যারা যখন গোষ্ঠীবদ্ধ ছিলেন, কিংবা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, কোনো সময়েই তাঁদের কাজেব মধ্য দিয়ে এমন কোনো এক বিশেষ তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হননি। প্রথম থেকেই তাঁদের ছিল বরং একটি অভিপ্রায়। সে অভিপ্রায় হল আধুনিকতাব শর্তে শিল্পরচনা। শিল্পেব আধুনিকতা তার অনেকগুলি উপাদান ও অনুষঙ্গেব সহযোগে সার্থকতা লাভ করে। আর উপাদান ও অনুষঙ্গগুলিকে আধুনিক শিল্পী অর্জন করেন নিববচ্ছিন্ন পবীক্ষা-নিরীক্ষাব মধ্য দিয়ে।

অনেক উপাদান আর অনুষঙ্গের ভেতর থেকে আধুনিক চিত্রকলার দুটি মূল চরিত্রলক্ষণকে সম্ভবত চিহ্নিত কবা যায়। প্রথম হল আধুনিক কলাশিল্পের পীঠস্থান ইয়োরোপে ইটালির রেনেসাঁস প্রবর্তিত বাস্তবধর্মী চিত্রকলার যে অপ্রতিহত প্রভুত্ব, তাব শিল্পগত অকাট্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা। প্রচলিত বাস্তবধর্মিতার শর্তে বস্তুজগৎকে চিত্রপটে প্রতিফলিত না কবে, শিল্পীর ব্যক্তিগত অভীপ্সায় নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্র-উপাদান গ্রহণ করে চিত্রপটকে রূপসমৃদ্ধ করে তোলার প্রয়াসই হল আধুনিকতার দিক থেকে প্রথম পদক্ষেপ। দ্বিতীয়ত, আধুনিকপন্থীরা চাইলেন দেশকালনির্ভর বিশেষ একটি শিল্পরীতি থেকে চিত্রকলাকে মুক্ত করে শিল্পীর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের পথে নতুন নতুন বাক্‌রীতিতে চিত্রমাধ্যমকে সম্প্রসারিত করে তুলতে। আর এই প্রয়াসে তাঁরা ঐতিহ্য হিসাবে কেবলমাত্র নিজের দেশ ও কালের স্বীকৃত চিত্ররীতিকে গ্রহণ না করে পৃথিবীর সকল দেশের সকল কালেব চিত্রকলার যে বিপুল ও বিচিত্র সম্ভার তার সব, কিছুকেই সেই ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করলেন। এইভাবেই তাঁরা চিত্রকলার আধুনিক চর্চাকে জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতাব গণ্ডি থেকে মুক্ত করতে চাইলেন।

লক্ষণীয় এই যে ক্যালকাটা গ্রুপ ও তার সমসাময়িক আরও কয়েকজন বাঙালি শিল্পী নিজের নিজের কাজের মধ্য দিয়ে পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে এই দুটি শর্তকেই প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁরা চেয়েছেন বাংলার চিত্রকলাকে প্রাচ্যকলাশিল্পের আদর্শে লালিত নব্য-বঙ্গীয় রীতির সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে আন্তর্জাতিক চিত্রকলার যে আধুনিকতার আন্দোলন তার সঙ্গে যুক্ত করতে। তাঁদের এই প্রয়াস কী কালের বিচারে ও শিল্পগুণের বিচারে সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা তাঁবা বাংলার চিত্রকলাকে নব্য-বঙ্গীয় রীতির ধারা থেকে অনেকখানি মুক্ত করে সাম্প্রতিক চিত্রকলার জগতে পৌঁছে দিয়েছেন। 'সাম্প্রতিক' শিল্পান্দোলন আমাদের সমকালীন, তার জগৎ, তার লক্ষ্য, তাব অন্বেষা ভিন্নতর। আর তার সাফল্যের বিচার করার সময় এখনও আসেনি। তাই বাংলার চিত্রকলাব ক্রমবিবর্তনের এই ঐতিহাসিক পরিক্রমা সমকালের এই আন্দোলনের অগ্রগতি কামনা করে শেষ করাই হবে সংগত।

সূত্রনির্দেশ ও টীকা

১. দ্র. দিব্যাবদান, পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, মিথিলা বিদ্যাপীঠ, দ্বারভাঙ্গা, ১৯৫১, পৃ ২৭৭।

২. ***A Record of Buddhist Kingdoms*** (Being an Account of the Chinese monk Fa-hien), tr. by James Legge, New York, 1965, p 100

৩. দ্র. ***An Excavation of Pandu Rajar Dhibi*** by P C Dasgupta, A Bulletin of the Directorate of Archaeology, West Bengal, No 2, Calcutta, 1964, pp 28-29

৪. দ্র. ***Taranath's History of Buddhism in India,*** ed by Debiprasad Chattopadhyaya, Calcutta, 1980. p. 348

৫. দ্র. Stella Kramrisch, "Nepalese Paintings", ***Journal of the Indian Society of Oriental Art,*** Vol. I, 1933, pp. 129-47.

৬. সরসীকুমার সরস্বতী, **পালযুগের চিত্রকলা**, কলিকাতা, ১৯৭৮।

৭. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্র. ওই, পৃ ৯০-১১৮।

৮. ওই, পৃ ১২৪।

৯. পূর্বোল্লিখিত ***Taranath's History of Buddhism in India,*** p 348

১০. নীহাররঞ্জন রায়, **বাঙালীর ইতিহাস**, আদি পর্ব, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮০. পৃ ৮০৬।

১১. ওই, পৃ ৮১২।

১২. পূর্বোল্লিখিত **পালযুগের চিত্রকলা**, পৃ ৬৩।

১৩. Coomarswamy, Ananda K., ***Portfolio of Indian Art,*** Boston, 1923

১৪. দ্র. Frederich M Asher, "Stone Engravings at Bodhgaya," ***Nalinikanta Satavarshiki,*** ed by Debala Mitra and Gauriswar Bhattacharya, Delhi, 1989, p. 24

১৫. দ্র. পূর্বোল্লিখিত **পালযুগের চিত্রকলা**, পৃ. ৫২-৫৩, Pratapaditya Pal, "Evidence of Buddhist Painting in Eastern India", **Journal of the Asiatic Society**, Vol. XVIII, No 4, 1966, pp. 260-70.

১৬. দ্র. Birendra Nath, ***Nalanda Murals,*** New Delhi, 1983, pp. XIII-XXIV, pls. III-VII

১৭. দ্র. M.R. Tarafdar, ***Husain Shahi Bengal,*** Dacca, 1965, p 284

১৮. দ্র. Robert Skelton, "The Iskinder Nama of Nusrat Shah", ***Indian Painting,*** P. & D. Colnaghi & Co., London, 1978 ; ***Arts of Bengal*** (The Heritage of Bangladesh and Eastern India), Whitechapel Art Gallery, London, 1979, p 34

১৯. বংশীবদন রচিত "শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত" গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন কাননবিহারী গোস্বামী তাঁর অবন্তীকুমার সান্যাল ও অশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত **চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান** গ্রন্থে প্রকাশিতব্য নিবন্ধে।

২০. দ্র. D.P. Ghosh, ***Medieval Indian Painting,*** Delhi, 1985, pp. 29-30 ; pl. 58

২১. দ্র. Robert Skelton, "Murshidabad Painting", ***Marg,*** Vol. X No 1, December 1956, p.10, pl.on p. 11.

২২. ওই, "Moonlit Landscape", p. 19.

২৩. Archer, Mildred, ***Company Drawings*** (In the India Office Library), London, 1972, p. 61.

২৪. ওই, p. 62.

২৫. ওই, p. 72

২৬. দ্র., কমল সরকার, "অর্ধশতবর্ষে একাডেমি অব ফাইন আর্টস", **দেশ**, ৪ঠা জুন, ১৯৮৩, ৫০ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা।

২৭. দ্র. Joshua Reynolds, ***Discourses on Art,*** New York, 1961, *Introduction* by Robert Lavine, p. VII.

২৮. দ্র. Mildred Archer and W. G. Archer, ***Indian Painting For the British*** (1770-1880) London, 1955, p. 10.

২৯. দীনেশচন্দ্র সেন, **বৃহৎ বঙ্গ** (১ম ও ২য় খণ্ড), কলিকাতা, ১৩৪২।

৩০. ওই, ২য় খণ্ড, পৃ ৬৯১ (ক)।

৩১. দ্র. S.K. Saraswati, "An Illustrated Bengali Mss. *of The Bhagvata Purana,"* ***Journal of the Asiatic Society,*** Vol. XV, Nos 1-4. 1974, p. 142.

৩২. "Indigenous Tradition of Painting in Bengal (13th-18th Century)", ***Indian Museum Bulletin,*** Vols XXIII & XXIV, 1988-89, p 19
৩৩. Goswami, Niranjan, ***Catalogue of Paintings of the Asutosh Museum Ms. of The Ramacharitamanasa,*** Calcutta, 1981
৩৪ দ্র. Stella Kramrisch, "An Illustrated Gitagovinda Ms," ***Journal of the Indian Society of Oriental Art,*** Vol II, No 2, 1934
৩৫. দ্র. অশোক ভট্টাচার্য, "মুর্শিদাবাদের চার বাংলা", **অমৃত,** ২৬শে পৌষ, ১৩৬৯।
৩৬ গুরুসদয় দত্ত, **পটুয়া-সঙ্গীত,** কলিকাতা, ১৯৩৯।
৩৭. Misra, R N , ***Ancient Artists and Art-Activities,*** Simla, 1975, p 5
৩৮. Ghose, Benoy ***Traditional Arts and Crafts of West Bengal,*** Calcutta, 1981, pp 75-76
৩৯. দেবাশিস বন্দোপাধ্যায়, **বীরভূমের যম-পট ও পটুয়া,** কলকাতা, ১৯৭২, পৃ ৭।
৪০ Ghosh, Benoy, উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৮২।
৪১. দ্র. Gurusaday Dutt, ***Folk Arts and Crafts of Bengal : The Collectd Papers,*** Calcutta, 1990, p 80 উদ্ধৃত নিবন্ধটি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।
৪২ দেবাশিস বন্দোপাধ্যায়, উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৮ ১০।
৪৩. শ্যামসুন্দর চিত্রকরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে লেখক এ সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন।
৪৪ দ্র. Gurusaday Dutt, উপরোক্ত গ্রন্থ, pp 72-73
৪৫. "The Art and Industries of Bengal", ***Journal of Indian Art,*** 1886
৪৬. De, Mukul, "Drawings and Paintings of Kalighat", ***Advance,*** Calcutta, 1932, (W G Archer কর্তৃক তাঁর ***Kalighat Paintings,*** London, 1971, গ্রন্থে pp 31-32-তে উদ্ধৃত)।
৪৭ দ্র. D P Ghosh, ***Folk Art of Bengal,*** Santiniketan, 1977, p 7
৪৮. দ্র. Benoy Ghosh , পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ Bholanath Bhattacharya "The Evolution of Kalighat Style and Occupational Mobility of the Patuas,' ***The Patas and the Potuas of Bengal,*** ed by S Sengupta, Calcutta 1973, pp 77-84 , Prodvot Ghosh, ***Kalighat Pats : Annals and Appraisal,*** Calcutta, 1973
৪৯. Archer, W G , ***Kalighat Paintings,*** pp 8-9
৫০. দ্র. প্রদ্যোৎ গুহ, **কোম্পানি আমলে বিদেশী চিত্রকর,** কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ ১২-১৩।
৫১ শিবনাথ শাস্ত্রী, **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,** কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ ১৪৭।
৫২. শিল্পপুষ্পাঞ্জলি, ১ম বর্ষ, ১২৯২ সন, শোভন সোম লিখিত নিবন্ধ "ঔপনিবেশিক ভাবতে শিল্পশিক্ষা ১৮৩৯ ১৯৪৭" (**শারদীয় অনুষ্টুপ,** ১৯৮৬, পৃ ৪৭) থেকে উদ্ধৃত।
৫৩. ***Centenary : Government College of Art and Craft,*** Calcutta, 1966, p 6 থেকে উদ্ধৃত ও লেখক কর্তৃক অনূদিত।
৫৪. ওই।
৫৫. ওই, p 12
৫৬. ওই, p 8
৫৭. শোভন সোম লিখিত উপরোক্ত নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত, পৃ ৬৪।
৫৮. কমল সরকার লিখিত **শিল্পীসপ্তক,** কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ ৩৭ থেকে উদ্ধৃত।
৫৯ দ্র. কমল সরকার, **ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী,** কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ ৮৮।
৬০. উপরোক্ত ***Centenary : Government College of Art and Craft,*** p 18
৬১. ওই, p 22
৬২. শোভন সোম লিখিত পূর্বোক্ত নিবন্ধ "ঔপনিবেশিক ভাবতে শিল্পশিক্ষা ১৮৩৯-১৯৪৭", পৃ ৭৫।
৬৩. এই পর্বের বিস্তৃত বিবরণ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থে দিয়েছেন।
৬৪. Havell, E.B , "Some Notes on Indian Pictorial Art", ***The Studio,*** 1902
৬৫ দ্র. শোভন সোম ও অনিল আচার্য সম্পাদিত, **বাংলা শিল্প-সমালোচনার ধারা** কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ ৬১-৬২।
৬৬. দ্র. W G Archer, ***India and Modern Art,*** London, 1959, p.29
৬৭. দ্র. নন্দলাল বসুর ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮-এ শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত বক্তৃতা (**দেশ,** ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৫১, পৃ ৪

৬৮. দ্র. Asit Kumar Haldar, ***Our Heritage in Art,*** Lucknow, 1952, p (ii)
৬৯. দ্র. ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, **চিত্রে গীতগোবিন্দ,** এলাহাবাদ, ১৯৬২, লেখকের 'নিজের কথা' অংশ।
৭০. দ্র. অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, **ভারতের শিল্প ও আমার কথা,** কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ ১৮১।
৭১. দ্র. অসিতকুমার হালদার, **বাগগুহা ও রামগড়,** এলাহাবাদ, ১৩৭৫, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত ভূমিকা, শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ধারাবাহিক প্রবন্ধ "নিবেদিতা ও ভারতের শিল্প-আন্দোলন", **দেশ,** ২৬ মে, ১৯৯০, পৃ ৬০।
৭২. ভগিনী নিবেদিতা রচিত নিবন্ধ "The Function of Art in Shaping Nationality", ***The Complete Works of Sister Nivedita,*** Vol III, Calcutta, 1967, p 4। অনুবাদ লেখক কৃত।
৭৩. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ভারতীয় চিত্রকলা প্রচারে রামানন্দ", **প্রবাসী,** পৌষ, ১৩৫০, পৃ ২৬১।
৭৪. বীরবল, "বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ", **ভারতী,** আশ্বিন ১৩২০।
৭৫. Abanindranath Tagore, "Three Forms of Art" (শিল্পের ত্রিধারা), ***Modern Review,*** January, 1907 প্রবন্ধের শঙ্করীপ্রসাদ বসু কর্তৃক অনূদিত উদ্ধৃতি (দ্র. **দেশ**,৭ এপ্রিল ১৯৯০, পৃঃ ৫৮)।
৭৬. Upendrakishore Roy Chowdhury, "The Study of Pictorial Art", ***Modern Review,*** June, 1907 প্রবন্ধের শঙ্করীপ্রসাদ বসু কর্তৃক অনূদিত উদ্ধৃতি (দ্র. **দেশ**,১৪ এপ্রিল ১৯৯০, পৃঃ ৫৯)।
৭৭. ওই।
৭৮. O C. Gangoly, "The Study of Indian Pictorial Art A Rejoinder", ***Modern Review,*** September, 1907
৭৯. ওই।
৮০. সুকুমার রায়, "ভারতীয় চিত্রশিল্পী", **প্রবাসী,** শ্রাবণ, ১৩১৭ (শোভন সোম ও অনিল আচার্য সম্পাদিত পূর্বোক্ত **বাংলা শিল্প-সমালোচনার ধারা,** পৃ ৮৬-৮৭)।
৮১. ওই (শোভন সোম ও অনিল আচার্য সম্পাদিত গ্রন্থের পৃ ৮৭)।
৮২. শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, "ভারতীয় চিত্রবিদ্যা", **ধর্ম,** ১৩১৬।
৮৩. C F Andrews, "National Literature and Art", ***Modern Review,*** November 1908 (শঙ্করীপ্রসাদ বসু কৃত অনুবাদ দ্র. **দেশ,** ২১ এপ্রিল ১৯৯০ পৃ ৪৫)।
৮৪. দ্র. অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, **ভারতের শিল্প ও আমার কথা,** পৃ ২৮০। বিদেশে নব্য-ভারতীয় বা নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার প্রচার এই গ্রন্থের ২৭৫ থেকে ২৯৫ পৃষ্ঠায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।
৮৫. দ্র **দেশ,** ১৫ ডিসেম্বর ১৯৫১, পৃ ৪১৯।
৮৬ Rabindranath Tagore, ***The Meaning of Art,*** Lalit Kala Akademi, New Delhi, n.d. 17 (প্রবন্ধটি ***Viswa-Bharati Quarterly*** পত্রিকায় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়)।
৮৭. দ্র. অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ২৮৭ ও ২৯১।
৮৮. দ্র. Benoy Kumar Sarkar, "The Aesthetics of Young India", **Rupam,** No 9, January, 1922
৮৯. দ্র. O.C. Gangoly, "The Aesthetics of Young India A Rejoinder", ওই।
৯০ শোভন সোম, পূর্বোল্লিখিত নিবন্ধ "ঔপনিবেশিক ভারতে শিল্প-শিক্ষা : ১৮৩৯-১৯৪৭", পৃ ৭৬।
৯১. দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, **প্রাচীন সাহিত্য।**
৯২. দ্র. Ratan Parimoo, ***The Paintings of Three Tagores,*** Baroda, 197?, p 101 ; এবং অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের পূর্বোল্লিখিত **ভারতের শিল্প ও আমার কথা,** পৃ ৩০৫।
৯৩. Ratan Parimoo কৃত উপরোক্ত গ্রন্থ, p 100
৯৪. Austine Quotes থেকে **Catalogue of the Exhibition of Jamini Roy's Paintings 18 Ballygange Place,** (Calcutta, January 25-February 3, 1975)-এ উদ্ধৃত।
৯৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র, ১১শ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃ ১২৮।
৯৬. দ্র. ***The Art of Jamini Roy : A Centenary Volume,*** Calcutta, 1987, p 59
৯৭. ওই।
৯৮. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, "অবনীন্দ্রনাথের ছবি", **বিশ্বভারতী পত্রিকা,** কার্তিক-চৈত্র, ১৩৮৩, পৃ ১৯৭।
৯৯. ওই, পৃ ১৯৭-৯৮।
১০০. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, **চিত্রকথা,** কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ ১৫৭।
১০১ ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মণ, "ভারতীয় কলাশিক্ষায় কলাভবন", **দেশ,** বিনোদন সংখ্যা, ১৯৮৪, পৃ ৪৬।
১০২. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, **চিত্রকথা,** পৃ ১৫৮-৫৯।

১০৩. ওই, পৃ ১৬৯।

১০৪. দ্র. Kanchan Chakravorti, "Thr Print-Makers' Art and the Bengal School · An Appraisal", ***The Visva-Bharati Quarterly,*** Vol. 46, No. 1-4, May 1980 - April 1981, p. 235

১০৫. দ্র. ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মণ, "শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়", ***Visva-Bharati News,*** March April, 1981, p 270

১০৬. প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, "নন্দলাল কারুসঙ্ঘ ও জাতীয় আন্দোলন", **দেশ,** বিনোদন (নন্দলাল জন্মশতবার্ষিকী) সংখ্যা, ১৩৮৯, পৃ ৪৩।

১০৭. দ্র. দিনকব কৌশিক, "কিঙ্করদা ও বিমূর্ত শিল্প", **দেশ,** ৩ জানুয়ারি, ১৯৮৭, পৃ ৭১।

১০৮. দ্র. Kumarsinha, "Modern Movement of Indian Art", ***Four Arts Annual,*** 1935 (Calcutta), p 67.

১০৯. দ্র. পূর্বোল্লিখিত ***Centenary : Government College of Art and Craft,*** p 48

১১০. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত নিবন্ধ "অবনীন্দ্রনাথেব ছবি", পৃ ২৯৭।

১১১. Muhammad Sirajul Islam (ed), ***Zainul Abedin*** (Art of Bangladesh Series), Dacca, 1977, *Introduction*, অনুবাদ লেখকেব।

১১২. ওই।

১১৩. দ্র. চিত্তপ্রসাদ, "আধুনিক চিত্রকলার ভূমিকা", **অরণি,** ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৯।

১১৪. প্রদোষ দাশগুপ্ত, **স্মৃতিকথা শিল্পকথা** (ক্যালকাটা গ্রুপ), কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ ৪৬।

১১৫. **The Calcutta Group** (Brochure of the Group's Exhibition at Delhi in 1953)-এব ভূমিকা থেকে লেখক কর্তৃক অনূদিত।

১১৬. দ্র. শোভন সোম "ক্যালকাটা গ্রুপ (১৯৪৩-১৯৫৩) · উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা ও পবিণাম", **শারদীয় অনুষ্টুপ,** ১৩৯০, পৃ ১০৫-০৬।

১১৭. ওই, পৃ ১০৬ (ভাষা সামান্য পরিবর্তিত)।

১১৮. ওই, পৃ ১০১।

১১৯. Prodosh Dasgupta, "Calcutta Group . Its Aims and Achievement", **Lalit Kala Contemporary,** No. 31, (1981), অনুবাদ শোভন সোম কৃত (দ্র. উপরোক্ত নিবন্ধ, পৃ ১০১)।

১২০. দ্র. প্রদোষ দাশগুপ্ত, উপরোক্ত **স্মৃতিকথা শিল্পকথা,** পৃ ৫৫-৫৬।

১২১. ওই, পৃ ৫৬।

১২২. দ্র অতনু বসু, "বাংলা চিত্রকলার পালাবদল". **প্রতিক্ষণ,** ২ আগস্ট, ১৯৮৩, পৃ ৫০।

১২৩. Paritosh Sen, "My Painting", ***Lalit Kala Contemporary,*** No 9, p.23

চিত্রসূচি

রঙিন

একবর্ণ

১ কৃষ্ণবর্ণ মৃৎপাত্রে শ্বেতবর্ণে আঁকা মাছ ও জাল, পাণ্ডুরাজার ঢিবি (বর্ধমান),
আঃ ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, রাজা প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালা (বেহালা), কালকাতা।
২ কৃষ্ণবর্ণ মৃৎপাত্রে শ্বেতবর্ণে আঁকা-সর্পাহারী ময়ূর, পাণ্ডুরাজার ঢিবি (বর্ধমান),
আঃ ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, রাজা প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালা (বেহালা), কলকাতা।
৩ বুদ্ধের জন্ম, 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা' পুথি, নালন্দা, আঃ ৯৮৫ খ্রি,
এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা (পুথি নং জি ৪৭৮৩)।
৪ প্রজ্ঞাপারমিতা, 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' পুথি, নেপাল, ১০৭১ খ্রি,
এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, (পুথি নং এ ১৫)।
৫ মহাশ্রী তারা, 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা' পুথি, নেপাল, ১০৭১ খ্রি
এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, (পুথি নং এ-১৫)।
৬ বুদ্ধ পূজারিণী, বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দির চত্বরে অবস্থিত প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ চিত্র, আঃ চতুর্দশ শতাব্দ।
৭ ললিতাসন বিষ্ণু ও ভক্ত উপাসক, ডোম্মনপালদেবের তাম্রশাসন ফলকের বিপরীত দিকে উৎকীর্ণ চিত্র,
আঃ চতুর্দশ শতাব্দ। বাক্ষসখালি (২৪-পরগনা দক্ষিণ), ১১৯৬খ্রি আশুতোষ সংগ্রহশালা, কলকাতা।
৮ জাতক-দৃশ্য, 'কালচক্রতন্ত্র' পুথির আবরক পাটার ওপরে অঙ্কিত চিত্র, আরা (বিহার), খ্রি, ১৪৪৬,
কেমব্রিজ লাইব্রেরি, কেমব্রিজ।
৯ চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত এবং নৃত্য, পাটচিত্র, বাঁকুড়া, সপ্তদশ শতক,
ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, লন্ডন।
১০ কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা, পাটচিত্র, বাঁকুড়া, সপ্তদশ শতক, আশুতোষ সংগ্রহশালা কলকাতা।
১১ শিব পার্বতী, পাটচিত্র, মেদিনীপুর, অষ্টাদশ শতক, আশুতোষ সংগ্রহশালা, কলকাতা।
১২ বীর হাম্বির সমীপে শ্রীনিবাস আচার্য ও রানী সুদক্ষিণা, বাঁকুড়া, অষ্টাদশ শতক,
আশুতোষ সংগ্রহশালা, কলকাতা।
১৩ সপার্ষদ নবাব আলীবর্দি খাঁ, মুর্শিদাবাদ, আঃ ১৭৫০ ৫৫ খ্রি, ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, লন্ডন।
১৪ মধুমাধবী-রাগিণী, মুর্শিদাবাদ, আঃ ১৭৬০ খ্রি, ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, লন্ডন।
১৫ শিব পার্বতী, মুর্শিদাবাদ, আঃ ১৭৬৫ খ্রি, ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ম, লন্ডন।
১৬ শোভাযাত্রা, মুর্শিদাবাদ, আঃ ১৮০০ খ্রি, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, লন্ডন।
১৭ ধোবী, মুর্শিদাবাদ, আঃ ১৭৮৫ ৯০ খ্রি, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, লন্ডন।
১৮ ভাগীরথী থেকে পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম, টমাস ড্যানিয়েল, ('দি টুয়েলভ ভিউজ অব ক্যালকাটা'
থেকে গৃহীত), ১৭৮৭ খ্রি। সৌজন্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল কলকাতা।
১৯ কলকাতার ভাগীরথীতে ঝড় শিল্পী অজ্ঞাতনামা, আঃ ১৮০০ খ্রি।
২০ কর্নেল কারনাক (হাতির দাঁতের ওপর অঙ্কিত), ওজিয়াস হামফ্রি, আঃ ১৭৮৬ খ্রি,
অ্যালান ইভানস, ইংলন্ড, সংগ্রহ।
২১ স্পেনসারস হোটেল থেকে গভর্নমেন্ট হাউজ, চার্লস ডয়েলি, আঃ ১৮৪৫ খ্রি,
সৌজন্য ঃ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কলকাতা।
২২ সারস, শেখ জয়নুদ্দিন, কলকাতা, আঃ ১৭৮০-৮২ খ্রি, এসমোলিয়ান মিউজিয়ম, অক্সফোর্ড।
২৩ টিটাগড়ের কালী-মন্দির, কলকাতা, আঃ ১৭৯৮ ১৮০৪ খ্রি, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, লন্ডন।
২৪ অশোকবনে রামসীতার মিলন, 'রামচরিতমানস' পাণ্ডুলিপি-চিত্র মেদিনীপুর, ১৭৭২-৭৬ খ্রি,
আশুতোষ সংগ্রহশালা, কলকাতা।
২৫ রাম-রাবণের যুদ্ধ 'রামচরিতমানস' পাণ্ডুলিপি-চিত্র, মেদিনীপুর, ১৭৭২ ৭৬ খ্রি,
আশুতোষ সংগ্রহশালা, কলকাতা।
২৬ কৃষ্ণলীলা-চিত্র গীতগোবিন্দ' পুথিচিত্র, স্থান অজ্ঞাত, উনিশ শতকের সূচনাকাল,
চুঁচুড়ার মণ্ডল পরিবারের সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।
২৭ কৃষ্ণ ও গোপিনীবৃন্দ 'গীতগোবিন্দ' পুথিচিত্র, স্থান অজ্ঞাত, উনিশ শতকের সূচনাকাল,
চুঁচুড়ার মণ্ডল পরিবারের সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।
২৮ ষড়্ভুজ-চৈতন্যদেব, গঙ্গারাম ভাস্কর অঙ্কিত, উনিশ শতকের প্রথমার্ধ,
শ্যামসুন্দরজীর মন্দির, বহড়ু, ২৪-পরগণা দক্ষিণ।

২৯ পূজারিণী, গঙ্গারাম ভাস্কর অঙ্কিত, উনিশ শতকের প্রথমার্ধ, শ্যামসুন্দরজীর মন্দির, বহড়ু, ২৪ পরগণা দক্ষিণ।
৩০ কৃষ্ণলীলা পট, মেদিনীপুর, উনিশ শতকের শেষভাগ, আশুতোষ সংগ্রহশালা, কলকাতা।
৩১ কৃষ্ণ ও গোপিনীবৃন্দ, মেদিনীপুর, বিশ শতকের প্রথমার্ধ, বিনয় ঘোষ সংগ্রহ।
৩২ জনৈক পটুয়া বা বাজার চিত্রকর, ফ্রাঁসোয়া বেলথাজার সোলভিন্স, আঃ ১৭৯৫ খ্রি।
৩৩ কালী, কলকাতা, উনিশ শতকের মধ্যভাগ, আশুতোষ সংগ্রহশালা, কলকাতা।
৩৪ বারবিলাসিনী, কলকাতা, আঃ ১৮৯০ খ্রি, ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, লন্ডন।
৩৫ গলদা চিংড়ি মুখে বেড়াল, কলকাতা উনিশ শতকের মধ্যভাগ, আশুতোষ সংগ্রহশালা, কলকাতা।
৩৬ গোলাপ-সুন্দরী (কালীঘাট শৈলী অনুসরণে লিথোগ্রাফ), কলকাতা, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ, আশুতোষ সংগ্রহশালা, কলকাতা।
৩৭ একটি গোলাপ ও দুই নারী (কালীঘাট শৈলী অনুসরণে তেলরঙের ছবি) কলকাতা, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ, রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালা (বেহালা), কলকাতা।
৩৮ রাম সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমান, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ
রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালা ((বেহালা) কলকাতা।
৩৯ শিবের বিবাহ (লিথোগ্রাফ) কলকাতা, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ, আশুতোষ সংগ্রহশালা, কলকাতা।
৪০ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় আঃ ১৮৮২ খ্রি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
৪১ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শশীকুমার হেশ, ১৮৯৯ খ্রি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
৪২ অন্তিমশয্যায় শাহজাহান, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯০২ খ্রি, রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি, কলকাতা।
৪৩ সতী, নন্দলাল বসু, ১৯০৭ খ্রি, পরবর্তী অনুলিপি, ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট, নিউ দিল্লি।
৪৪ গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর (হাতির দাঁতের ওপর আঁকা ছবি), লালা ঈশ্বরীপ্রসাদ, ১৯১০ খ্রি।
(জয়া আপ্পা স্বামীর The Critical Vision গ্রন্থে মুদ্রিত)।
৪৫ রাধা, সুনয়নী দেবী, ১৯৩৭ খ্রি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
৪৬ নিবেদিতা সকাশে নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু-কৃত রেখাচিত্র আঃ ১৯০৭ খ্রি।
৪৭ নিত্যানন্দ ও জগাই-মাধাই, অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত ফ্রেস্কো, ১৯২৯ খ্রি।
গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস, লখনউ।
৪৮ নিসর্গ, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, আঃ ১৯২৫ খ্রি।
৪৯ জনৈক নবীনার প্রতিকৃতি, অতুল বসু, আঃ ১৯৩০ খ্রিঃ।
৫০ সাঁওতাল রমণী, কিশোরী রায়, আঃ ১৯৩০ খ্রি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংগ্রহ।
৫১ নিসর্গ, ভোলা চট্টোপাধ্যায়, আঃ ১৯৩০ খ্রিঃ, শিল্পীর সংগ্রহ
৫২ সংস্কারমুক্ত হিন্দু, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯২১ খ্রি।
৫৩ আলোছায়া, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আঃ ১৯২২ খ্রি।
(ডব্লু জি আর্চার কর্তৃক তার India and Modern Art গ্রন্থে মুদ্রিত)।
৫৪ কলকাতার গলি, যামিনী রায়, আঃ ১৯৪০ খ্রি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংগ্রহ।
৫৫ চিংড়ি মুখে জোড়া বেড়াল, যামিনী রায় আঃ ১৯৫০ খ্রি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংগ্রহ
৫৬ নারী, রেখাবন্ধন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আঃ ১৯২৮ ৩০ খ্রি, রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন।
৫৭ আত্ম-প্রতিকৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৩৫ খ্রি, রবীন্দ্রভবন শান্তিনিকেতন
৫৮ কামাক্ষানপুরা, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, আঃ ১৯৩০ খ্রি।
৫৯ মৃতের দেশ, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী আঃ ১৯৪৩ খ্রি সলারজঙ্গ সংগ্রহশালা হায়দ্রাবাদ
৬০ একটি বুড়া সাঁওতাল নন্দলাল বসু, ১৯৪৪ খ্রি, ভারতকলা ভবন, বারাণসী।
৬১ বাউল রাধাচরণ বাগচী, আঃ ১৯৫১ খ্রি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা।
৬২ রবীন্দ্রনাথ সকাশে শিলাইদহ গ্রামের মানুষ, মুকুল দে, ১৯১৩ খ্রি শিল্পীর সংগ্রহ।
৬৩ মুঙ্গেরের গঙ্গা, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আঃ ১৯৫০ খ্রি, শিল্পীর সংগ্রহ
৬৪ বারান্দা, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, আঃ ১৯৪৮ খ্রি।
৬৫ বৃষ্টি, রামকিঙ্কর বেইজ, ১৯৪৭ খ্রি, নন্দন, শান্তিনিকেতন।
৬৬ ভিখারিনী, হরেন দাস, আঃ ১৯৬০ খ্রি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংগ্রহ।

৬৭ হলকর্ষণ, নন্দলাল বসু, ১৯২৮ খ্রিঃ, শ্রীনিকেতন।
৬৮ মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রার সিংহল যাত্রা, ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মণ, ইন্ডিয়া হাউস, লণ্ডন।
৬৯ মধ্যযুগের সন্তগণ, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ১৯৪৭ খ্রি, হিন্দীভবন, শান্তিনিকেতন।
৭০ তিনজন রমণী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ১৯৫০ খ্রি, বনস্থলী বিদ্যাপীঠ, বনস্থলী, রাজস্থান।
৭১ যুদ্ধবিধ্বস্ত বুটজুতো, অবনী সেন, আঃ ১৯৩৩ খ্রি।
৭২ মাছধরা, গোবর্দ্ধন আশ, আঃ ১৯৪০ খ্রি, শিল্পীর সংগ্রহ।
৭৩ বুভুক্ষু, আদিনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৯৪৩ খ্রি, শিল্পীর সংগ্রহ।
৭৪ ১৩৫০-এর মন্বন্তর, জয়নুল আবেদিন, ১৯৪৩ খ্রি, শিল্পীর সংগ্রহ।
৭৫ রাতে খুলি বৈঠক, সোমনাথ হোড, ১৯৪৬ খ্রি, শিল্পীর সংগ্রহ।
৭৬ রাখাল বালক, চিত্তপ্রসাদ, ১৯৬২ খ্রি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংগ্রহ।
৭৭ ঘরমুখো, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, আঃ ১৯৫০ খ্রি, শিল্পীর সংগ্রহ।
৭৮ গতি, রথীন মৈত্র, আঃ ১৯৫০ খ্রি, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস, কলকাতা।
৭৯ নৌকা, গোপাল ঘোষ, আঃ ১৯৫৩ খ্রি, সংগ্রাহক অজ্ঞাত।
৮০ উমা, নীরদ মজুমদার, আঃ ১৯৬৫ খ্রি।
৮১ হংসপাতি, পরিতোষ সেন, ১৯৪০ খ্রি।
৮২ সাপুড়ে, প্রাণকৃষ্ণ পাল, আঃ ১৯৬০ খ্রি।
৮৩ মুখ, সুনীলমাধব সেন, আঃ ১৯৬০ খ্রি।

★ গ্রন্থে চিত্রের ক্রমিক সংখ্যা একবর্ণ চিত্রের ক্ষেত্রে ছোট ও বহুবর্ণের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বড় হরফে দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচিত গ্রন্থ ও নিবন্ধপঞ্জি

অতুল বসু—**শিল্পচর্চা**, কলিকাতা, ১৯৮৭।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—**জোড়াসাঁকোর ধারে**, কলিকাতা।

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—"ভারতীয় চিত্রকলার নূতন যুগ", **পঁচিশ বছর** (১৯১০-১৯৩৫), কলিকাতা, ১৯৩৫।

—"বাংলার চিত্রশিল্প", **সংস্কৃতি**, ৩য় সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৬৪।

—**ভারতের শিল্প ও আমার কথা**, কলিকাতা, ১৯৬৯।

অশোক ভট্টাচার্য—"শিল্পী প্রাণকৃষ্ণ পাল", **সারস্বত**, কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৬।

—"শিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথ", **সারস্বত**, শারদীয়, ১৩৮৭।

—**কলকাতার চিত্রকলা**, কলকাতা, ১৯৯১।

—"জনজীবনের শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়", **শারদীয় কালান্তর**, ১৩৯৮।

—"সর্বজনের শিল্পী জয়নুল আবেদিন" **শারদীয় কালান্তর**, ১৩৯৯।

—"কালচৈতনাবশিল্পী চিত্তপ্রসাদ", **শারদীয় বসুমতী**, ১৩৯৯।

—"পটচিত্র-শৈলী বিচার", **লোকশ্রুতি**, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৯৯।

কমলকুমার মজুমদার—"বঙ্গীয় গ্রন্থচিত্রণ", **এক্ষণ**, কার্তিক-মাঘ, ১৩৭৯।

কমল সরকার—**শিল্পীসপ্তক**, কলিকাতা, ১৯৭৭।

—"অর্ধশতবর্ষে একাডেমি অব ফাইন আর্টস", **দেশ**, ৪ জুন ১৯৮৩।

—**ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী**, কলিকাতা, ১৯৮৪।

কালিদাস দত্ত—"বহড়ু গ্রামের কয়েকটি পুরাতন ভিত্তিচিত্র", **প্রবাসী**, চৈত্র ১৩৩৯।

গোবর্দ্ধন আশ—"ইয়ং আর্টিস্টস ইউনিয়ন (১৯৩১) ও আর্ট রিবেল সেন্টার", **অনুষ্টুপ**, শীত সংখ্যা, ১৯৮৪।

—"ক্যালকাটা গ্রুপের সংস্পর্শে এলাম", **শারদীয় অনুষ্টুপ**, ১৩৯১।

চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত (সঙ্কলক)—**আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন : পরিচিতি ও বর্ণনামূলক তালিকা**, বিষ্ণুপুর, ১৩৯৩।

চিন্তামণি কর—"কলকাতার সাহেব শিল্পীরা", **দেশ**, বিনোদন সংখ্যা, ১৩৯৬।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়—**বীরভূমের যম-পট ও পটুয়া**, কলিকাতা, ১৯৭২।

দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়—**ঘরের মানুষ গগনেন্দ্রনাথ**, কলিকাতা, ১৯৬৭।

ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মণ—"ভারতীয় কলাশিক্ষায় কলাভবন", **দেশ**, বিনোদন সংখ্যা, ১৯৮৪।

নীহাররঞ্জন রায়—**বাঙালীর ইতিহাস** (আদি পর্ব), ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৮০।

প্রদ্যোত গুহ—**কোম্পানি আমলে বিদেশী চিত্রকর**, কলিকাতা, ১৯৭৮।

প্রদোষ দাশগুপ্ত—**স্মৃতিকথা শিল্পকথা** (ক্যালকাটা গ্রুপ), কলিকাতা, ১৯৮৬।

বিনয় ঘোষ—"শিল্পী শহর কলকাতা", **সুন্দরম্**, ১ম বর্ষ, সংখ্যা ১ম ও ২য়-৩য়।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়—**আধুনিক শিল্পশিক্ষা**, (বিশ্বভারতী), কলিকাতা, ১৯৭২।

—"অবনীন্দ্রনাথের ছবি", **বিশ্বভারতী পত্রিকা**, কার্তিক-চৈত্র, ১৩৮৩।

—**চিত্রকথা**, কলিকাতা, ১৯৮৪।

মণিলাল সেনশর্মা—"বঙ্গীয় কলাপদ্ধতির আধুনিক রূপ", **বিচিত্রা**, ১৩৪০।

রাণী চন্দ—**শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ**, কলিকাতা, ১৯৭২।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু—**"নিবেদিতা ও ভারতের শিল্প-আন্দোলন" দেশ** পত্রিকায় প্রকাশিত ধারাবাহিক নিবন্ধ, ১৯৮৯-৯১।

শোভন সোম—"ঔপনিবেশিক ভারতে শিল্পশিক্ষা ১৮৩৯-১৯৪৭", **শারদীয় অনুষ্টুপ**, ১৯৮৬।

—"ক্যালকাটা গ্রুপ (১৯৪৩-১৯৫৩) : উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা ও পরিণাম", **শারদীয় অনুষ্টুপ**,১৩৯০।

শোভন সোম ও অনিল আচার্য (সম্পাদিত)—**বাংলা শিল্প-সমালোচনার ধারা**, কলিকাতা, ১৯৮৬।

সত্যজিৎ চৌধুরী—"ওকাকুরা তেনশিং ও অবনীন্দ্রনাথ", **বিশ্বভারতী পত্রিকা**, কার্তিক-চৈত্র, ১৩৮৩।

সরসীকুমার সরস্বতী—**পালযুগের চিত্রকলা**, কলিকাতা, ১৯৭৮।

সুকুমার সেন—**বটতলার ছাপা ও ছবি**, কলিকাতা, ১৯৮৯।

সুধাংশুকুমার রায়—"জাদুপট ও জাদু-পটুয়া", **অমৃত**, ২৭ মে ১৯৭৭।

Agastya—"Aesthetics of Young India : A Rejoinder", ***Rupam***, No. 9, January 1922

Appasamy, Jaya—***Ramkinkar***, New Delhi, 1961.

—***Abanindranath Tagore and the Art of His Times***, New Delhi, 1968.

—"Indian Murals Old and New", ***Lalit Kala Contemporary***, No. 14

—"Early Calcutta Lithographs", ***Lalit Kala Contemporary***, No. 31

***Archer, Mildred*—*Company Drawings in the India Office Library*,** London, 1972
Archer, Mildred and
***Archer, W.G.*—*Indian Painting For the British 1770-1880*,** London, 1955
***Archer, W.G.*—*India and Modern Art*,** London 1959
—***Kalighat Paintings*,** London, 1972
***Bagal, Jogesh Ch.*—*Centenary: Government College of Art and Craft*,** Calcutta, 1980
Bhattacharya, Asok K. — 'Indian Society of Oriental Art in Retrospect", ***Journal of the Indian Society of Oriental Art*,** (75th Anniversary Special Number), Vol XII & XIII, (1981-83)
—"On the Origins of the School of Kalighat Painting", ***Journal of the Indian Society of Oriental Art*,** Vol XV, (1985-86)
"Neo-Bengal School of Painting", ***Rupanjali : In Memory of O.C. Gangoly*,** ed by K K Gangoli and S K Biswas, Calcutta, 1986
—"Nandalal Bose and Indian Art Tradition" ***Dimensions of Indian Art*** (Pupul Jayakar Seventy), ed by Lokesh Chandra and Jyotindra Jain, New Delhi, 1986
"The Pictorial Vision of Jamini Roy", ***Calcutta Review*,** Vol V, Nos 1&2 (1987 88)
- Trends in Bengali Paintings in the First Half of the Twentieth Century", ***Indian Museum Bulletin*,** (Combined Issue), Vols XXIII & XXIV (1988-89)
"Art in Modern Bengal (Late 19th and First Quarter of the 20th Century)", ***Modern Bengal*,** ed by S P Sen and N R Ray, Calcutta, 1990
Bhattacharya, Binoy*—*Cultural Oscillation (A Study on Patua Culture) Calcutta, 1980
***Chakravarti, Jayanta*—**"Indigenous Tradition of Painting in Bengal (13th-18th Century)", ***Indian Museum Bulletin*,** (Combined Issue), Vols XXIII & XXIV (1988-89)
Chakrabarti, Kanchan*—**"The Print Maker's Art and the Bengal School", ***Visva-Bharati Quarterly (Ramkinkar-Benodebehari Number), Vol 46, Nos 1-4, 1980 81
***Chatterjee, Ratnabali*—** The Non-Indigenous Sources of Paintings in Bengal (13th 18th Century), ***Indian Museum Bulletin*,** (Combined Issue), Vols XXIII & XXIV (1988-89)
Dey, Bishnu and ***Irwin, John*—*Jamini Roy*,** Calcutta 1944
***Dey, Bishnu*—** "The Pioneers of Art in Modern India", ***Lalit Kala Contemporary*,** No 1
***Dutt, Gurusaday*—**"The Art of Bengal", ***Modern Review*,** May 1932
"The Indigenous Painters of Bengal", ***Journal of the Indian Society of Oriental Art*,** Vol I 1933
***Fischer, K.*—** Calcutta Group", ***Marg*,** Vol VI, No 4, September 1953
French, J.C. —"The Land of Wrestlers , ***Indian Art and Letters*.** Vol I, No 11, (London), 1927
***Gangulı, K.K.*—*Designs in Traditional Arts of Bengal*,** Calcutta 1963
***Gangoly, O.C.*—**"Modern Indian Painting" ***International Studio*,** Vol LXXIX No 324, (1924)
***Ghose, Benoy*—*Traditional Arts and Crafts of West Bengal*,** Calcutta, 1981
***Ghosh, D.P.*—**"Eastern School of Medieval Indian Painting", ***Chhavi*,** Banaras 1971
—***Folk Art of Bengal*,** Santiniketan, 1977
Medieval Indian Painting (Eastern School), Delhi, 1982
***Goswami, N.*—*Catalogue of Paintings of the Asutosh Museum Ms. of the Ramacharita manasa*,** Calcutta 1981
Harle, J.C. and
***Topsfield, Andrew*—*Indian Art in the Ashmolean Museum*,** Oxford, 1987
***Karpeles, A.*—**"Calcutta School of Painting", ***Rupam*,** Nos 15 & 16, July-December 1923
***Kramrisch, Stella*—** Aesthetics of Young India A Rejoinder", ***Rupam*,** No 10, April 1922
—"An Illustrated Gitagovinda Ms ***Journal of the Indian Society of Oriental Art*,** Vol II, No 2 1934
***Losty, Jeremiah P.*—*The Art of the Book in India*,** London, 1982
Majumdar, R.C (ed) ***History of Bengal*,** Vol I, Dacca, 1943

Mittal, Jagdish—"Graphic Art of the Bengal School", ***Lalit Kala Contemporary***, No 1
Mitra, Asok—Four Painters, Calcutta, 1964
—"The Forces Behind the Modern Movement", ***Lalit Kala Contemporary***, No 1
Mitra, P.K.—Treasures of the State Archaeological Museum, West Bengal, Vol 3 (Painting), Calcutta, 1991
Mitter, Partha—Much Maligned Monsters, Oxford 1977
Mukherji, Ajit—Folk Art of Bengal, Calcutta, 1939
Mukherjee, B.N.—"Two Dated Documents of Painting and the Kalighat Style", ***Golden Jubilee Volume***, Victoria Memorial Hall, Calcutta, 1985
Pal, Pratapaditya—"Evidence of Buddhist Painting in Eastern India", ***Journal of the Asiatic Society***, Vol XVIII, No 4, 1966
Ramachandran Rao, P.R.—Choudhury and His Art, Bombay, 1943 ***Modern Indian Painting***, Madras, 1953
Ray, S.K.—The Ritual Art of the Bratas of Bengal, Calcutta, 1961
Rohatgi, Pauline—"Topographical Prints of Calcutta and Bengal", ***Indian Museum Bulletin***, (Combined Issue) Vols XXIII & XXIV, (1988-89)
Sarkar, Kamal—"100 Years Institutional Patronage for Art In Bengal (1831-1933), ***Indian Museum Bulletin***, (Combined Issue) Vols XIII & XIV (1988-89)
Saraswati, S.K.—"East Indian Manuscript Painting", ***Chhavi***, Banaras, 1971
Sastri, H.P.—"Notes on Vishnupur Circle Cards", ***Journal of the Asiatic Society of Bengal***, 1895, p 284
Sengupta, S. (ed)—***The Patas and Patuas of Bengal***, Calcutta, 1973
Skelton, Robert—"Murshidabad Painting", ***Marg***, Vol X, 1956
—"Iskindar Nama of Nusrat Shah", ***Indian Painting***, London, 1978
Subramanyan, K.G.—"Ramkinkar and His Work", ***Visva-Bharati News***, September-October 1980
—"Benode Behari Mukherjee", ***The Visva-Bharati Quarterly***, (Ramkinkar-Benodebehari Number), Vol 46, Nos 1-4, May 1980-April 1981
Venkatachalam, G.—Contemporary Painters, Bombay, n d
Catalogues and Albulms—A Guide to the Dacca Museum, Dacca, 1964
—***Bengal Painters' Testimony*** (Intro : Bishnu Dey), Calcutta, 1944
—***Arts of Bengal*** (A Catalogue of Exhibition organized by the Whitechapel Art Gallery, London), London, 1979
—***Catalogue of the Pictures and Sculptures in the Collection of Maharaja Tagore*** (Intro . Pradyot Kumar Tagore), Calcutta, 1905
—***Drawings and Paintings by Rabindranath Tagore*** (Intro Prithwis Neogy), New Delhi
—***The Art of Jamini Roy: A Centenary Volume***, Calcutta, 1987
—***Nandalal Bose (1882-1966) Centenary Exhibition***, National Gallery of Modern Art, New Delhi, 1982
—***Royal Academy of Arts : Bicentenary Exhibition*** 1768-1968, London, 1968